ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

পরিবেশক
খোশরোজ কিতাব মহল
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১
ফোন: ২৮০৭১০, ২৮১৫০০

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা :
মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ।। প্রকাশক :
ওয়াহিদুর রহমান, জাতীয় গ্রন্থ
বিতান, ১৫, বাংলাবাজার, (তিন
তলা) ঢাকা-১। মুদ্রাকর: ওয়াহিদুর
রহমান, বর্ণলিপি মুদ্রায়ণ, ১৭, কে,
জি, গুপ্ত লেন, ঢাকা। প্রথম বাংলা-
দেশ সংস্করণ : মার্চ, ১৯৭৬ ইং।

দাম : ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

www.pathagar.com

রাজনীতির ভূমিকা

মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব। কোন মানুষ কখনই একাকী জীবন যাপন করিতে পারে না। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কিংবা মনের ঐকান্তিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণে অনুপ্রাণিত হইয়া সে অন্য মানুষের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য।

একদিকে ব্যক্তি যেমন নিজের যাবতীয় প্রয়োজন নিজেই পূরণ করিতে পারে না, সেজন্য মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে সে বাধ্য, অনুরূপভাবে কোন মানুষ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া রাত্র-দিন একান্তভাবে মশগুল হইয়া থাকিতে পারেনা। অন্য মানুষের সেবা করা তাহাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা, এবং পারস্পরিক মনের ভাবের, কাজ-কর্মের ও টাকা-পয়সার আদান-প্রদান করা মানুষের জীবন-যাপনের জন্য একান্তই অপরিহার্য। নিজের স্বার্থ ও অপরের স্বার্থের কথা চিন্তা করা প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এই দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবধারাই মানুষের প্রকৃতিগত। আর মানুষের প্রকৃতিগত এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারার ভিত্তিতেই তাহার সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠে। সমাজ ভিন্ন মানুষের জীবন এক মুহূর্তকালও চলিতে পারে না। তাই মানব সভ্যতার আদিকাল হইতে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া জীবন-যাপন করিয়া আসিতেছে। মানুষের ইতিহাস যত পুরাতন, মানুষের সমাজ-ইতিহাসও ততখানিই প্রাচীন। সমাজ-দার্শনিক গিস্‌বার্ট বলিয়াছেনঃ "উদার অর্ধসভ্য মানুষের যে চিত্র, যেখানে মানুষ সকল রকম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত, বনের নদী ও স্রোতস্বিনীর জলে নিজের তৃষ্ণা মিটায় এবং প্রকৃতির বদান্য দানের ফলদ্বারা নিজের ক্ষুধা মিটায়, সে চিত্র নিছক কাব্য-কাহিনী, উহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই।"

(Fundamentals of Sociology. Page—45)

www.pathagar.com

রাজনীতির উৎস

বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় সমাজ; আর সমাজের সামগ্রিক শক্তি আত্ম-প্রকাশ করে রাষ্ট্রের রূপে। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করিলে আমরা দুইটি জিনিস যুগপৎভাবে দেখিতে পাই। প্রত্যেকটি মানুষেরই চিন্তার একটি স্বতন্ত্র ধারা এবং কর্মের একটি আলাদা পথ রহিয়াছে, যাহার ভিত্তিতে সে চিন্তা করে এবং তদনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে। অপর দিকে প্রত্যেক মানুষই সমাজের মধ্যে বসবাস করে বলিয়া সে কিছুতেই স্বেচ্ছাচারিতার পন্থা অবলম্বন করিতে পারেনা। কেননা, তাহা করিলে সমাজের অন্য লোকদের সহিত তাহার সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। এইভাবে যখন একটি মানব সমষ্টি সুস্পষ্ট রূপে সুসংগঠিত হয়, তখনই তাহাদের রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন হয় এবং একটি রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপিত হয়।

বস্তুতঃ রাজনীতি মানব সমাজের কোন একক ও অন্য-নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নহে। বরং মানব সমাজের বিভিন্ন দিকের সহিত উহা নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক কি, এখানে আমরা তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রাজনীতি ও বিজ্ঞান

রাজনীতি একটি বিজ্ঞান; কিন্তু তাহা প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞানের অনুরূপ নহে। কেননা ইহার উপাদান ও মূলনীতিসমূহ হুবহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রকৃতি-বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যা উভয় হইতেছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। বস্তুকে লইয়াই উহাদের কারবার। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নীতিশাস্ত্র হইতেছে সমাজ বিজ্ঞান, সমাজ ক্ষেত্রের মানুষই (man in society) হইতেছে ইহাদের বিষয়বস্তু। জড়ের সমস্যা আমরা যেভাবে বিবেচনা করি, মানুষের সমস্যা ঠিক সেইভাবেই বিবেচনা করা সম্ভব নয়। জড়ের জন্য দৃঢ়, স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল নিয়ম রহিয়াছে। দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিলিত হইলেই পানি সৃষ্টি হয়। ইহাই হইতেছে প্রকৃতি-বিজ্ঞান। ইহার সূত্র শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের অবস্থা এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ বস্তু-বিজ্ঞানে নিয়মের সত্যতা পরীক্ষা করা যেরূপ সহজ, সমাজ বিজ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষা করা ঠিক সেইভাবেই সহজ বা সম্ভব হয় না। অন্য কথায় বস্তু-জগতে কৃত্রিম উপায়ে সাদৃশ্য সৃষ্টি সম্ভব; কিন্তু মনুষ্য জগতে কৃত্রিম উপায়ে তাহা সম্ভব নয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রাজনীতির সংজ্ঞা দান করিয়া বলিয়াছেন :

www.pathagar.com

إنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام

الأحوال - (الطرق الحكمية) —"উহা এমন এক বিধি-ব্যবস্থা যাহা রীতিনীতি কল্যাণকর কার্য এবং সামগ্রিক অবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে"।

রাজনীতি ও অর্থনীতি

অর্থনীতি হইতেছে ধন-বিজ্ঞান (Science of wealth) । ইহা রাজনীতির সহিত নানা কারণে ও নানাভাবে গভীর সম্পর্ক রাখিতে বাধ্য। কেননা ধন উৎপাদন এবং উহার বন্টন-কার্য ব্যাপকভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সূত্র হইতেই সম্ভব হইয় থাকে। এইজন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থনীতিকে রাজনীতিরই একটি শাখা হিসাবে গণ্য করিয়াছেন এবং সেজন্যা পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' (Political Economy)। পক্ষান্তরে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের এমন বহু সমস্যা রহিয়াছে যাহা একান্তই আর্থনীতিক সমস্যা ; যথা, পুঁজি ও মজুরীর বিধান এবং আর্থিক অসাম্য দূরিকরণ।

রাজনীতি ও নৈতিকতা

মানুষের চরিত্র-নীতির যাচাই করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি প্রণয়ন করার নামই হইতেছে নৈতিকতা (Ethics)। মানুষের কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারের ভাল-মন্দ, সত্যাসত্য এবং ন্যায় ও অন্যায় (Rightness and wrongness) প্রভৃতি দিক সম্পর্কেই নৈতিকতার দৃষ্টি। এই জন্যই রাজনীতির সহিত নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত পরিষ্কার। কেননা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, তাহা ঠিক কিংবা বেঠিক (Right or Wrong)। এইজন্য নৈতিকতা ও রাজনীতি পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। মিঃ ফক্স (Fox) বলিয়াছেন, "What is morally wrong can never be Politically right, we may say that Politics is conditioned by ethics. "নৈতিকতার দিক দিয়া যাহা ভুল, রাজনীতির দৃষ্টিতে তাহা কখনই সমীচীন হইতে পারে না। আমরা বলিতে পারি যে, রাজনীতি নৈতিকতার শর্তে আবদ্ধ।"

বস্তুতঃ রাজনৈতিক মতাদর্শই হইতেছে রাষ্ট্রের লক্ষ্য। নাগরিকদের অধিকার, সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

সম্পর্ক প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটি নৈতিক দিক রহিয়াছে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাষ্ট্রকে নৈতিক বাঁধন ও দায়িত্ব হইতে মুক্ত মনে করার যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই উহার আদর্শ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী নৈতিক দায়িত্ব পালন করিতে হয়।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

এ্যরিষ্টটল তাঁহার 'রাজনীতি'(Politics) গ্রন্থের প্রথম ভাগে লিখিয়াছেন : প্রথমে একটি পরিবার গড়িয়া উঠে; যখন কতকগুলি পরিবার পরস্পর মিলিত ও একত্রিত হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সম্মিলিত ভাবে বসবাস করে, তখন একটি গ্রাম অস্তিত্ব লাভ করে। এই গ্রামগুলির সমন্বয়ে একটি দেশ এবং গোটা দেশের শৃংখলা বিধানকারী কোন শক্তি-সংস্থা স্থাপিত হইলে উৎপত্তি হয় একটি রাষ্ট্রের।'

এ কথা সুস্পষ্ট যে, সমাজ-জীবনের পূর্ণ নিয়ম-শৃংখলা স্থাপন এবং সমাজকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শে সুষ্ঠুরূপে গড়িয়া তোলার জন্য একটি জবরদস্ত শক্তির (Coarcive power) একান্তই আবশ্যক ; আধুনিক পরিভাষায় এই শক্তিরই নাম হইতেছে রাষ্ট্র (State)। যেহেতু একটি রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এই চারিটি জিনিস অপরিহার্য, তাই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসংগে বলিতে হয় যে, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপর আইন-কানুন কার্যকরকরণ ও শৃংখলা স্থাপনের জন্য স্বাধীন কর্তৃত্ব সম্পন্ন শক্তিকেই বলা হয় 'রাষ্ট্র'। অন্যকথায়, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ সামগ্রিক ইচ্ছা ও সমর্থনে যে উচ্চতর শক্তির নিরংকুশ প্রভুত্বের অধিকার স্বীকার করিয়া নিজদিগকে সুসংগঠিত করিয়া লয়, সেই শক্তির নাম হইতেছে-রাষ্ট্র (State)। ষ্টিফেন লী কক-এর ভাষায় একটি সুসংগঠিত সমাজকেই বলা হয় রাষ্ট্র। উহার একদিকে জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং অপর দিকে জনগণের পক্ষ হইতে আনুগত্য স্বীকার, এই দ্বিবিধ সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

বস্তুতঃ মানব-প্রকৃতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত জ্ঞান হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সমাজ ও তমদ্দুনের স্থিতি ও স্থায়িত্ব বিধান এইরূপ রাষ্ট্র ব্যতীত আদৌ সম্ভব নহে। আর এই শক্তিকে অপরিহার্যরূপে কোন না কোন সমাজ-বিধানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং তদনুযায়ী যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিতে হয়। উহার কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ ও কার্যসূচী নির্ধারণ এবং সমাজ ক্ষেত্রে বিশেষ আদর্শ রূপায়ন একমাত্র এই জবরদস্ত শক্তি

www.pathagar.com

দ্বারাই সম্ভব হইয়া থাকে। সেই জন্য সমাজ-সংস্থার ভাংগা গড়ার সহিত এই শক্তির স্বরূপ এবং উহার কর্মপন্থা ও কার্যসূচীর আদর্শিকতা ও ব্যবহারিকতার সহিত বিশেষ সামঞ্জস্য বর্তমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। রাষ্ট্র যে আদর্শ ও ও কর্মপন্থা অনুযায়ী সব কিছু গড়িয়া তুলিবার জন্য উহার যাবতীয় শক্তি, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও উপায়-উপাদান নিয়োগ করিয়া থাকে, কেবল সমাজ-জীবনই নহে, ব্যক্তি-জীবনও ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—সেই অনুযায়ী গড়িয়া উঠিতে বাধ্য হয়।

আইন ও সরকার

এই উচচতর জবরদস্ত শক্তির নিকট হইতে যে আইন ও বিধান উপস্থাপিত হয়, তাহাই হয় সেই দেশের অধিবাসীদের পক্ষে অনুসরণযোগ্য একমাত্র আইন ও শাসনতন্ত্র (Law and Constitution)। বস্তুতঃ শাসনতন্ত্র হইতেছে এমন কতকগুলি মূলনীতির সমষ্টি, যাহার দ্বারা জনগণের অধিকার, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক এবং উভয়ের দায়িত্ব ও পরস্পরের প্রতি কর্তব্য নির্ধারণ করা যায়। রাষ্ট্রের মঞ্জুরী ও জনগণের সমর্থন পুষ্ট যে-জনসমষ্টি, এই শাসন-তন্ত্রকে কার্যকর করার ও তদনুযায়ী আইন জারী করার ক্ষমতা (Authority) লাভ করে, তাহাই হইতেছে সরকার (Government)। এই সরকারই হইতেছে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম।

সরকারের প্রধান তিনটি বিভাগ রহিয়াছে : আইন পরিষদ, শাসন ও বিচার বিভাগ। আইন পরিষদ আইন রচনা করে, শাসনবিভাগ তাহা কার্যকর করে এবং বিচার বিভাগ উহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসন বিভাগের মঞ্জুরী সাপেক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তির উপর উহা প্রয়োগ করে।

রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা

রাষ্ট্র সমাজের প্রয়োজনেই গড়িয়া ওঠে। সেই রাষ্ট্রই আবার গোটা সমাজ এবং সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া থাকে।

ব্যক্তি-মানুষের জীবন যেমন সমাজ ব্যতীত চলিতে পারে না, তেমনি একটি সুস্পষ্ট, ব্যাপক ও সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়া কোন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হইতে এবং কিছু সময়ের জন্যও তাহা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। সমাজের জন্য চাই একটি নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও ব্যাপক সমাজ-ব্যবস্থা। রাষ্ট্রশক্তিই এই সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শে সমাজকে ও সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে সংঘবদ্ধ, নিয়-

www.pathagar.com

স্থিত ও পরিচালিত করে। ইহার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণকে এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমাজ প্রাসাদের বুনিয়াদ স্থাপিত করে। ব্যক্তির চরিত্র এবং স্বভাব-প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধন, ব্যক্তির চরিত্র ও সমাজের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানুষের কল্যাণ সাধনই হইতেছে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র এই সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে তাহার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং অধীনস্থ সমাজ ও ব্যক্তিগণকে শাসন করে। তাই সমাজ-ব্যবস্থাই হইতেছে রাষ্ট্রের রাজনীতি।

এখানে যে সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সবই মানুষের জন্য রচিত এবং গঠিত হয়। আর সেই মানুষ তথা বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রধানতঃ দুই প্রকারেব মৌলিক ধারণা বিদ্যমান—একটি নাস্তিক্যবাদী, অপরটি আস্তিক্যবাদী, বা ধর্মবাদী। ইহারই অনিবার্য ফলে সমাজ-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও আস্তিক্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী এই দুই প্রকারের মৌলিক ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সমাজ যত না পুরাতন, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রাচীন রাষ্ট্র, সমাজ—তথা মানুষ ও পৃথিবী এই দুইটি বিভিন্ন ধরনের মৌলিক ধারণা।

নাস্তিক্যবাদী ধারণা এই যে, এই বিশ্ব-প্রকৃতি এবং উহার একটি অংশ—এই মানুষের কোন সৃষ্টিকর্তা নাই—আপনা হইতেই এই সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে,আবার নিজে নিজেই ইহা মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। এই দুনিয়ায় মানুষের জীবন-যাপনের জন্য যে নিয়মবিধানের একান্ত আবশ্যক, মানুষ তাহা নিজেই রচনা করিবে। মানুষের জৈব-জীবনের জন্য সর্ব প্রকার সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা করাই হইতেছে মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইস্‌লামের পরিভাষায় এই ধারণাকেই "খালেস জাহেলিয়াত" বা "নিরেট অজ্ঞতা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ঠিক ইহারই বিপরীত রহিয়াছে খালেছ ধর্মবাদী ধারণা। ধর্মবাদী ধারণার মর্মকথা এই যে, মানুষ এবং নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতি—তথা সমগ্র জীব, জন্তু ও বস্তু একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি। তিনিই মানুষকে নিজ শক্তি ও অসীম ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুনিয়ায় মানুষের জন্ম ও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কেবল মাত্র খোদার দাসত্ব এবং তাঁহার প্রদত্ত বিধান পালন করিয়াই জীবন যাপন করিবে।

একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাকৃতিক জগতের

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি বস্তু—প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত খোদার এক সুদৃঢ় নিয়মের অধীন, খোদার বিধান পালনে একান্তভাবে বাধ্য। সে নিয়ম লংঘন করিলেই মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য। সৃষ্টি জগত নিছক জড়-সর্বস্ব নয়, এখানে জড়ের সহিত চৈতন্যেরও নিবিড় যোগ রহিয়াছে। মানুষের বেলাও এই কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। জড় ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। মানুষের এই জড় ও আত্মা—উভয় দিকের জন্য দুইটি পূর্ণ ও ব্যাপক বিধান রহিয়াছে। মানুষ এই উভয় দিকের যে কোন বিধান লংঘন করিবে, সে দিক দিয়াই তাহার মৃত্যু ঘটিবে। মানুষের জড়জীবনের জন্য যে বিধান, তাহাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক নিয়ম; এই নিয়ম দুর্লংঘ হইয়া বিরাজ করিতেছে নিখিল সৃষ্টিব্যাপী। পক্ষান্তরে মানুষের চৈতন্য বা আত্মার জগতের জন্য যে বিধান রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয় নীতি বা ধর্ম। মানুষের কর্মজীবনে ইহাকেই স্বীকার করিয়া ও অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম কাহারও জানিবার বা মানিবার অপেক্ষা রাখে না, মানুষ তাহা জন্মগতভাবেই জানিয়া থাকে এবং মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়—যেমন জানে ও মানিয়া চলে ছাগ-শিশু ও মৌমাছি ইত্যাদি ইতর প্রাণীকুল।

কিন্তু মানুষের জন্য যে নৈতিক আইন বা ধর্মব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা মানুষের স্বেচ্ছামূলক স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু, সকল মানুষ সেই আইনকে সরাসরিভাবে জানিতেও পারে না—সেভাবে জানিবার কোন উপায়ই মানুষের করায়ত্ত নহে। এই জন্যই আল্লাহতায়ালা নিজেই এই বিধানকে অহীর মারফতে মানুষের নিকট প্রেরণ করার পন্থা মানব-সৃষ্টির আদিকাল হইতেই অবলম্বন করিয়াছেন। এই অহী-প্রদত্ত বিধানই হইতেছে মানুষের জীবন-ব্যবস্থা। বস্তুতঃ জীবন-যাপনের জন্য—জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য যাবতীয় নিয়ম-কানুন আল্লাহতায়ালাই রচনা করিয়া দিয়াছেন। কারণ মানুষের এতটুকু বুদ্ধি, ক্ষমতা বা প্রতিভা নাই—থাকিতে পারে না, যাহার সাহায্যে সে নিজের ও অন্য মানুষের ইহকালীন ও পারলৌকিক জীবনের সর্ববিধ কল্যাণ সাধনের জন্য কোন বিধান ও ব্যবস্থা রচনার জন্য যে দূরদৃষ্টি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রতিভা অপরিহার্য, দুনিয়ার মানুষ স্বভাবতঃই তাহা হইতে বঞ্চিত। মানুষ যেমন নিজের দেহ-সৃষ্টির ব্যাপারে কোনরূপ যুক্তি পরামর্শ দান করিতে কিংবা কোন প্রকার নিয়ম বলিয়া দিতে পারে নাই; অথবা তাহার দেহ যন্ত্র পরিচালনার জন্য অভিনব কোন ব্যবস্থা আজিও তাহারা রচনা করিতে পারে নাই, তাহার জন্ম ও জীবন-লাভের ব্যাপারে তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা বুদ্ধি জ্ঞানের যেমন কোন প্রভাব ছিল না। তেমনি জীবন লাভের পর তাহার জীবন-

www.pathagar.com

পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধান রচনা করারও তাহার কোনই ক্ষমতা নাই—একবিন্দু অধিকারও নাই।

সমাজ-ব্যবস্থার উৎস

মানুষ নিজের জীবনের জন্য বিধান রচনা করিতে পারে না; কিন্তু জীবন পরিচালনার জন্য উচ্চতর কোন সত্তার রচিত বিধান সে বুঝিতে পারে, হৃদয়ংগম করিতে পারে এবং পারে তাহা অনুসরণ করিয়া নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালিত করিতে—যেমন পারে দৈহিক ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানিয়া বুঝিয়া তাহা যথাযথ ভাবে পালন করিয়া চলিতে। মানুষের বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, কোন্‌টি ন্যায় কোনটি অন্যায়, কোন্‌টি পাপ আর কোন্‌টি পূণ্য, পূর্বনির্ধারিত আদর্শের আলোকে তাহা অনুধাবন এবং অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। বিশ্ব-স্রষ্টা মানুষের এই অক্ষমতা ও ক্ষমতার কথা প্রত্যক্ষভাবে জানিতেন বলিয়া তাহার উপর জীবন-বিধান রচনার মত দুরুহ দায়িত্বভার চাপাইয়া দেন নাই; বরং তিনি নিজেই তাহার জন্য একটি সুষ্ঠু জীবন-বিধান রচনা করিয়া তাহাকে তদনুযায়ী জীবন যাপন করার আদেশ করিয়াছেন মাত্র এবং সেজন্য প্রয়োজনানুরূপ বুদ্ধি এবং ক্ষমতাও তাহাকে দান করিয়াছেন।

মানুষের জন্য খোদা-নির্ধারিত জীবন-বিধানের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের কেবল সুখ, সম্ভোগ ও আরাম-আয়েসেই মানুষের কোন কল্যাণ নাই; বরং ইহকাল-পরকাল—সমগ্রভাবে এই উভয় জীবনে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করাতেই নিহিত আছে মানুষের সর্বব্যাপী প্রকৃত কল্যাণ। এই জন্যই গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়াছেন সৃষ্টি কর্তার দাসত্ব ও প্রভুত্ব কবুল করার জন্য:

يـا يها الناس اعـبدوا ربكم الذى خلقكم و الذين من
قبلكم لعلكم تتقون *

—'হে মানুষ! দাসত্ব কবুল কর তোমাদের সেই খোদার, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা করিলেই আশা করা যায় যে, তোমরা সকল প্রকার বিপদ হইতে বাঁচিতে পারিবে।'

অন্যত্র মানুষের জীবন ও জন্মের উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হইয়াছে:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

www.pathagar.com

—'আমি মানুষ ও জিন-জাতিকে কেবল মাত্র এই জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আজীবন কেবল আমারই 'ইবাদাত' করিবে—কেবল আমারই প্রদত্ত বিধান পালন করিয়া চলিবে।'

আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ পূজা-উপাসনা করা, অনুসরণ করা এবং বিধান মানিয়া চলা। আর খোদার ইবাদাত করার তাৎপর্য হইতেছে কেবলমাত্র খোদারই পূজা-উপাসনা করা, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে খোদার বন্দেগী করা, খোদার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা এবং খোদার দেওয়া ব্যবস্থানুযায়ী সম্পূর্ণ জীবন যাপন করা। মানুষের উপর দুইটি দিকের দুইটি কর্তব্য ও অধিকার অর্পিত হইয়াছে। একটি স্রষ্টার অধিকার। মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যস্থিত সম্পর্ককে যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া চলা মানব-জীবনের বিরাট কর্তব্যের একটি দিক; কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা অতীব বিশাল ও ব্যাপক—তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে সমগ্র সৃষ্টিতে; ইহাই মানুষের সামাজিক দিক। মানুষের এই বিরাট ও ব্যাপক সামাজিক ও তমদ্দুনিক জীবনকে খোদা-প্রদত্ত বিধান অনুসারে গঠন করা, পরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করাকেও কোরআনী পরিভাষায় বলা হয় 'ইবাদাত'। মানব জীবনের উদ্দেশ্য যে খোদার ইবাদাত করা, ইহাই তাহার প্রকৃত রূপ। এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যস্থিত সম্পর্ক-সূত্রে প্রাপ্ত বিধান অনুসারে সৃষ্টিকুলের পারস্পরিক বিরাট ও ব্যাপক জীবন পরিচালিত করাই হইতেছে ইসলামী ইবাদাতের সামাজিক সংজ্ঞা।

আযাদীর তাৎপর্য

অতএব মানুষ যখন একমাত্র খোদার দাসত্ব কবুল করিয়া পরিপূর্ণরূপে তাঁহারই বিধান পালন করিতে শুরু করে, ইসলামী রাজনীতির দৃষ্টিতে ঠিক তখনই তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ ঘটে। আর সেইসময় হইতেই হয় তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনের সূচনা। এখন তাহার প্রভু একমাত্র আল্লাহ, সে একমাত্র আল্লাহরই বান্দাহ, আল্লাহ ছাড়া সে আর কাহারও দাস বা অধীন নয়, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন এক খোদার প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করিয়া নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিতে শুরু করে কিংবা অন্য মানুষের নির্দেশ ও মনগড়া বিধান অনুসারে চলিতে ও জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে, ঠিক তখনই সে হয় পরাধীন, পরের নিকৃষ্টতম গোলাম। এই কথা একজন ব্যক্তির পক্ষে যতখানি সত্য, একটি গোষ্ঠী, দল বা জাতি সম্পর্কেও ঠিক ততখানি সত্য। ইসলামী রাজনীতির দৃষ্টিতে ইহাই স্বাধীনতা ও পরাধীনতার সঠিক তাৎপর্য।

www.pathagar.com

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ -

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ -

—'আল্লাহতায়ালার প্রভুত্ব ও বিধান যাহারা স্বীকার করে একমাত্র আল্লাহই হন তাহাদের প্রভু,তিনি তাহাদিগকে (পরাধীনতার) অন্ধকার হইতে(স্বাধীনতার) আলোকোজ্জল পরিবেশে পৌঁছাইয়া দেন। পক্ষান্তরে যাহারা তাহা অস্বীকার করে, অসংখ্য শক্তি তাহাদের প্রভু হইয়া বসে ; উহারা তাহাদিগকে (স্বাধীনতার) আলোক হইতে টানিয়া নিয়া (পরাধীনতার) অন্ধকারে নিমজ্জিত করে।'

এক কথায়, একমাত্র খোদার সার্বভৌম প্রভুত্বের বুনিয়াদে খোদায়ী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবনের শৃংখলা বিধান করাই হইতেছে ইসলামী রাজনীতির সারকথা। যখনই মানুষ খোদার দাসত্বের শৃংখল ছিন্ন করে, ঠিক তখনই তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়; আর তখনই তাহার কণ্ঠে ও পায়ে সহস্র প্রকারের গোলামীর জিঞ্জীর লাগিয়া যায়।

আদর্শের পার্থক্য

মানব-সৃষ্টির আদিকাল হইতেই উপরোক্ত দুইটি ধারণা পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে। জীবন সম্পর্কে ধারণার এই মৌলিক ব্যবধানের কারণেই আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে জীবনের সমগ্র ব্যাপারে আদর্শ ও দৃষ্টিকোণের মূলগত পার্থক্য।

ইস্‌লামী আদর্শ যেহেতু সৃষ্টিকর্তারই রচিত, আর সৃষ্টিকর্তা চিরকালীন, অক্ষয় ও অপরিবর্তনশীল ; তাই তাহার রচিত জীবন-বিধানও চিরন্তন, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়।

বস্তুতঃ আধুনিক ধর্মহীন রাষ্ট্র-বিজ্ঞান রাষ্ট্র (state) কে যে মর্যাদা দিয়াছে, ইস্‌লামী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে তাহা চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট রহিয়াছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার জন্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করিতে দৃঢ়সংকল্প, তাহাকে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও দাসত্ব করিতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার দাসত্ব করিতে প্রস্তুত হয় না, তাহাকে দাসত্ব করিতে হয় নিজের নফসের, সমাজপতির, রাষ্ট্র-নায়কের এবং সরকারী শাসন-যন্ত্র ও উহার বিভিন্ন অংশের ; ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুতঃ সৃষ্টি-

www.pathagar.com

কর্তাই হইতেছেন মানব-জাতির প্রভু ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। কেননা, জীবন যাপনের পূর্ণাংগ বিধান তিনিই দান করিয়াছেন।

الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى -

—'সেই আল্লাহ্ই সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি জিনিসের জীবন যাপনের ব্যবস্থাও তিনি দান করিয়াছেন।'

এই জন্যই মানব-জাতির এই মহাযাত্রার প্রারম্ভে আল্লাহতায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন :

فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلاخوف عليهم

ولا هم يحزنون - (البقره)

---'তোমাদের নিকট (নবীর মারফতে) আমার রচিত জীবন-বিধান নাজিল হইবে, যাহারা তাহা গ্রহণ ও অনুসরণ করিয়া চলিবে তাহাদের জন্য কোন প্রকার ভাবনা নাই, নাই ভবিষ্যতের কোন চিন্তা।'

কিন্তু ইহার বিপরীত---খোদাকে অস্বীকার করার ধারণা মানুষেরই স্বকপোল কল্পিত মত। আর মানুষের বুদ্ধি যেহেতু বিভিন্ন, অসম্পূর্ণ, সীমাবদ্ধ এবং পরিবর্তনশীল, তাই মানব-রচিত জীবন-বিধানগুলি যেমন বিভিন্ন ধরনের, তেমনি যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের নূতন দাবীতে উহার মৌলিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু মানব-রচিত বিধান চিরদিনই অসম্পূর্ণ, একদেশ-দর্শী ও পক্ষপাত-দুষ্ট হইয়া থাকে। তাই কোন দিনই তাহা মানব-জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের জন্য কোন নির্ভুল নির্দেশ দান করিতে সমর্থ নহে। পরন্তু নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের জন্য তাহা গ্রহণযোগ্যও হইতে পারে না। এই জন্যই দেখিতে পাই, মানব-রচিত বিধানে আজ যাহা সত্য, আগামীকাল তাহাই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং একই যুগে পাশ্চাত্য মানুষের রচিত বিধানে যাহা সত্য ও কল্যাণকর, প্রতীচ্যের মানুষের রচিত বিধানে তাহাই মিথ্যা এবং ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণাংগের জন্য রচিত বিধান শ্বেতাংগের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়, রাজা-বাদ্শাহদের জন্য যে আইন ও সুযোগ-সুবিধা, প্রজা ও সর্বসাধারণ মানুষের জন্য তাহাতে একবিন্দু অধিকার নাই। যে বিধানে মজুর, শ্রমিক ও কিষাণের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে, পুঁজিপতি, কারখানা-মালিক ও ভূমি-মালিকের তাহাতে নিশ্চিত ধ্বংস নিহিত হইয়া আছে।

www.pathagar.com

অথচ প্রাকৃতিক নিয়ম চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, নিরপেক্ষ, অখণ্ড ও নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা। তাহাতে পাশ্চাত্যের আগুন প্রতীচ্যে আসিয়া পানি হইয়া যায় না এবং প্রাচ্যের সূর্য পাশ্চাত্যের আকাশে গিয়া চন্দ্র বা নক্ষত্রে পরিণত হয় না। অনুরূপভাবে সত্য এবং মিথ্যা, পাপ এবং পুণ্য চিরন্তনী ধারণা। স্থান, কাল ও পাত্র বা ক্ষেত্রের ব্যবধানে তাহার কোন পরিবর্তন হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। আজ হইতে সহস্র বৎসর পূর্বে বৃষ্টিপাতের যে নিয়ম ছিল, আজও তাহাই বর্তমান---আরও হাজার বৎসর পরও ঠিক তাহাই থাকিবে। প্রতীচ্যের লোকেরা দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঠুকিলে যদি আগুন জ্বলে, তবে পাশ্চাত্যের লোকদের হাতের খোঁচায় তাহা হইতে পানির ঝর্ণাধারা ফুটিয়া বাহির হইবে না। আগুন সকলকেই জ্বালায়-পোড়ায়, বিষ খাইলেই প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। ইহাতে কোনদিনই কোন পক্ষপাতিত্ব বা ব্যতিক্রম দেখা দেয় নাই। চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত, রাত্র-দিনের আবর্তন এবং জীবন, জন্ম ও মৃত্যু একটি চিরন্তনী ব্যবস্থা অনুসারে সংঘটিত হয়। মানুষের দেহ-জগত যেমন এহেন স্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত, মানুষের মনোজগত এবং নৈতিক জীবনের জন্যও অনুরূপ স্থায়ী ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর তাহাই হইতেছে খোদা-প্রদত্ত জীবন-বিধান। এই উভয় জগতের খোদায়ী বিধান সম্পর্কে কোরআন মজিদে পরিষ্কার বলা হইয়াছে :

سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا *

---'ইহা খোদা তায়ালার নির্ধারিত শাশ্বত নিয়ম, ইহা অতীতকাল হইতে একইভাবে চলিয়া আসিয়াছে। খোদার এই নিয়মের কোন পরিবর্তন, তারতম্য, রদবদল বা ইহাতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই।'

খোদার এই চিরন্তন ও শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের মন, কর্ম ও নৈতিক জীবনের জন্য যে বিধান রচিত হইয়াছে, তাহারই নাম ইসলাম।

প্রাকৃতিক জগতে যে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি ও শৃংখলা অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিতেছে, আনুগত্য ও সামঞ্জস্যই হইতেছে উহার মর্মকথা। একদিকে সৃষ্টির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু যেমন স্রষ্টার স্বভাব-নিয়মের অধীন অনুগত, তেমনি সৃষ্টির অন্যান্য অংশের সহিত এই ব্যাপারে উহার নিবিড় যোগ ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সৃষ্টির একটি অংশে যে সত্য স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া আছে, তাহাই

www.pathagar.com

বিরাজ করিতেছে সমগ্র সৃষ্টিকে ঘিরিয়া। তাহার কোথায়ও একবিন্দু ব্যতিক্রম বা তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না।

জড় ও প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্নিহিত এই স্থূল সত্য অতীব সূক্ষ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে মানুষের চৈতন্য—তথা নৈতিকতার দুনিয়ায়। তাই এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্যকে মানুষের সম্মুখে বারবার 'অহী'র মারফত উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে নিখিল মানবের জন্য খোদার অহী-প্রদত্ত বিধান বা ধর্ম। আর ইহারই নাম ইস্‌লাম।

আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত যুগে-যুগে দেশে-দেশে বিভিন্ন মানব-সমাজে খোদায়ী ব্যবস্থার প্রচার হইয়াছে এবং সেই অনুসারে রচিত হইয়াছে শহর-নগর, রাষ্ট্র এবং সভ্যতা। কালের বিবর্তনে বিশ্ব-প্রকৃতির বাহ্যিক খোলসের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে; কিন্তু উহার মূল ও আদিম কাঠামো চিরদিনই অক্ষয় ও অপরিবর্তনশীল; তাহার কোথায়ও কোনদিনই একবিন্দু পরিবর্তন সূচিত হয় না। ঠিক তেমনি, কালের বিবর্তনে এহেন খোদায়ী বিধানের খুঁটিনাটি ও দূরবর্তী শাখা-প্রশাখায় কিছুটা পরিবর্তন কিংবা পরিবর্তিত অবস্থার সহিত ইস্‌লামী আদর্শের মূলনীতির সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং তাহা পূরণ করার জন্য ইসলামী আদর্শে ইজতিহাদের নীতি একটি বিরাট শক্তি হিসাবে চিরকালই কার্যকরী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই বিধানের মূলনীতিগুলির একবিন্দু পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন-সংযোজনের কোন আবশ্যকতা কোনদিনই অনুভূত হয় নাই। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মারফতে ইস্‌লামের পরিপূর্ণতা ও পূর্ণ-পরিণতি সাধিত হইয়াছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাহার উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর যে কোন স্থানে গড়িয়া উঠিতে পারিবে নূতন নূতন সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা। তাহার কোন দিক, বিভাগ ও ক্ষেত্রের জন্য মূলনীতির অভাব কোনদিনই মানুষের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবে না। উপরন্তু ইহা চিরদিনই অভিনব, স্বাভাবিক, জীবন্ত এবং সর্বাপেক্ষা বেশী যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ঠিক এই জন্যই ইসলামী রাজনীতি কোনদিনই জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক রাজনীতি নয়। ইহার গতি সব সময়ই বহির্মুখী ও সম্প্রসারণশীল এবং ইহার লক্ষ্য সমগ্র মানবতার দিকেই নিবদ্ধ। অতএব ইহার প্রকৃত ক্ষেত্র হইতেছে আন্তর্জাতিক দুনিয়া এবং ইহাই ইসলামী রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে মানব-রচিত বিধান কালের এক বিন্দু পরিবর্তনের সংগে সংগেই একেবারে আমূল বদলিয়া যায়। তাই ইতিহাসে মানব-রচিত আদর্শের বিবর্তন ও পরিবর্তন তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে এবং মানবতার পক্ষে তাহা

www.pathagar.com

অত্যন্ত মারাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে। এক সময় মানুষ গোষ্ঠীর আদর্শকেই সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও জীবন্ত আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছে এবং গোষ্ঠীর ভিত্তিতেই গড়িয়াছে রাজ্য ও সাম্রাজ্য। গোষ্ঠীর পর নাগরিক-রাষ্ট্রীয় ধারণার প্রভাব দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক মিলিত হইয়া নগর রচনা করিয়াছে এবং তাহার উপর নাগরিক রাষ্ট্রের (City states) জীবন শুরু করিয়াছে। এই নাগরিক সভ্যতার বিলুপ্তির পর প্রচণ্ড হইয়া দেখা দিয়াছে পোপবাদ ও রাজতন্ত্র ; কিন্তু মানুষ অন্ধ পোপবাদ ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বেশীদিন বরদাশত্ করে নাই। জড়-বিজ্ঞানের নব-জাগরনের সংগে সংগে এই পোপবাদ ও রাজতন্ত্রের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়। আর তাহার স্থানে দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় জীবনের এক নূতন আদর্শ—"জাতীয়তাবাদ"। এই আদর্শ দীর্ঘদিন পর্যন্ত পৃথিবীর রংগমঞ্চ দখল করিয়া রহিয়াছে। রাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সংগে সংগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সহিত চলিয়াছে পার্লামেন্টারী রাজনীতি। রাজ-তন্ত্রের প্রথমদিকে রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা, কিন্তু তাহার পর গণতন্ত্রের নতুন ঢেউ যখন চারিদিকে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে, তখন রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটা গোঁজামিল দেওয়ার জন্য কায়েম করা হয় পার্লামেণ্ট।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মানুষের মনগড়া সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী পৃথিবীতে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষিত হয়। ইহার ফলে পুরানো সমাজব্যবস্থার সংগে সংগে পুরাতন সমস্ত রাজনৈতিক আদর্শও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়া দেখাদেয় পূর্ণ গণতন্ত্র। আর ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দেয় সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম। এই কমিউনিজমের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আদর্শবাদ (Idealism) জাতীয়তাবাদে (Nationalism) পরিণত হয় এবং দেখা দেয় নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ। বলা বাহুল্য, এই দুইটি মতের মধ্যে নাম ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়া বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। বিগত মহাযুদ্ধে এই দুইটি মতাদর্শের বীভৎস হিংসাত্মক ও সাংঘর্ষিকরূপ এবং মানবধ্বংসকারী পাশবিক তৎপরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যদি গণতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদের সংঘর্ষের ফলে হইয়া থাকে, তবে গণতন্ত্র ও কমিউনিজমের সংঘর্ষে হইবে তৃতীয় মহাযুদ্ধ। বস্তুতঃ মানব-রচিত জীবন-আদর্শের ইহাই অনিবার্য পরিণতি। ইহা কোনদিন মানুষকে প্রকৃত শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে পারে না। দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, যুদ্ধ বিগ্রহ, স্বার্থের টানা-হেঁচড়া, মতের ও পথের বৈষম্য মানুষকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। এতদ্ব্যতীত মানুষের গড়া এই সমস্ত নীতি ও আদর্শ সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এই জন্যই উহার অনুগামী মানুষের জীবনও নানাপ্রকার দুঃখ-দুর্ভোগ, ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনা,

www.pathagar.com

যন্ত্রণা ও নিষ্পেষণে জর্জরিত হইয়া পড়িতেছে। মানুষ নিজের বুদ্ধিবলে যতই নূতন নূতন মত ও পথ আবিষ্কার করিতেছে, ততই সে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে।

এই সবের প্রতিকূলে রহিয়াছে খোদার দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা—ইসলাম। ইসলাম বিশ্ব-মানবের জন্য খোদা-প্রদত্ত এক স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল জীবন-ব্যবস্থা। মানব-সৃষ্টির প্রথম দিনেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছে, যুগবিবর্তন ও অবস্থার পরিবর্তনের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে উহার মৌলিক আদর্শ ও ভাবধারায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। আদি পুরুষ আদম হইতে মানব জাতির যে মহাযাত্রা শুরু হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি স্তর ও পর্যায়ে-ই তাহা অত্যন্ত উপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ—অধিকন্তু তাহা অত্যন্ত প্রগতিশীল ব্যবস্থা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ইসলাম মানুষকে উন্নতি ও প্রগতির পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই পথ অত্যন্ত সোজা-সরল ও ঋজু হইয়া পরকাল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পথের প্রত্যেকটি বাঁকে খোদাপ্রদত্ত প্রত্যেকটি দ্রব্য-উপাদানকে মানবতার কল্যাণে প্রয়োগ করার সঠিক পন্থা কি হইতে পারে, ইসলাম তাহা সুস্পষ্ট রূপে জানাইয়া দেয়। ইহার ফলে মানুষ বৈষয়িক জীবনে—অনন্ত জীবনের এই প্রথম পর্যায়ে—চূড়ান্ত মানের উন্নতি লাভ করিতে পারে, আর পরকালীন জীবনে পৌঁছিতে পারে সুখ-শান্তির চরম উন্নত পর্যায়ে।

ইসলামী আদর্শ ব্যতীত অন্য সকলপ্রকার মতাদর্শই ধর্মহীনতা বা খোদা-দ্রোহিতার (Secularism) গর্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উহাদের কোন একটি মতাদর্শেও খোদা, অহী ও পরকালকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই; উহার কোন একটি মতও ইহকাল-পরকাল—মানব জীবনের এই উভয় ক্ষেত্রকে সম্মুখে রাখিয়া ও উভয় ক্ষেত্রে কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা হিসাবে বিরচিত হয় নাই। অথচ মানুষের জীবন এই উভয় ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের কেবল মাত্র ইহকালীন ক্ষেত্রকে সম্মুখে রাখিয়া নিছক বৈষয়িকতার দৃষ্টিতে রচিত কোন জীবন-ব্যবস্থা মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণের ধারক হইতে পারে না; বরং একমাত্র সেই জীবন-ব্যবস্থাই মানুষের সঠিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ, যাহা মানব-জীবনের ইহকাল-পরকাল এই উভয় ক্ষেত্রকে সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সম্মুখে রাখিয়া রচিত হইয়াছে; আর মতবাদের ইতিহাসে এই ধরনের মতাদর্শ হইতেছে একমাত্র ইসলাম।

বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র—ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র, কমিউনিজম এবং ইসলাম

www.pathagar.com

এই তিন প্রকারের মতাদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। কল্পনা এবং বাস্তব উভয় ক্ষেত্র হইতেই পুরাতন মতবাদগুলি চিরতরে বিদায় লইয়াছে, ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্রও পূর্ববর্তি মতবাদসমূহের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। তাহা আর বেশীদিন এই নূতন পৃথিবীতে টিকিতে পারিবে না, এ-কথা নিশ্চিত। অন্যান্য মতবাদের ন্যায় উহার সহিতও ইসলামের কোন দিক দিয়াই কোন সমঝোতা হইতে পারে না। তাই কমিউনিজমের সহিতই হইবে ইসলামের শেষ সংগ্রাম—মানুষের সর্বশেষ আদর্শের লড়াই। যে আদর্শটি মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক হিতসাধন ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে সমর্থ হইবে, মানুষকে ঠিক মানুষের মর্যাদা লইয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে এবং মানুষের মনোজগত ও কর্মজগত এবং ইহজীবন ও পরকালীন জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য নির্ভুল পথনির্দেশ দিতে সমর্থ হইবে, আগামী সংগ্রামে সেই আদর্শই যে জয়যুক্ত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তাহা কোন্ আদর্শ, আজিকার মানুষের পক্ষে কোন্‌টিই বা গ্রহণযোগ্য, আজ তাহা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখা প্রত্যেকটি বিদগ্ধ মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

كذالك يضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فيذهب جفاء -

و اما ماينفع الناس فيمكث فى الارض * (الرعد)

—"আল্লাহ এইরূপেই সত্য এবং বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেন, ফলে যাহা ফেনার মত অন্তঃসারশূন্য তাহা উড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং যাহা মানুষের জন্য কল্যাণকর, তাহাই দুনিয়ায় স্থায়ী হইয়া থাকে।"

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকারিতার বাস্তব প্রমাণ হওয়া নির্ভর করে সেই আদর্শানুগামী সমাজের নিষ্ঠা ও প্রয়োগক্ষমতার উপর। উন্নত, মহত্তর-বৃহত্তর, বিজ্ঞানসম্মত আদর্শও অনেক সময় অক্ষম হস্তে পড়িয়া ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে শক্তিমান, একনিষ্ঠ ও অনমনীয় জন-সমষ্টিও অনেক সময় ভ্রান্ত আদর্শকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া উহার স্থূলতা ও অন্তঃসারশূণ্যতাকে বাহ্যিক চাকচিক্যের সমারোহে মোহময় করিয়া তুলিতে পারে। তাই আগামী সংগ্রামে কেবল-যে আদর্শের পরীক্ষা হইবে তাহাই নয়, সেই সংগে সেই আদর্শের ধ্বজাধারী সমাজের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও প্রাণ-শক্তিরও বাস্তব পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সে পরীক্ষা আজ বিশ্ব-মানবতার একেবারে সম্মুখে উপস্থিত।

www.pathagar.com

ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র

(Secular National Democracy)

বর্তমান দুনিয়ায় যে কয়টি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র অন্যতম। ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র মতবাদটি ধর্মহীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এই তিনটি বিভিন্ন মতাদর্শের সমন্বয়। পৃথক পৃথক-ভাবে ইহাদের প্রত্যেকটি অংশের বিশ্লেষণ না করিলে এই মতবাদটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইবে না। তাই স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি মতের আলোচনা করা যাইতেছে।

ধর্মহীনতা (Secularism)

ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্রের প্রথম পরিচয় এই যে, তাহা ধর্মহীন। ধর্মহীন হওয়ার অর্থ : ইহার জীবন-ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদ কোন ধর্ম বা ধর্ম-তাত্ত্বিক ধারণার উপর স্থাপিত হইবে না। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মানুষ হইবে একেবারেই স্বাধীন ও ধর্মবিমুক্ত। পাশ্চাত্যদেশের এই ধর্মহীনতার (Secularism) মতবাদ ব্যাপকভাবে ঠিক তখনই প্রচারিত হইয়াছিল যখন সে দেশের অধিবাসীরা মনে করিতে শুরু করিয়াছিল যে, ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রীয়-জীবনে উহার কোন প্রয়োজন কিংবা সম্পর্ক নাই। ব্যক্তিগতভাবে কেহ যদি খোদাকে স্বীকার করিতে চায়, কোন ধর্মগ্রন্থ, কোন নবী বা পরকালকে বিশ্বাস করিতে, কিংবা কাহারও পূজা করিতে কেহ ইচ্ছা করে, তবে সে তাহা অনায়াসেই করিতে পারে। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে মানুষ হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও 'স্বেচ্ছাচারী'। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে খোদার সহিত যে সম্পর্ক থাকে, সমাজের ক্ষেত্রে আসিয়া তাহা একেবারেই ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই নীতি অনুসারে সামাজিক ব্যাপারে খোদার কোন কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় না—খোদার কর্তৃত্ব স্বীকারের কোন আবশ্য-কতাও অনুভব করা হয় না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা

www.pathagar.com

ইচ্ছা-বাসনা কিংবা দেশ-চলতি প্রথা অথবা মানুষের রচিত আইন অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য হয়। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালী ও বিষয়বস্তু, সামাজিক নিয়ম কানুন—তথা রাষ্ট্রনীতি কি হইবে, তাহা বিদ্যা-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং ইচ্ছা-বাসনা ইত্যাদি যে কাহারও নির্দেশ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু খোদার নিকট তাহা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না; বা খোদার দেওয়া বিধান অনুসারে তাহা পরিচালিতও করা যাইবে না। বস্তুতঃ ইহাই হইল ধর্মহীনতার গোড়ার কথা।

এই মত গ্রহণ ও অনুসরণ করিলে মানুষের জীবন ধীরে ধীরে খোদা, রসূল এবং তাঁহার দেওয়া বিধান হইতে বহু দূরে সরিয়া যায়। ফলে মানুষের নৈতিক জীবনের কোন স্থায়ী বুনিয়াদ বর্তমান থাকেনা। মানুষ অন্ধ বর্বরের মত কেবল বংশ ও দেশ-প্রথারই পূজা করিতে থাকে। আর পার্থিব সুখ-সুবিধা লাভ করিবার জন্য উদগ্র মাতাল হইয়া উঠে। যে কাজে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করা যায়, মানুষ তখন তাহাকেই মনে করে অতীব উত্তম কাজ। প্রকৃত লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নিরূপনের স্থায়ী কোন মাপকাঠি তখন তাহার নিকট আদৌ স্বীকৃত হয় না। বরং নিছক অভিজ্ঞতাই তখন সত্য-মিথ্যা ও ন্যায় অন্যায় যাচাই করার একমাত্র মানদণ্ড হইয়া পড়ে। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে কাজ বা যে আদর্শ মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহাকেই চূড়ান্ত-ভাবে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করা হয়। পক্ষান্তরে এই উপায়ে যাহা হিতকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাকেই মনে করা হয় পরম উপকারী। আবার গত-কল্যের অভিজ্ঞতায় যাহা কল্যাণকর প্রমাণিত হইয়াছে, আজিকার অভিজ্ঞতায় তাহাই যদি মারাত্মক প্রতিপন্ন হয় তবে তাহাও পরিত্যাজ্য। এইভাবে মানব-জীবনে কোন পথ বা আদর্শ গ্রহণ কিংবা বর্জন করিবার জন্য এমন কোন স্থায়ী মানদণ্ড থাকে না, যাহার আলোকে মানুষ জীবনের সমস্ত লক্ষ্য, গতি, চেষ্টা-সাধনা এবং শক্তি নিয়োজিত করিতে পারে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ মানুষের চরিত্রে ক্রমশঃ এক বহুরূপীয়ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মানুষ তখন তাহাই করিতে শুরু করে—যখন যাহা তাহার মনে ভাল লাগে। কোন বাধা নাই, আদর্শের কোন বালাই নাই, নিয়মের কোন বাঁধাধরা পথ নাই। মানুষ তখন জীবন পথে যে দিকেই ইচ্ছা হয় সেইদিকেই বল্গাহারা অশ্বের মত দ্রুতগতিতে ধাবমান হয়। ইহার ফলে মানুষের চারিত্রিক বুনিয়াদ শিথিল হয় এবং নৈতিক মেরুদণ্ড ভাংগিয়া পড়ে। একজনের পক্ষে যাহা কল্যাণকর অন্যজনের পক্ষে ঠিক তাহাই চরম অপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন ঐহিক সুখ-সম্ভোগের জন্য যে-কোন উপায়ে সম্ভব চেষ্টা করারই নাম

www.pathagar.com

হয় চরিত্র। একজনের যেখানে স্বার্থ অন্যজনের সেখানে ভয়ানক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন কোন নৈতিক আদর্শ নাই, যাহার ভিত্তিতে ইহারা সকলেই সমানভাবে একত্রিত ও একমতাবলম্বী হইতে পারে।

গণতন্ত্র (Democracy)

এই মতাদর্শের দ্বিতীয় অংশ হইতেছে গণতন্ত্র। বিগত দেড় শতাব্দীকাল ধরিয়া মানুষ "জাতীয় সার্বভৌমত্ব (National Sovereignty) অথবা সার্বজনীন প্রভুত্ব (Popular Sovereignty)-কেই গ্রহণ করিয়াছে একমাত্র রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষই মানুষের একমাত্র প্রভু বা আইন রচনাকারী। মানুষের উর্ধে এমন কোন উচ্চতর সত্তা এখানে স্বীকৃত নয়, যাহার বিধান পালন করিতে মানুষ বাধ্য হইতে পারে কিংবা যাহার সন্তুষ্টি লাভ করিবার জন্য মানুষের একটুও চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। গণতন্ত্রে মানুষের সমষ্টিগত ইচ্ছা ও বাসনাই হয় আসল লক্ষ্য—তাহাই পূর্ণ করিবার জন্য রাষ্ট্র একান্তভাবে নিয়োজিত হয়, রাষ্ট্রের সমস্ত উপায়-উপাদান সামগ্রিকভাবে একমাত্র মানুষের ইচ্ছাকেই সার্থক করিবার মানসে নিযুক্ত হয়। এই সামগ্রিক ইচ্ছা-বাসনার উপর কোন বাঁধা বন্ধন বা সীমা নিয়ন্ত্রণ নাই,সে জন্য কোন নৈতিক দায়িত্ববোধও নাই,কোন উচ্চতর শক্তির আরোপিত প্রতিবন্ধকতাও নাই। গণতন্ত্রের মূল থিওরী হইতেছে—Government of the People, for the People, by the People—অর্থাৎ মানুষের উপর—মানুষের দ্বারা পরিচালিত মানুষের প্রভুত্বভিত্তিক শাসন। এখানে মানুষই সর্বেসর্বা। Prof. Hearns How গণতন্ত্রের সংজ্ঞাদান প্রসংগে বলিয়াছেন: "রাজনৈতিক দৃষ্টিতে গণতন্ত্র বলিতে কেবল এতটুকু বুঝায় যে, জাতি সামগ্রিকভাবেই সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব পালন করিবে।" অন্য কথায় বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের জনগণ নিজেদের ইচ্ছামতই রাষ্ট্রকে এমন একটি জবরদস্ত শক্তি (Coercive Power) সংগ্রহ করিয়া দেয়, যাহার আনুগত্য করিতে সকল মানুষই বাধ্য হয়। দেশের পরিচালক সরকার জনমতের অধীন হইয়া থাকে এবং কেবলমাত্র তাহাদেরই মর্জী পুরণ করাই হয় উহার একমাত্র কাজ। এখানে মানুষের শক্তি, ক্ষমতা এবং অধিকার সীমাহীন, নিরংকুশ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য সবকিছুই ঠিক করিবার অধিকার একমাত্র মানুষের। কিন্তু সব মানুষের নয়, সর্বসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই এই অধিকার লাভ করে এবং তাহারাই হয় দেশের সর্বাধি

www.pathagar.com

নায়ক। সত্য কি এবং কোন পথে, এখানে তাহার কোন নিরপেক্ষ বিচার নাই। অধিক সংখ্যক লোক যে মত পোষণ করে, তাহাই হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কাজেই অধিক সংখ্যক লোকের মতই এখানে একমাত্র আইন এবং বিনাশর্তে তাহাই মানিয়া চলিতে হয় দেশের কোটি কোটি জনগণকে। কারণ "মেজরিটি মাষ্ট বি গ্রান্টেড" কথাটি গণতন্ত্রের মূল দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠের এই একাধিনায়কত্বের কারণেই আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকান কংগ্রেসে ভোটাধিক্যের বলে একবার পাশ করা হয় মদ নিষিদ্ধ এবং বর্জনীয়। কিন্তু তাহারই কিছু দিন পর পুনরায় সেই কংগ্রেসের অধিবেশনেই নিছক ভোটাধিক্যের বলে পাশ করা হয়ঃ মদ নিষিদ্ধ নয়—বর্জনীয়ও নয়। গণতন্ত্রের আদর্শে কোন স্থায়ী নৈতিক মানদণ্ড না থাকার দরুন মদের ন্যায় একটি নিষিদ্ধ ও জাতীয় মেরুদণ্ড ধ্বংসকারী বস্তু কখনও বর্জনীয় আর কখনও গ্রহণীয় বলিয়া নিরূপিত হয়। ইহাই হইতেছে গণতন্ত্রের বাস্তব পরিণতি।

যে দেশে এই গণতন্ত্রের শাসন স্থাপিত হয়, সেই দেশের জনগণ স্বাধীন হইয়াও পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরুদলের নিকৃষ্ট গোলামীর নাগপাশে বন্দী হইয়া পড়ে। তাহারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী যে আইন পাশ করিবে, বিনাশর্তে ও দ্বিধাহীন চিত্তে তাহাই সকলকে মাথানত করিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সে আইন সংগত কি অসংগত, সেই আইনে জনগণের কল্যাণ হইবে কি অকল্যাণ, সর্বোপরি সে আইন খোদার বিধানের অনুকূল না বিপরীত সে প্রশ্ন মাত্রই উঠিতে পারে না। সে আইনের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দ বলিবার কাহারও অধিকার নাই—ক্ষমতাও নাই। কেহ তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিলে এই উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না, তখন তাহার স্থান হয় কারাগারের লৌহ প্রাচীরের অন্তরালে। অনেকক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুযায়ী এক একটি আইন পাশ করে, সমগ্র দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ উহাকে ক্ষতিকর মনে করিয়া আত্মসমর্থন করিলে এবং উহার বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন জাগাইয়া তুলিলেও সংখ্যাগুরুদল সেদিকে মাত্রই ভ্রূক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হয় না। গণতান্ত্রিক শাসনে জনগণের নামে ও জণস্বার্থের দোহাই দিয়া জনগণেরই স্বার্থের বিপরীত ও জন-মর্জীর খেলাফ আইন পাশ করা হয়। ইহাকেই বলা হয় 'সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার' (Tyranny of the majority)

এইভাবে গণতন্ত্রের নামের মোহে দেশের কোটি কোটি মানুষ পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরুদলের নিরংকুশ কর্তৃত্বের অক্টোপাশে আবদ্ধ হইয়া চিরতরে হারাইয়া ফেলে নিজেদের সংগ্রামলব্ধ আজাদী। তখন সেই দেশ আর 'স্বাধীন দেশ' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য থাকে না, আর সে দেশের অধিবাসীরাও আর

www.pathagar.com

নিজদিগকে 'স্বাধীন' মনে করিবার অধিকার পায় না। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দেশ নবাব, জমিদার, মহাজন, কোটিপতি আর খাজা-চৌধুরীদের পৈতৃক ভোগদখলের বস্তুতে পরিণত হইয়া যায়। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন দিন ইহার এক বিন্দু ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। গণতান্ত্রিক মতাদর্শের দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। রুশোর (Rousseau) ন্যায় গণতন্ত্রের অন্ধ-সমর্থক ব্যক্তিও তাঁহার Social Contract গ্রন্থে বলিয়াছেন : এই রাষ্ট্রীয় আদর্শ একমাত্র ক্ষুদ্রপরিসর রাষ্ট্রেই বাস্তবায়িত হইতে পারে; কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রের সীমা বিপুলভাবে প্রসারিত, সেখানে ইহা সাফল্যের সহিত কিছুতেই চলিতে পারে না। Alfred cobbon ঠিকই বলিয়াছেন—"গণতন্ত্র হইতেছে একটি কাল্পনিক প্রেয়সী। উহা এক তন্বী কুমারী হইলেও উহা বন্ধ্যা।" (The crisis of civilization)

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যে মৌলিক ও নীতিগত দুর্বলতা রহিয়াছে, তাহা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এখানে ক্রমাগতভাবে নয়টি দিক আলোচনা করা যাইতেছে।

১। ইহাতে নীতিগতভাবে গণ-ইচ্ছার (General will) প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা ই গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা দুর্বলতার কারণ। কেননা প্রথমতঃ সামগ্রিক ইচ্ছার কোন অস্তিত্বই বর্তমান নাই; ইহা এক অসম্ভব কল্পনা মাত্র। তাই গণতন্ত্রে "General will"-এর নামে দলীয় ইচ্ছার (Party will) নিরংকুশ কর্তৃত্ব চলিয়া থাকে। অধ্যাপক লাস্কী (Laski) বলিয়াছেন : কোন জ্ঞান বা বুদ্ধি জনমতের উৎস নহে; বরং দলীয় স্বার্থ হইতেই উহা উৎসারিত হইয়া থাকে। এই জন্য নির্বাচনে এমন সব সিদ্ধান্ত গৃহিত হইয়া থাকে, যাহার কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পেষ করা যায় না।

২। গণ-ইচ্ছার স্থায়ী কোন শক্তি নাই; বরং ইহা অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষণস্থায়ী ও নিত্য পরিবর্তনশীল। উহা অন্য যে কোন প্রবল শক্তির নিকট দমিত হইতে বাধ্য। উহাকে প্রলোভিত, বিভ্রান্ত এবং সামান্য সামান্য ব্যাপারেও ব্যক্তিগত কিংবা শ্রেণীপত ইচ্ছা বা স্বার্থের জন্য যে কোন সময় উত্তেজিত করা অত্যন্ত সহজ। এইরূপ অন্তঃসার শূন্য শক্তির উপর যে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হইবে, তাহা কোনদিনই কোন শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে শক্ত মেরুদণ্ড লইয়া মাথা তুলিতে পারিবে না।

৩। দেশের সাহিত্য, নৈতিক-চরিত্র ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় গণ-ইচ্ছার প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের কোন স্থায়ী নৈতিক মানদণ্ড এবং উহার আইনের জন্য কোন দৃঢ় নৈতিক ভিত্তি বর্তমান

www.pathagar.com

থাকা সম্ভব হয়না। তখন জনগণের মধ্যে কোন খারাব ঝোঁক, লালসা-প্রবণতা জাগ্রত ও উৎকর্ষিত হইলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন তাহার শুধু প্রতিরোধ করিতেই অসমর্থ হয় না, উহার দায়িত্ব ও উন্নতি ক্ষুণ্ন হওয়ার পক্ষে ইহা প্রধানতম কারণ হইয়া পড়ে। যেহেতু এখানে রাষ্ট্র ও আইন উভয়ই গণ-ইচ্ছা ও জনগণের ঝোঁক-প্রবণতার অধীন হইয়া থাকে। ইহার পরিণাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জনগণ এক কদম পরিমাণ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইলে রাষ্ট্র তাহাদিগকে আরও একশ' কদম ধ্বংস-গহ্বরে ঠেলিয়া দেয়। ফলে মানবতার ধ্বংস অতি নিকটে ঘনাইয়া আসে। নৈতিক চরিত্র-হীনতা, পাপ ও অশ্লীলতা গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নতির সংগে সংগে ব্যাপক আকার ধারণ করে। অতীতের ইতিহাস ও বর্তমানের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হইতে এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। আজিকার ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাই উহার লাঞ্ছিত দৃষ্টান্তস্থল; এই জন্যই ধর্মহীন গণতান্ত্রিক দেশে নৈতিক চরিত্রের এমন কোন স্থায়ী মান বর্তমান থাকিতে পারে না, যাহাকে ভিত্তি করিয়া জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জাগ্রত করা সম্ভব।

৪। দলীয় হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, দলত্যাগ ও দলগত কোন্দল গণতান্ত্রিক সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহার ফলে সত্য-ভাষণ ও সত্যপ্রীতির গুণ মানব-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহাতে জাতির নৈতিক ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অতঃপর ইহাই দলীয় স্বৈরাচার ও সংখ্যাধিক্যের জুলুমে পর্যবসিত হয়। কিন্তু ইহা যে গণতন্ত্রের নিকৃষ্টতম নিদর্শন এবং ইহারই দরুন ইউরোপের অসংখ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই সুবিদিত।

৫। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন-রচনার নিরংকুশ অধিকার প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন দলের হাতেই নিবদ্ধ থাকে। তাহাতেও দলীয় শৃংখলার দোহাই দিয়া গণ-প্রতিনিধিদের সত্য-ভাষণ ও সত্য-সমর্থনের অধিকার নির্মমভাবে হরণ করা হয়। ইহার ফলে প্রথমতঃ এই গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। তখন গণতন্ত্র একটি অন্তঃসার শূন্য শ্লোগানে পরিণত হয় মাত্র। আর দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা যেহেতু মানুষ—ফিরেশ্‌তা নয়, তাই তাহাদের রচিত আইন-বিধানে তাহাদের ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতার তীব্র প্রভাব অনিবার্যরূপে পরিলক্ষিত হয়। তখন ক্ষমতাসীন দলের মর্জীই হয় দেশের আইন, উহার স্বার্থ রক্ষাই হয় সুবিচারের একমাত্র মানদণ্ড। অবশ্য এই দল পরিবর্তনের সংগে সংগে সুবিচারের এই মানদণ্ডও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। এইরূপ পরিস্থিতিতে এক-একটি দেশে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য জরুরী অবস্থার সৃষ্টি করা

www.pathagar.com

হয়। তখন কি রাষ্ট্র, আর কি নাগরিক, কাহারও ভাগ্যেই একবিন্দু শান্তি ও স্বস্তি লাভ সম্ভব হয় না।

৬। ইহাতে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের (Opposition party) মধ্যে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও বিরুদ্ধতার ভাব বর্তমান থাকে। প্রথম দল দ্বিতীয় দলটিকে অবদমিত ও পর্যুদস্ত করিতে প্রতিনিয়ত চেষ্টিত থাকে। সরকারী দলের আনিত যে কোন বিলের নির্বিচার বিরোধিতা করাই হয় তখন বিরোধী দলের ধর্ম, পক্ষান্তরে বিরোধী দলের যেকোন সংশোধনীকে ভোটাধিক্যের জোরে বাতিল করিয়া দেওয়ায়ই হয় সরকারী দলের বিজয় উল্লাস। সত্যের আদর্শ না সরকারী দলের হাতে উজ্জ্বল হইতে পারে, না বিরোধী দলের আচরণে। বরং উভয়পক্ষ মিলিয়াই সত্যের নীতি ও আদর্শকে পর্যুদস্ত করিতে থাকে।

৭। পাশ্চাত্য ধারণা অনুযায়ী গণ-ইচ্ছা যেহেতু পরিবর্তনশীল; এইজন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কোন স্থায়ী ও সুদৃঢ় নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; বরং তাহাতে সুবিধাবাদ, বহুরূপীভাব ও অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষণভংগুরতা এত বেশী পরিলক্ষিত হয় যে, উহার প্রতি কি বন্ধুরাষ্ট্র, আর কি শত্রু-রাষ্ট্র—কাহারই বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপিত হইতে পারে না। কোন স্থায়ী নীতি ও আদর্শ অনুসৃত না হওয়ার দরুন উহার আজিকার কোন সিদ্ধান্ত আগামীকাল পরিবর্তিত হইয়া যাইবে কিনা, তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না।

৮। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সহিত সংমিশ্রিত হইলে রাষ্ট্র-ক্ষমতা শুধু পুঁজিবাদিদের হস্তে কুক্ষিগত হওয়া, অথবা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মর্জী অনুসারেই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হওয়া অবধারিত। তখন দেশের গরীব কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোকদের ললাটে চিরস্থায়ী গোলামী লিখিত হইয়া যায়। গণতন্ত্রে ক্ষমতা থাকে সেই দলের হাতে, প্রচার প্রোপাগাণ্ডার বিপুল উপায়-উপাদান এবং জনগণকে প্রতারিত করার কলা-কৌশল যাহার করায়ত্ত থাকে সর্বাধিক। আর এই ব্যাপারে দেশের ধনী ব্যক্তিদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য কেহই যে টিকিতে পারেনা, তাহা রাজনীতিজ্ঞ মাত্রই অবগত। ইংলণ্ডে—যেখানে গণতন্ত্রের প্রেম পাগলামী-সীমাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—কেবল পুঁজিবাদিদেরই কর্তৃত্ব স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থাও অনুরূপ।

www.pathagar.com

৯। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণ কার্য কেবল অর্থনীতিকে কেন্দ্র করিয়াই সম্পন্ন হইতে বাধ্য। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই এই অনিবার্য পরিণতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। কেননা, গণ-ইচ্ছা—যাহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি মূল—ব্যক্তি-ইচ্ছারই সমষ্টিরূপ এবং ব্যক্তি-ইচ্ছা যখন স্রষ্টার অবাধ্য হইয়া পড়ে, তখন লালসা-বাসনা চরিতার্থ করা ভিন্ন জনগণের আর কোনই লক্ষ্য হইতে পারে না। আর ইহাই হইতেছে অর্থনীতির উৎস। এইজন্যই প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেশের আর্থনীতিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিতে এবং উহারই প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে বাধ্য। তখন মানব-জীবনের অন্যান্য নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাবলী উহার দৃষ্টিতে শুধু গৌণই হয় না—একেবারে গুরুত্বহীন বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। মানব-জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগকে অর্থ নীতির অধীন করিয়া দেওয়ার পরিণতি পশ্বাচার ও পাশবিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আজ পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহে তাহাই গোচরীভূত হইতেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ হইতে ধর্ম বা আধ্যাত্মবাদের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। ষ্ট্যালিনের ভাষায় "মানুষকে অর্থ-অর্থ-পাগল করিয়া দেওয়াই হইতেছে তাহাদিগকে ধর্ম ও আধ্যাত্মবাদ বিমুখ করিয়া দেওয়ার সর্বাপেক্ষা কার্যকর হাতিয়ার।"

অর্থ-সমস্যা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করার ফলে গণতন্ত্রের সহিত পুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বর্তমান দুনিয়ার সর্বত্রই পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপিত হইলে, তথায় পুঁজিবাদ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ-ব্যবস্থা চালু হওয়া অসম্ভব। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিম্নলিখিত দুইটির যে কোন একটি অবস্থা হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারে না:

প্রথম এই যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা বর্তমান থাকিবে। এমতাবস্থায় ক্ষমতাসীন দল হয় পুঁজিপতি হইবে, না হয় অন্ততঃপক্ষে পুঁজিপতিদের ক্রীড়নক বা দালাল হইবে। ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাংক অব্ ইংলণ্ড (Bank of England)-এর ডিরেক্টর ও প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদা সম্পূর্ণ সমান। বরং শাসনতান্ত্রিক আইনে পারদর্শীদের বিরাট একদলের দৃষ্টিতে প্রধান মন্ত্রীর পদ অপেক্ষাও ডিরেক্টরের পদ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে ফ্রান্স-ব্যাংকের (Banquede France) ডিরেক্টর ফরাসী সরকারের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে যে, সরকার তাহার ইশারা-কটাক্ষের বিপরীত কোন কাজ করিতে পারেনা। এমন কি, সরকার যদি তাহার ইংগিত অনুসারে কাজ করিতে অসমর্থ বা অপ্রস্তুত হয়, তবে সে ইস্তেফা দিতে বাধ্য হয়। এই

www.pathagar.com

ব্যাংকের ইচ্ছানুসারে ফরাসী মন্ত্রী-সভার যে কতিপয় উত্থান-পতন ঘটিয়াছে ফ্রান্সের নিকট-অতীতের ইতিহাস-অভিজ্ঞ মাত্রই সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

দ্বিতীয় অবস্থা এই হইতে পারে যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় পুঁজিবাদ নয়, অন্যকোন অর্থব্যবস্থা—যেমন কমিউনিজম—বর্তমান থাকিবে। এই অবস্থায়ও কিছুদিন পরেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেননা এইরূপ অবস্থায় যে দলই গণতান্ত্রিক সরকারের কর্ণধার হইবে, সে দলই গোটা জাতীয় ধন-সম্পদ করায়ত্ত করিয়া লইবে এবং জন-স্বার্থের বিপরীত শুধু দলীয় স্বার্থের বেদীমূলে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে উজাড় করিয়া দিবে। এহেন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যে কত মারাত্মক, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

এই মতাদর্শের তৃতীয় অংশ হইতেছে জাতীয়তাবাদ। জাতি বা 'নেশন' বলিতে মানুষের একটি সমষ্টিকে বুঝায়; বংশ, গোত্র, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও তামাদ্দুনিক ঐক্য এবং ভৌগোলিক আঞ্চলিকতার উপর সাধারণতঃ জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে জাতীয়তার এই ভিত্তির মূলগতভ্রান্তি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এই জাতীয়তার বোধ যখন সামগ্রিকভাবে একটি সক্রিয় আন্দোলনে রূপায়িত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত মারাত্মক (agressive) হইয়া পড়ে। বিগত দুইশ' আড়াইশ' বৎসর কাল ধরিয়া এই জাতীয়তাবাদের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সভ্য দুনিয়ার তাহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থ ও সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবার জন্য জাতীয় উপায়-উপকরণ নিযুক্ত করা নীতি অনুসারে অপরিহার্য কর্তব্য। জাতির পক্ষে যাহা উপকারী, তাহাই মংগল, তাহাই পুণ্যের কাজ। পক্ষান্তরে জাতির পক্ষে যাহা উপকারী নয়; কিংবা যাহা ক্ষতিকর তাহাই পাপ, তাহাই অন্যায়; অতএব তাহাই পরিত্যাজ্য। ইহাই হইতেছে জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভংগী। জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত প্রত্যেকটি জাতি স্বার্থলাভকেই নিজেদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। সমাজের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির যাহা মর্যাদা, বিশ্বমানব ভ্রাতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয়তাবাদ ঠিক তাহাই। সমাজের বুকে একটি ব্যক্তি যদি কেবল নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কাজ করে, কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ করিবার জন্যই যদি সে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ ও চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত

www.pathagar.com

করে এবং এইভাবে হীন স্বার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ; পক্ষান্তরে যাহা নিজের স্বার্থের পরিপন্থী, তাহাকেই যদি সে পাপ ও পরিহার্য বলিয়া মনে করে এবং এই লাভ ও ক্ষতির ধারণার ব্যাপারে সে যদি পরের স্বার্থ ও লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে মোটেই চিন্তা না করে ; তবে এই ব্যক্তিকে সমাজ নিশ্চয়ই স্বার্থ-পর, প্রবৃত্তির পূজারী এবং ভয়ানক লোভী বলিয়া আখ্যা দিবে। সেই ব্যক্তি যদি সমাজের বুকে বসিয়া নিজের স্বার্থের খাতিরে ব্ল্যাক্‌মার্কেটিং করে, চুরি-ডাকাতি কিংবা প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করে, তবে সে সমাজের মারাত্মক শত্রু, সন্দেহ নাই ; কারণ সমাজের বুকে থাকিয়া, সামাজিক জীবনযাপন করিয়াও সে কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পরের স্বার্থের উপর—অন্য কথায়, সমাজের ভিত্তিমূলে—কুঠারাঘাত করে। সামগ্রিকভাবে মানব-জগতে অন্ধ জাতীয়তাবাদের (Nationalism) অবস্থাও ঠিক তাহাই। রাষ্ট্র গঠন করে জাতি, জাতিই নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জাতির সমষ্টিগত উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্যই একান্তভাবে নিয়োজিত হয় রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি সামর্থ ও উপায়-উপকরণ। যে জাতি নিজের লাভ ও স্বার্থকেই একমাত্র পুণ্য ও কল্যাণ-কর কাজ বলিয়া মনে করে, সে জাতির নিকট চরিত্র বা নৈতিক আদর্শ বলিতে কিছুই থাকিতে পারে না, থাকিতে পারে না কোন স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধ। ধর্মহীনতাই তাহাকে একেবারে বল্গাহারা করিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় পেঁছাইয়া দেয়। এই অবস্থায় প্রত্যেকটি জাতি চরিত্রের মূল্য এবং ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছামত রচনা করিতে শুরু করে। বস্তুতঃ ধর্মহীনতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র এই তিনটি মৌলিক মতাদর্শের ভিত্তিতে যদি কোন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়,তবে তাহা সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী তথা বিশ্ব-মানবের পক্ষে মোটেই শান্তিদায়ক ও কল্যাণবিধায়ক হইতে পারে না। বরং তাহা দুনিয়া-ব্যাপী সৃষ্টি করিবে ফেতনা-ফাসাদ এবং অশান্তি ও বিপর্যয়ের তাণ্ডব নৃত্য।

জাতীয়তাবাদের এই মারাত্মক ভূমিকা সম্পর্কে প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁহার 'শিক্ষা ও সমাজ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

> "জাতীয়তাবাদ" বা জাতি-পূজা এই যুগে মদ্যপান, ব্যবসার ক্ষেত্রের বেঈমানী অথবা অন্যকোন নৈতিকতাবিরোধী পাপ অপেক্ষা অনেক বেশী মারাত্মক। জাতিপূজা খতম না হইলে সভ্যতা রক্ষা পাইতে পারেনা। জাতিপূজা নীতিগতভাবেই এক পৈশাচিক ব্যাপার, আযাদীযুদ্ধে লিপ্ত জাতি সমূহের মধ্যেও উহা প্রচার হওয়া উচিৎ নহে।"

এ কথায় এখন আর এক-বিন্দু সন্দেহ নাই যে, বর্তমান দুনিয়ায় এই যে অশান্তি, জুলুম, শোষণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে, ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

মতবাদ বা রাষ্ট্রনীতিই ইহার মূল কারণ। ইহারই জন্য আজ পরিষ্কার মনে হইতেছে যে, বর্তমানে সমগ্র দুনিয়ার উপর কেবল চোর, ডাকাত, গুণ্ডা ও বদমায়াশদেরই রাজত্ব চলিতেছে এবং তাহারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ লুটিয়া লইবার জন্য, সমগ্র মানুষকে নিজেদের স্বার্থ ও পাশবিক বৃত্তির নিকৃষ্ট গোলাম বানাইবার জন্য সর্বগ্রাসী মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। আজ মনে হয়, বিচার ইনসাফের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা খোদার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহা "লাঠি এবং শক্তির" হাতেই সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর Right is might (সত্যই শক্তি) -এর পরিবর্তে Might is right (শক্তিই সত্য) এই মত চরম সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্রের এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিবার পরও যদি বর্তমান দুনিয়ার মানুষ এই মতে আকৃষ্ট হইয়া ইহা গ্রহণ করে এবং সেই অনুসারে নিত্য নূতন রাষ্ট্র কায়েম করে, তবে তাহাতে দুনিয়ায় ফাসাদকারী রাষ্ট্রগুলির সংখ্যাই উত্তর-উত্তর বৃদ্ধি পাইবে মাত্র, নতুবা দুনিয়ার কোন কল্যাণই তাহাতে সাধিত হইবে না। প্রসংগতঃ এই কথাও জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, এই ধর্মহীন গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ হিসাবে একবার স্বীকার করিয়া লইলে পর অনন্তকাল পর্যন্ত সেখানে ধর্মভিত্তিক মতাদর্শের কোন কথাই উঠিতে পারে না। আর সেই জালেম ও স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের অধীন ইসলামের পূর্ণাংগ আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনের বিন্দুমাত্র সুযোগ লাভ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ধরনের মতাবলম্বীদের সম্পর্কেই আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا
أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۝
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا * (محمد)

—"তোমরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিতে পারিলে তোমরা পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে এবং মানবতার সহিত যাবতীয় সম্পর্ক-ছিন্ন করিয়া ফেলিবে—ইহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। এইরূপ যাহারা করে তাহাদের উপর খোদার অভিসম্পাত; তাহাদের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তি অপহৃত হইয়াছে কি? তাহারা কি কোরআন পড়িয়া চিন্তা ও গবেষণা করে না? কিংবা ইহাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ হইয়া আছে (যে, তাহারা কোরআন পাঠ করিয়াও তাহা হৃদয়ংগম করিতে পারে না)?

www.pathagar.com

কমিউনিজম

ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্রের পর দ্বিতীয় যে মতটি বিশ্ব-মানবতার সম্মুখে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে কমিউনিজম। কমিউনিজম মূলতঃ একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ হইলেও উহার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণও কম গুরুত্ব-পূর্ণ নহে। বরং উহার অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে উহার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ। কাজেই উহার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ চূর্ণ হইলে উহার রাজনৈতিক ব্যবস্থাও স্বতঃই ধূলিসাৎ হইতে বাধ্য।

কমিউনিজমের মূল দর্শন এখানে আলোচ্য নহে।[১] এখানে আমরা উহার রাষ্ট্র-দর্শন ও রাজনৈতিক ভূমিকার বিশ্লেষণ করিব মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, কমিউনিজমের রাজনীতি উহার অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই স্থাপিত। উহার দৃষ্টিতে দেশের অর্থোৎপাদন ও বণ্টননীতিকে কেন্দ্র করিয়া উহার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতি গড়িয়া উঠে। দেশের শ্রমিক-মজুর-রাই যেহেতু ধন-উৎপাদনের একমাত্র নিয়ামক, তাই এই উৎপাদন-পদ্ধতি ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত হইবে মেহনতী জনতার উপর এবং দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদানকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্ধ কুঠরি হইতে মুক্ত করিয়া উহার উপর জাতীয় ও সমষ্টিগত মালিকানা চাপাইয়া দিতে হইবে---ইহাই হইতেছে উহার দৃষ্টিতে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। অন্য কথায়, সমগ্র দেশে মজুর-শ্রমিকদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও শাসনকর্তৃত্ব (Dictatorship of proletahiate প্রতিষ্ঠা করাই হইতেছে কমিউনিজমের রাষ্ট্র-দর্শনের গোড়ার কথা। 'কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো'তে কার্লমার্কস্ এই কথাই বলিয়াছেন সুস্পষ্ট ভাষায়ঃ "গণতন্ত্রের লড়াই লড়িবার জন্য মজুর-বিপ্লবের প্রথম কাজ হইতেছে

(১) কমিউনিজম-এর মূল দর্শন ও ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা করিতে হইলে পাঠ করুন মৎ প্রণীতঃ (ক) 'মার্কসীয় দর্শন' এবং (খ) 'কমিউনিজম ও ইসলাম' নামক গ্রন্থদ্বয়।

www.pathagar.com

প্রোলেটারিয়েটদের ক্ষমতাসীন করা।" মার্কস ইহার আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলেন: প্রোলেটারিয়েটগণ বুর্জোয়াদের নিকট হইতে ক্রমশঃ সমগ্র সম্পদ কাড়িয়া লইবার জন্য নিজেদের রাষ্ট্র-শক্তিকে ব্যবহার করিবে এবং উৎপাদন যন্ত্রসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া কেন্দ্রীভূত করিয়া দিবে। এক কথায়, প্রোলেটারিয়েট-দিগকে একটি শক্তিসম্পন্ন শ্রেণী হিসাবে সুসংগঠিত করা হইবে।"

বাহ্যদৃষ্টিতে এই মতাদর্শ খুবই চিত্তাকর্ষক ও জনগণের পক্ষে কল্যাণকর মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে গোটা মানবতার সর্বাত্মক ধ্বংসের বীজ। কেননা এক-একটি জাতির বৃহত্তর জাতীয় শক্তির উৎস হইতেছে মাত্র দুইটি: একটি রাষ্ট্রশক্তি, আর অপরটি জাতীয় অর্থ-সম্পদ। স্বাভাবিক ও সুস্থ সমাজে এই দুইটির বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। যে সমাজে এই দুইটি শক্তি-উৎসই বিশেষ এক ব্যক্তি বা শ্রেণী অথবা একটি দলের কুক্ষিগত হয়, সে সমাজে সর্বধ্বংসী এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইয়া উপায়ান্তর থাকেনা এবং সেখানে জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা শুধু সংকোচিত ও প্রতিহতই হয় না — সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। জনগণ সেখানে মুষ্টিমেয় লোকদের জবরদস্তীমূলক শাসন-যন্ত্রের তলে নির্মমভাবে রাত্রি-দিন নিষ্পেষিত হইতে বাধ্য। খোদার সৃষ্টস্বাধীন মানুষের উপর চাপিয়া বসে এক-নায়কত্বের জগদ্দল পাহাড়। নিম্নে ইহার বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

কমিউনিজমের বাস্তব রূপ

কমিউনিজমে সমগ্র উৎপাদন-উপায় জাতীয়করণ (Nationalisation) করিলেও জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তো আর ধন-সম্পত্তি ও উপায়-উপাদানগুলির ব্যবহার কিংবা পরিচালনার ভার বহন করিতে পারে না। বরং তাহার বিলি ব্যবস্থা এবং উহাকে কার্যকর করার জন্য বাধ্য হইয়াই কিছুসংখক লোক লইয়া একটি কর্মপরিষদ অবশ্যই গঠন করিতে হয়। বর্তমান রাজনীতির ইহা এক স্বতঃসিদ্ধ কথা। সেই নির্বাচিত কর্মপরিষদই জাতির সমস্ত কাজকর্ম সংশোধিত করে। তথায় সেই কর্মপরিষদ যদি বিশেষ একটি দলের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তবে সেই নির্দিষ্ট এক পার্টির হস্তে রাষ্ট্র-শক্তি কুক্ষিগত হওয়ার পর অন্য কোন দলের পক্ষে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করা কোন দিনই সম্ভব হয় না। একটা দেশের সমস্ত জমি-ক্ষেত, কল-কারখানা, শিল্প-ব্যবসায় এবং আয়-উৎপাদনের যাবতীয় উপায়-সূত্র যদি নিরংকুশভাবে একটি দলেরই কুক্ষিগত হয় তবে উৎপন্ন দ্রব্য বন্টন—অন্যকথায় দেশের বিপুল জনগণের জীবিকার সংস্থান করাও কেবল তাহাদেরই অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই শক্তিমান দল যদি অবিচার

www.pathagar.com

জুলুম ও স্বৈরাচারের ষ্টীম রোলার চালাইতে শুরু করে, তবে তাহার প্রতিবন্ধকতার কি উপায় হইতে পারে ?

গণতান্ত্রিক উপায়ে এই দলকে শক্তির আসন হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিলে রাষ্ট্রকর্তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ কারবারের তীব্র সমালোচনা করা অপরিহার্য হইবে। তাহাদের দোষ-ত্রুটিগুলি দেশবাসীর সম্মুখে পরিষ্কাররূপে ধরাইয়া দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। এই সব কিছু করার পরই সেই পার্টিকে গদিচ্যুত করা হয়ত বা সম্ভব হইতে পারে—তাহার পূর্বে নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে এইরূপ করা আদৌ সম্ভব নহে। কেননা এই ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যদি কেহ এহেন শক্তিমান দলের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করিতে শুরু করে তবে সেই পার্টি নির্মম-ভাবে স্বৈরাচার ও দমন-নীতি অবলম্বন করিবে, সরকার বিরোধীদের 'রেশন' বন্ধ করিয়া দিবে। দিনের বেলা কেহ সেই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিলে সন্ধ্যাবেলা তাহার খোরাক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাকে কাগজ দেওয়া হইবে না—কোন বই প্রকাশ করিয়া তাহার সে মতবাদ বা রাষ্ট্রনায়কদের দোষ-ত্রুটির কথা জনগণের মধ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হইবে না। সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য সে যেমন কোন ডিক্লারেশন পাইবে না, তেমনি প্রেসের সহযোগিতাও লাভ করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত সভা-সমিতি করিয়া জনমত গঠন করিবারও কোন অধিকার বা সুযোগ তাহাকে দেওয়া হইবে না। এইভাবে কমিউনিষ্ট সরকার সাম্যের পাদপীঠ 'মজদুর রাজ' কায়েম করার পর, দেশের সমগ্র নাগরিকদের সকলপ্রকার প্রগতিমূলক প্রচেষ্টা ও সার্বজনীন, কল্যাণকর ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে অংকুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়। এহেন শাসন-ব্যবস্থার অধীন কোন মানুষ স্বাধীন ভাবে কোন কিছু চিন্তা করিতে এবং নতুন কোন কল্যাণকর আদর্শ কবুল করিয়া উহার প্রচার করিতে কিছুমাত্র সুযোগ পায় না। দেশের প্রত্যেকটি লোকই তখন হয় 'বেতনভূক' চাকর ; প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই 'রেজেক'—জীবন যাপনের যাবতীয় উপাদান থাকে রাষ্ট্রের তথা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের নিরংকুশ অধিকারে। পরাধীন দেশের সরকারী চাকরীজীবীদের পক্ষে কোন স্বাধীন মত গ্রহণ করিয়া জীবন-যাপনের কোন স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করা যেমন সম্ভব নয়, এহেন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অধীন সমগ্র দেশের কোটি কোটি মানুষের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ পিঁজ্‌রাবদ্ধ পাখীর মত হইতে বাধ্য। প্রথমে যাহারা খুব আনন্দের সহিত কমিউনিজমের এই আদর্শ কবুল করে, উহা স্থাপিত

www.pathagar.com

হওয়ার পর সে দেশে এমন একদিন আসে, যখন তাহারা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখন সে কান্নার কোন ফলই পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, তখন তাহারা একটু শব্দ করিয়া কাঁদিতে শুরু করিলে রাষ্ট্রের টিক্‌টিকিরা তাহাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়া দেয়। তখন এই রাষ্ট্র দেশের প্রত্যেকটি কোণে ও কেন্দ্রে গুপ্ত-পুলিশের গোপন জাল ছড়াইয়া দেয়। এমন কি, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, পিতার বিরুদ্ধে কন্যাকে এবং মায়ের বিরুদ্ধে পুত্রকে "জাসুস" নিযুক্ত করে। আর রাষ্ট্রকর্তাদের বিরুদ্ধে কাহার মনের গহনে কি খেয়াল ও ধারণা আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা অজ্ঞাতসারেই জানিয়া লয়। দুনিয়ার ইতিহাসে কোন "জার" কিংবা "কাইজার" অথবা কোন হিট্‌লার কিংবা মুসোলিনীর পক্ষে অতখানি নিরংকুশ একাধিনায়কত্ব লাভ করা সম্ভব হয় নাই, যতখানি সম্ভব হইয়াছে একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে উহার একচ্ছত্র অধিনায়কের পক্ষে।

এতদ্ব্যতীত ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যত অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং সেখানে মানবতার আযাদী যতখানি ক্ষুণ্ন হয়, এহেন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে তাহা সে অপেক্ষা বেশী ক্ষুণ্ন হইয়া থাকে। এই রাষ্ট্রও কোন স্থায়ী ও মজবুত আদর্শের অনুগামী নয়, যে কোন পন্থায় এবং যে কোন উপায়েই মতলব হাছিল হইতে পারে, উহার দৃষ্টিতে সেই সকল পন্থা ও উপায়ই অতীব সংগত বলিয়া বিবেচিত হয়। কমিউনিষ্ট, রাষ্ট্রে অন্ধ জাতীয়তাবাদও সহজেই মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ধর্মহীন—আর প্রকৃত ব্যাপারে ধর্মবিরোধী জাতীয়-কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র উহার সকল উপায়-উপাদানকে চিরদিনই জাতীয়তাবাদের অগ্নিযজ্ঞে আহুতি দিয়া থাকে। উহার ভিত্তি যদি জাতীয়-সমাজতন্ত্রের উপর স্থাপিত হয় এবং তাহা যদি এই জাতীয়তাবাদের অন্ধগোড়ামীতে নিমজ্জিত হয় তবে উহা আরও অধিক শক্তি ও একচ্ছত্র প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও নিরংকুশ আধিপত্য লাভ করিবার জন্য তাহার সমস্ত উপায়-উপাদানকে নিযুক্ত করে। ফলে আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠে সেই সাম্রাজ্যবাদ ও ডিক্‌টেটরবাদ, যাহার অভিশাপ হইতে বাঁচিবার জন্য বিশ্ব-মানব আবহমান কাল ধরিয়া আকুল আকুতি জানাইতেছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে আর কোন দিনই প্রকৃত শান্তি এবং মানবতার প্রকৃত মর্যাদা যথাযথ ভাবে স্থাপিত হইতে পারেনা। বিরাট কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র উহার প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে কমিউনিষ্ট প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে প্রথমতঃ আদর্শ ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের জাল বিস্তার করিতে চেষ্টা করে এবং অতঃপর বিড়ালের ইঁদুর শিকারের মত উহাকে দুর্বল ও অন্তঃসার শূন্য করিয়া সর্বশেষে এক আকস্মিক আক্রমণের সাহায্যে চিরতরে গ্রাস করিয়া লয়। আজার-

www.pathagar.com

বাইজান, চীন, তিব্বত ও কোরিয়ার নির্মম ভাগ্য-বিপর্যয়ই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে কি আভ্যন্তরীণ, কি বাহ্যিক—কোন প্রকার শান্তিই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আর তাহা দুনিয়ার বুকে কোন ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপন্থী আদর্শজাতি গঠন করিতেও সমর্থ হয় না। খোদার সৃষ্ট আশ্‌রাফুল মাখলুকাতের পক্ষে তাহা মর্মান্তিক ট্রাজেডী ছাড়া আর কি হইতে পারে?

কোরআন শরীফ এই শ্রেণীর মতবাদ ও উহার প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে পরিষ্কার বলিয়াছে:

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا - الذين ضل سعيهم
في الحيوة الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا - اولئك
الذين كفروا بايات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم
يوم القيمة وزنا - (الكهف)

—"যাহাদের জীবন-ব্যাপী কাজকর্ম ও চেষ্টা-সাধনা চরমভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, মারাত্মক ভ্রান্ত পথে চলাই তাহাদের কাজ; অথচ তাহারা খুব ভাল কাজ করিতেছে বলিয়া মনে মনে ধারণা করে, তাহাদের কথাই বলিতেছি! —ইহারা তাহারাই, যাহারা সৃষ্টিকর্তার বিধান ও তাঁহার পরকালীন সাক্ষাৎ-সম্ভাবনাকে অমান্য ও অস্বীকার করিয়াছে এবং কেবল এই জন্যই তাহাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। কিয়ামতের দিন আমরা তাহাদের কাজের কোন মূল্যই দিব না'।

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনীতি

অতঃপর আমি ইসলামী রাজনীতির বিশ্লেষণ করিতে চাই। ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র ও কমিউনিজমের পরে ইহা হইতেছে দুনিয়াবাসিদের সামনে তৃতীয় মতাদর্শ। দুনিয়ার পক্ষে কোন্ রাষ্ট্রনীতি কল্যাণকর এবং সমগ্র পৃথিবীতে কোন্ ব্যবস্থা স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ, এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাহা পাঠকদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ইসলামী রাজনীতির গোড়ার কথা হইতেছে খোদার প্রভুত্ব—Sovereignty and Rulership of God। খৃষ্টানদের মতে ইহার নাম "খোদার বাদশাহী", (Kingdom of God) হিন্দুরা বলেন "রাম রাজত্ব", আর ইস্‌লামী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে ইহার নাম "হুকুমাতে ইলাহিয়া" বা "ইসলামী রাষ্ট্র"।

ইসলামী রাজনীতির দৃষ্টিতে কোন দেশের অধিবাসীরাই দেশের প্রকৃত মালিক নয়; বরং সেই মহান খোদাই হইতেছেন সমগ্র দেশ ও রাজ্যের প্রকৃত মালিক, যিনি দেশ, উহার অধিবাসী—তথা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে নিজ ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতির অ, আ, ক, খ, যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের একথা অজ্ঞাত নয় যে, প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্বই (Sovereignty) হইতেছে রাষ্ট্রনীতির মূলকথা। ইহা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। ইহার সংজ্ঞা প্রসংগে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার সার কথা এই যে, নির্দেশদান ও ক্ষমতা প্রয়োগের সেই উচ্চতর ও স্বাধীন উৎসকেই Sovereignty বা সার্বভৌমত্ব বলা হয়, যাহা সকলে অকুণ্ঠিতভাবে মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। এই জন্য যে, উহাই হইতেছে উচ্চতর শক্তির আধার। উহা কখনও ভুল করিতে পারে না। ভুল করিলে উহাকে সার্বভৌমত্বের আধার বা উৎস রূপে কিছুতেই মানিয়া লওয়া যায় না। উহার ভুল-ভ্রান্তি যাচাই করার ব্যাপারে জনসাধারণের কোনই অধিকার থাকিতে পারে না। সাধারণের মনগড়া ভাল-মন্দের মানদণ্ডে উহার কাজ-কর্ম যাচাই করা অসম্ভব; বরং সাধারণের জন্য

www.pathagar.com

ভাল-মন্দ যাচাই করার মানদণ্ড রচনা করাও উহারই দায়িত্ব এবং অধিকার।... উহা কখনও জুলুম বা পক্ষপাতিত্ব করিতে পারে না। উহার ক্ষমতা ও অধিকারকে কেহ বিন্দুমাত্র সংকোচিত করিতে পারে না। অধ্যাপক ব্রজিস্ বলিয়াছেন : "সার্বভৌমত্ব বলিতে আমি বুঝি সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সীমাহীন ও সর্বাত্মক ক্ষমতা, যাহা রাষ্ট্র উহার প্রজাসাধারণের প্রত্যেকটি ব্যক্তি এবং উহার প্রত্যেকটি সমষ্টির উপর নিরংকুশভাবে প্রয়োগ করিতে পারে।"

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মতে "সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকলের উপর স্থাপিত এক অপ্রতিহত ক্ষমতা। ইহা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রজা ও প্রত্যেক জনসংঘের উপর শাসন করিবার ও বশ্যতা আদায় করিবার সীমাহীন ক্ষমতা। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্ব, যাহার ফলে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বা অপর কাহারও নিকট আইনতঃ দায়ী হইতে পারে না, এই ক্ষমতার কারণে অন্য কোন শক্তিই রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারে না। সার্বভৌমত্ব থাকার জন্যই রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারে অগাধ কর্তৃত্ব করিবার অধিকারী হইয়া থাকে; অনুরূপভাবে সার্বভৌমত্ব গুণের জন্যই রাষ্ট্র বাহিরের সকল শক্তির অধীনতা বা নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

এই প্রভুত্ব যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে সেই ব্যক্তি-বিশেষের মনস্কামনা (Individual will) পূর্ণ করাই হয় রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন রাজতন্ত্র বা ডিক্টেটরবাদই হয় দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। আর প্রভুত্ব যদি কোন জাতি-বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণের, তথা সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও বাসনা (General will or National will) পূর্ণ করাই হয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য। পক্ষান্তরে প্রভুত্ব যদি খোদার হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বা শ্রেণীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবেনা, তখন রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি ও সামর্থ্য এবং যাবতীয় উপায়-উপাদানকে একান্তভাবে নিয়োজিত করা হইবে একমাত্র খোদার মর্জী সার্থক করিবার জন্য।

এইভাবে সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন উৎস স্বীকার করার কারণেই মানব সমাজে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এই দিক দিয়া দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকারের রাষ্ট্র হইতেছে তাহা যাহাতে খোদা ছাড়া অন্য কাহারও—এক ব্যক্তির, বংশের, জাতির বা কোন দেশের জনগণের—সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। এইরূপ রাষ্ট্রকেই বলা হয় ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র। আর যাহাতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা খালেছ ইসলামী রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনীতিতে এই সার্বভৌম প্রভুত্ব (Sovereingty) একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। তাঁহার উচ্চতর প্রভুত্ব, একচ্ছত্র মালিকানা এবং নিরংকুশ শাসন-ক্ষমতা – এই উভয় দিক দিয়াই অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং অংশীহীন। বিশ্ব-নিখিলের প্রত্যেকটি বস্তুই খোদার একচ্ছত্র প্রভুত্বের অধীন ও উহার অনুগত হইয়া আছে: و له اسلم من فى السموت و الارض খোদার এই সৃষ্টি-রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই ; এই ব্যাপারে কেহই তাঁহার শরীক নয়— لم يكن له شريك فى الملك আর শাসন-ক্ষমতা ও আইন-রচনা এবং প্রভুত্বের নিরংকুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার। কোন ব্যক্তি মানুষ, পার্লমেণ্ট বা কোন রাজশক্তিও এই দিক দিয়া তাহার অংশীদার হইতে পারে না। কারণ কোরআনের ঘোষণা : ان الحكم الا لله । "প্রভুত্ব ও আইন রচনার মৌলিক এবং চূড়ান্ত অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র" এবং لا يشرك فى حكمه احدا —"আল্লাহ্‌র এই প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকার নিরংকুশ, অন্য কেহই তাঁহার অংশীদার হইতে পারে না, কাহাকেও তিনি একাজে তাহার শরীক করেন না।" প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লেঞ্চলী বলেন : "সার্বভৌমের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের মধ্যেই নিহত"।

কোরআন বহু শতক পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছে : فعال لما يريد 'সার্বভৌম নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগে পূর্ণ স্বাধীন ও নিরংকুশ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার অধিকারী। তাঁহার এই স্বাধীনতাকে কেহ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাঁহার উপরও কোনরূপ বাধ্যবাধকতা কেহই আরোপ করিতে পারে না। কোরআনের ঘোষণা : لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون —সার্বভৌম যাহা করেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে না, তিনি কাহারও নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। বরং সকলেই একমাত্র তাঁহার সমীপেই জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য'। সার্বভৌম সর্বোতভাবে الملك القدوس السلام । মহৎ, মহান। মহানত্ব তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। এই গুণ বিশেষ ভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট (مفردات امام راغب)। বস্তুতঃ খোদার সার্বভৌমত্ব সর্বাত্মক ও অবিভাজ্য।

www.pathagar.com

ইহাই হইতেছে তওহীদের মূল কথা। ইহাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া এক-এক ভাগের জন্য এক-একজনকে সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করা পরিষ্কার শির্ক।

সার্বভৌমত্ব (sovereignty) শব্দটির অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রকাশের জন্য কোরআন মজীদে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি শব্দ ব্যাখ্যা সহ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) "মালাকুত"— ملوت ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ অধিকারী হইতেছেন একমাত্র আল্লাহতায়ালা। এই কারণে কোরআন মজীদে 'মালাকুত' শব্দটি কেবলমাত্র খোদার জন্যই বিশেষ-ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বলা হইয়াছে:

من بيده ملكوت كل شيء

"সমগ্র জিনিসের সার্বভৌমত্ব কাহার হস্তে নিহিত"?

ইহার জওয়াবে বলা হইয়াছে:

فسبحن الذى بيده ملكوت كل شيء

—"মহান পবিত্র সেই সত্তা, যাঁহার হস্তে সবকিছুরই সার্বভৌমত্ব নিহিত।"

كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموت والارض - (الانعام)

"—এইভাবেই আমরা ইবরাহীমকে আকাশ রাজ্য ও ভূমণ্ডলের উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌমত্বের বিস্ময়কর দৃশ্য সমূহ দেখাইয়া দেই।"

কোরআন একদিকে প্রশ্ন তোলে; অপর দিকে উহার সুস্পষ্ট ও দৃঢ়তা-ব্যাঞ্জক জওয়াবও উপস্থাপিত করে। ইহা হইতে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা মেলে।

(২) ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'মালাকুত' এর পরিবর্তে 'সুলতান' (سُلْطَان) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কোরআনের পরিভাষায় ইহার অর্থ হইতেছে: আধিপত্য, আর সঠিক তাৎপর্য: সার্বভৌমত্ব। ইমাম রাগেব ইছফাহানী ইহার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন:

التمكن من القهر - (مفردات - ص ٢٣٨)

"প্রবল পরাক্রম সহকারে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।"

www.pathagar.com

অন্যত্র লিখিয়াছেন : هو التصريف بالامر و النهى فى الجمهور "জনগণের মধ্যে আদেশ ও নিষেধের বিধান প্রয়োগ করার প্রশাসনিক ক্ষমতা পরিচালনা করা।"

আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন : هو اسم لكل من يملك السياسة "জনগণকে শাসন করার যে কোন কর্তৃত্বশালীকেই বলা হয় সুলতান।"

আল্লামা, আ-লুসীর মতে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সত্তাই সার্বভৌম। আর মালাকুত অর্থ : سلطان قاهر 'স্বীয় প্রবল পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত শক্তি।'

সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়

সার্বভৌম বলিতে কি বুঝায়? উহার পরিচয় কি? কি উহার বৈশিষ্ট্য? উহাকে কেমন করিয়া চিনিতে পারা যায়?

কোরআন মজীদে সমাজ-ব্যবস্থায় সার্বভৌমের যে পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই যুগের রাজনীতিতেও স্বীকৃত হইয়াছে। (রুশোর 'Social Contract' ও ব্লেঞ্চলীর 'রাষ্ট্র দর্শন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) কিন্তু এই স্বীকৃতিতে একটি মারাত্মক দিক রহিয়াছে।

কোরআনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই : ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সার্বিক ও সর্বাত্মক ক্ষমতা, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তিমূলক কর্তৃত্ব সহকারে সর্বপ্রকার ফল ও কাজের স্বাধীনতা, মহত্ত্ব ও মহিমা (Majestice)—সর্বোচ্চ ও চিরন্তন চিরঞ্জীব হওয়া। ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনে এই সব বৈশিষ্ট্যই একমাত্র আল্লাহতায়ালার জন্য নির্দিষ্ট।

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম স্বীয় ক্ষমতা ইখ্‌তিয়ারেই ঐকত্ব ও নিরংকুশ ব্যবস্থাপনায় উহা অপর কাহারও অংশীদারিত্ব ব্যতীতই পূর্ণমাত্রায় কার্যকর।

কোরআন মজীদ সার্বভৌমের এই একত্বকে দুইটি বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে : لم يكن له شريك فى الملك "খোদার সার্বভৌমত্ব এমন ঐক্যিক (unite) যাহাতে অপর কেহ শরীক নাই।"

এবং ان الحكم الا لله "সার্বভৌমত্ব একান্তভাবে খোদার জন্যই নির্দিষ্ট।"

ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একই অর্থজ্ঞাপক শব্দ। সর্বোচ্চ ইখ্‌তিয়ার ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা একই জিনিস। ইহা খোদারই এক বিশেষ গুণ। কোরআনের দাবী : জমীন ও আসমানের সর্বত্রই খোদার নির্দেশ

www.pathagar.com

জারী হয়, যেন তোমরা এই সত্য জানিতে পার যে, সর্বজিনিসের উপর খোদার সার্বভৌমত্ব ও সাধারণ ক্ষমতা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত।"

ইমাম রাগেব লিখিয়াছেন : و محال ان يوصف غير الله بالقدرة
—"সার্বভৌমত্ব এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যাহা আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও জন্যই হওয়া, অপর কাহারও পক্ষে এই গুণে গুণান্বিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।"

খোদার ক্ষমতা সর্বোপরি। উহা রাষ্ট্রশক্তির অধীন নহে। উহার সর্বোপরি হওয়া ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সার্বভৌমত্বের মূল কথা। কোরআন মজীদে খোদার সার্বভৌমত্ব ও সর্বোপরি হওয়ার আইনানুগ ঘোষণা প্রচার করিয়াছে এই বাক্যাংশে : تعالى الله الملك الحق

—"নিরংকুশ ক্ষমতাশীল মহাসত্য, সর্বোচ্চ ও সর্বোপরি আল্লাহ।"

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, খোদার সর্বোচ্চ ও সর্বোপরি ক্ষমতাই হইতেছে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমকে অবশ্যই নিরংকুশ, সর্বপ্রকার অধীনতা বা নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। উহার স্বাধীনতা হইবে অবাধ, অনর্গল ; উহার উপর কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। কোরআন অনুযায়ী এই স্বাধীনতার প্রথম শর্ত এই যে, সার্বভৌম নিজে কাহারও নিকট দায়ী হইবে না। কাহারও নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবে না। বরং সব কিছুই একমাত্র তাহারই নিকট দায়ী ও জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য হইবে। এই হিসাবে কোরআন মজীদ একমাত্র খোদাকেই সার্বভৌমরূপে পেশ করিয়াছে। কোরআন মজীদের ঘোষণা হইল : لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون -

—"আল্লাহ যাহা করেন, সে জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারেনা—কেহ তাহা করিতে পারেনা। বরং সকলেই খোদার নিকট দায়ী ও জিজ্ঞাসিত হইবে।"

চিরঞ্জীব-অক্ষয় ও শাশ্বত হওয়াও সার্বভৌমের একটি বিশেষ গুণ। আর এই গুণ আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও থাকিতে পারেনা। বস্তুতঃ একটি জীব ন্ত সমাজ-সংস্থার জন্য চিরঞ্জীব-শাশ্বত সত্তাই অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বীকৃত সার্বভৌমই এই প্রয়োজন পূরণ করিতে সক্ষম। রাষ্ট্রীয় আইনের ধারায় জীবনের স্পন্দন অনুভব করাও সম্ভব এই চিরঞ্জীব সত্তাকে আই-

www.pathagar.com

নের উৎসরূপে মানিয়া লইলে। ইমাম রাগেব ইছফাহানী, আবুল হাসান মা-অর্দী, ইমাম আল গাজালী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাকীম আবুনছর ফারেয়াবী প্রমুখ ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই কারণে কেবল খোদাকেই সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী রূপে ঘোষণা করিয়াছেন নিজ নিজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রন্থে।

আধুনিক মতবাদ

আধুনিক মতবাদ সার্বভৌমের এই সব বিশেষ গুণকে অপরিহার্য মানিয়া লইয়াছে বটে ; কিন্তু আধুনিক মতবাদ প্রকৃত সার্বভৌম সত্তার সন্ধানে চরম-ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহা খোদাকে সার্বভৌমরূপে মানিয়া লয় নাই। ফলে সার্বভৌমত্বের অধিকারী নির্ধারণে যথেষ্ট মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

একটি মত এই যে, রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী, অক্ষয় ও নিরংকুশ ক্ষমতাই হইতেছে সার্বভৌম। ইহা বদিন-এর মতবাদ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সার্বভৌমত্বের অধিকারী নহে, কেননা উহা বাহ্যিক ভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের নানা প্রকারের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই কারণে শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানী কর্তৃক এই মতবাদকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় মত এই যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক সার্বভৌমত্বের অধিকারী। লুই চতুর্দশ (১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে) নিজেকে সার্বভৌম বলিয়া মনে করিতেন। হানুওয়ার-এর ১৮১৪ সনের ঘোষণায় বলা হইয়াছে : গ্রেট বৃটেনের সম্রাট রাজকীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী। (ব্লেঞ্চলী)

ইংলণ্ডের আইনে মুকুট (বা crown-সম্রাটের ব্যক্তি-সত্তা) সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত। যদিও তাহার সার্বভৌমত্বকে ধর্মের নিকট হইতে সনদ হাছিল করিতে হয়। বস্তুতঃ ইংলণ্ডের রাজকীয় সার্বভৌমত্ব এক দুর্বোধ্য ব্যাপার।

এই কারণে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে দুনিয়ার এই সব রাষ্ট্র বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে :

ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار - (يوسف)

"—ভিন্ন ভিন্ন সার্বভৌম সত্তা স্বীকার করা ভাল, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহকে সকল প্রকার সার্বভৌমত্বের মালিক স্বীকার করা উত্তম ?"

বস্তুতঃ সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) উপরোল্লেখিত সংজ্ঞা সম্মুখে রাখিয়া উন্মুক্ত মনে উহার আধার সন্ধান করিলে নিঃসন্দেহে মনে হইবে যে, একমাত্র বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহতায়ালাই এই সার্বভৌমত্বের আধার হইতে

www.pathagar.com

পারেন; একমাত্র তাঁহার মধ্যেই উক্তরূপ গুণাবলীর বর্তমান থাকা শোভা পায় এবং নিখিল সৃষ্টিলোকে আল্লাহ ছাড়া আর কেহই—কোন শক্তি বা সংস্থাই—উক্তরূপ সার্বভৌমত্বের মালিক হইতে পারে না। বস্তুতঃ তাঁহারই নিরংকুশ প্রভুত্ব চলিতেছে বিশ্ব-নিখিলের প্রতি পরতে পরতে। অতএব 'Universal Sovereignty' বা 'বিশ্ব-প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব' একমাত্র তাঁহারই। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও একমাত্র তাঁহার প্রভুত্ব—তাঁহারই বিধান মানিয়া চলা অপরিহার্য। অতএব 'Political Sovereignty' বা 'রাজনৈতিক প্রভুত্ব'ও একমাত্র তাঁহারই স্বীকার করিতে হইবে এবং আইন রচনা, আইন বাতিল করণ ও নূতন আইন প্রয়োগের নিরংকুশ অধিকারও একমাত্র তাঁহারই মানিয়া লইতে হইবে। এই জন্য 'Legal Sovereignty' বা 'নিয়মতান্ত্রিক অথবা আইন ভিত্তিক সার্বভৌমত্ব'ও একমাত্র তাঁহারই কার্যকর হইবে। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ইহাই হইতেছে ইসলামের শেষ কথা। সার্বভৌমত্বকে উক্তরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আধার ও উৎস স্বীকার করিতে ইসলাম মোটেই প্রস্তুত নয়। বরং এই সকল দিক দিয়াই আল্লাহতায়ালাকে 'Sovereign' বা 'সার্বভৌমত্বের মালিক' রূপে স্বীকার করাই ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কোরআন শরীফে এই সকল দিকের সার্বভৌমত্বকেই একমাত্র খোদার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'আয়াতুল কুরসী'তে খোদার এই সার্বভৌমত্বের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায়-পেশ করা হইয়াছে :

الله لا اله الا هو الحى القيوم - لا تأخذه سنة و لا نوم له

ما فى السموت و ما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه -

يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشىء من علمه الا

بما شاء - وسع كرسيه السموت و الارض - و لا يؤده حفظهما -

و هو العلى العظيم *

www.pathagar.com

—"আল্লাহ···তিনি ছাড়া আর কেহ প্রভু নাই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, অক্ষয় ও চিরন্তন, প্রতিষ্ঠিত, সক্রিয়। নিদ্রা কিংবা তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আকাশ ও জমীনে যাহা কিছু আছে, সব তাঁহারই। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট কোন কিছুর সুফারিশ কে করিতে পারে? তিনি মানুষের অতীত ও ভবিষ্যত সব-ই ভাল করিয়া জানেন। তাঁহার জ্ঞান-সমুদ্রের কোন একটি জিনিসও তাহারা আয়ত্ব করিতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ নিজে কিছু জানাইতে চাহিলে (তাহা জানিতে পারে), তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতা আসমান ও জমীনকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য তাঁহাকে কিছুমাত্র ক্লান্ত করিতে পারে না। তিনি উচ্চ ও মহান।"

বলা হইয়াছে: ان الامر كله لله —"যাবতীয় সার্বভৌম ক্ষমতা ও ফরমান দেওয়ার নিরংকুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট।" لا معقب لحكمه —"খোদার নির্দেশ এবং খোদার বিচার-ফয়ছালাকে কেহই চ্যালেঞ্জ করিতে পারে না।"

অতএব যে শান্তি-শৃখলা, ইন্‌ছাফ ও সৎকাজের প্রতিষ্ঠা হইলে আল্লহ্‌তায়ালা সন্তুষ্ট হন, ইসলামী রাষ্ট্রে তাহা প্রতিষ্ঠিত করাই হয় রাষ্ট্রের কর্তব্য। পক্ষান্তরে যে সব পাপ, অন্যায় ও জুলুম-পীড়নে আল্লাহ্‌তায়ালা অসন্তুষ্ট হন, সেই রাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যে কোথায়ও তাহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না—বরং তাহা দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সকল শক্তিই নিয়োজিত করিতে হইবে। আল্লাহ্‌-তায়ালার 'হাকেমিয়াত' বা 'প্রভুত্ব-সাবভৌমত্ব' স্বীকার করার পর সমষ্টিগতভাবে সকল মানুষকে এবং এককভাবে সমাজের নেতৃবৃন্দ, নায়ক ও জনসাধারণ—প্রত্যেককেই খোদার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم * (يوسف)

—'আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহারও প্রভুত্ব বা আদেশ-নিষেধ করার অধিকার নাই। সেই এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহারও দাসত্ব কবুল করিও না, ইহা তাঁহারই আদেশ। একমাত্র খোদার প্রভুত্ব স্বীকার করা এবং কেবল তাঁহারই দাসত্ব করিয়া চলাই হইল মজবুত, সুন্দর ও নির্ভুল জীবন-ব্যবস্থা।"

www.pathagar.com

এখানে কোন ব্যক্তি, কোন দল, কোন পার্লামেণ্ট বা কোন জাতি কিংবা সমগ্র মানুষও প্রভুত্বের দাবী করিতে পারে না—

يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله *

(آل عمران)

—"লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের কোন অংশ আমাদের জন্য আছে কি? বল—হে নবী, সমগ্র প্রভুত্ব এবং আধিপত্য কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালারই একাধিকারভুক্ত।"

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ○ (مائده)

—"খোদার দেওয়া বিধান অনুযায়ী যাহারা রাষ্ট্র-পরিচালনা ও বিচার-ফয়ছালা করে না, তাহারা কাফের।"

মোট কথা, প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও আধিপত্য এবং মৌলিক আইন ও বিধান রচনা—রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এই বুনিয়াদী-কার্যাবলী সম্পাদনের নিরংকুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার। এই ব্যাপারে কেহ তাঁহার শরীক নাই। সেই আল্লাহ সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। তাঁহার নিকট কোন মানুষের মনের গোপন রহস্যও অজ্ঞাত নয়। বিচার দিনে তিনি মানুষের সকল কার্যের পুংখানুপুংখ ও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণ করিবেন; তাঁহার হিসাব-গ্রহণ হইতে কেহই রেহাই পাইতে পারিবে না। তাঁহার শাস্তি-বিধান হইতে কোন উকীল-মোখ্তার, বিচারক, পীর-মাওলানা, নেতা ও রাষ্ট্রপতিও মুক্তি পাইতে বা দিতে পারিবে না। বরং সকলকেই ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ জীবন ব্যাপী কাজের জন্য খোদার নিকট জওয়াব দিহি করিতে হইবে।

দুনিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় এই দায়িত্বানুভূতি ও খোদার নিকট জওয়াব দিহি করিবার এই চেতনা সর্বোতভাবে অতুলনীয় জিনিস, মানুষকে সত্যিকার নেক, সৎ ও প্রকৃত 'মুসলিম' বানাইবার জন্য এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অত্যধিক চেতনাসম্পন্ন ও তৎপর করিয়া তুলিবার জন্য ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন পন্থা হইতে পারে না। ইসলামী হুকুমাতের গোটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় উহার পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতাদের মনে এই চেতনা-অনুভূতি, এই আকীদা-বিশ্বাস এবং সর্বোপরি এই ঈমান তীব্রভাবে জাগরূক থাকে। উহার প্রত্যেকটি কর্মীই নিজেকে খোদার নিকট দায়ী মনে করিয়া কাজ করে। তাহারা শক্তির নেশায় মত্ত হইয়া, চরিত্রের সীমা লংঘন করিয়া খোদার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া

www.pathagar.com

দুনিয়া ব্যাপী অশান্তি ও ফেত্না-ফাসাদের সৃষ্টি করে না। হযরত মুহাম্মাদ (স) : বলিয়াছেন :

الا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته * (بخارى)

—"জানিয়া রাখ, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বসম্পন্ন এবং প্রত্যেককেই তাহার নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।"

فلنسئلن الذين ارسل اليهم و لنسئلن المرسلين - (الاعراف)

—"নবীগণ এবং যাহাদের প্রতি তাহারা প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই আমরা (বিচার দিনে) জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

এক কথায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ সত্য এই যে, উহা খোদায়ী সার্বভৌমত্বমূলক রাষ্ট্র। খোদার বিধান উহার উৎস এবং খোদার আইন কানুনেই উহার পরম সত্য নিহিত, কেন্দ্রীভূত।

নিয়মতান্ত্রিক অধিকার

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার পর নিয়মতান্ত্রিক অধিকারের (Legal Right) সঠিক অবস্থা অনুধাবন করা আবশ্যক। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিয়মতান্ত্রিক অধিকারের সংজ্ঞা এইরূপ : "একজন নাগরিক যে অধিকার ও সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অপরাপর নাগরিকদের মোকাবিলায় এইজন্য প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে পারে যে, তাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে এবং সরকারও উহাকে কার্যকর করিতে চাহে, তাহাকেই নিয়মতান্ত্রিক অধিকার বলে।"

সংজ্ঞায় উল্লিখিত 'রাষ্ট্রে'র পরিবর্তে 'আল্লাহ্' শব্দ বসাইলে মোটামুটি ভাবে যে সংজ্ঞা দাঁড়ায়, ইসলামী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিয়মতান্ত্রিক অধিকারের সংজ্ঞা তাহাই। বস্তুতঃ ইসলামী আদর্শে মানুষের ও সৃষ্টিলোকের যাবতীয় অধিকার আল্লাহতায়ালারই দেওয়া, আল্লাহর নিকট হইতেই প্রাপ্ত এবং খোদার দেওয়া এই অধিকার কার্যকর করাই হয় ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আল্লাহ যাহাকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহা হরণ করার একবিন্দু অধিকার কোন রাষ্ট্র-সরকারের থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ যাহাকে যে অধিকার না দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা দেওয়ার অধিকারও কাহারও নাই।

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য

ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য প্রথমতঃ এমন একটি সমাজ গঠন করা, যেখানে সকল মানুষ সমান ভাবে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার দাস এবং জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে খোদার বিধানের একনিষ্ঠ অনুগামী হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেই সমাজের সামগ্রিক শক্তির বলে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা, যাহার ভিত্তি স্থাপিত হইবে খোদার উচ্চতর নিরংকুশ প্রভুত্বের উপর, যাহার কাঠামো রচিত হইবে খোদায়ী ব্যবস্থার গঠনতন্ত্র অনুসারে এবং সমাজের নির্বাচিত অধিকতর খোদা-ভীরু, চরিত্রবান ও যোগ্যতম ব্যক্তিগণ ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অনুসারে এই রাষ্ট্র পরিচালিত করিবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

খোদার একচ্ছত্র প্রভুত্ব, আধিপত্য ও আইন রচনার অধিকার এবং সকল মানুষের সমান ভাবে খোদার দাস হওয়া ও তাঁহার নিকট সকলের দায়ী হওয়ার স্পষ্ট ও সক্রিয় ধারণার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে তাহাই হইতেছে খালেছ ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্রনীতিকে ইংরেজীতে বলা হয়—"Rulership of God on the people by the pious men with Justice"। ইসলামী রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য রহিয়াছে। কোরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন নিম্নলিখিত আয়াতে:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان
ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع
للناس - (الحديد)

—"আমরা আমাদের নবীগণকে অকাট্যযুক্তি ও সুস্পষ্ট বিধান সহ পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের নিকট "আল্-কিতাব" ও "আল্-মীজান" প্রেরণ করিয়াছি —যেন মানুষ ইন্ছাফ কায়েম করিতে পারে। আমরা "লৌহ"ও নাজিল করিয়াছি, তাহার মধ্যে বিরাট শক্তি নিহিত আছে এবং আছে প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনা।"

উল্লিখিত আয়াতে লৌহ অর্থ রাষ্ট্র শক্তি এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার আস-মানী কিতাবে যে সামঞ্জস্য ও ভার-সাম্য-পূর্ণ জীবনবিধান—'আল-মীজান' নাজিল

www.pathagar.com

করিয়াছেন, রাষ্ট্র-শক্তিকে সেই অনুসারে পরিচালিত করিয়া সামাজিক সুবিচার ব্যবস্থা (Social Justice) স্থাপন করাই নবীগণের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর নবীগণের পরে যাহারা এই দায়িত্ব পালন করিবে তাহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হইয়াছে :

الذين ان مكنا هم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ٥ (الحج)

—"ইসলামী হুকুমাত পরিচালনার দায়িত্ব এমন লোকদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে যে, তাহাদিগকে পৃথিবীর প্রতিপত্তি ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা দান করিলে তাহারা নামাজ পড়ার স্থায়ী ব্যবস্থা কায়েম করিবে, জাকাত আদায়ের সামাজিক প্রথার প্রচলন করিবে, (জনগণকে) পুণ্য, ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দান করিবে এবং অন্যায় ও পাপ হইতে বিরত রাখিবে।"

এই আয়াতে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখিত হইয়াছে : (১) নামাজ কয়েম করা। (২) জাকাত আদায় করা। (৩) সকল ন্যায় ও কল্যাণকর কাজের প্রতিষ্ঠা করা এবং (৪) সকল অন্যায় ও পাপ কাজের প্রতিরোধ করা।

নামাজ কায়েম করার অর্থ ব্যক্তিগতভাবে শুধু নামাজ পড়াই নহে, বরং যাবতীয় শারীরিক ইবাদাতকে শ্রেণীমতে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত ও চালু করাই ইহার উদ্দেশ্য। জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করার অর্থও শুধু ব্যক্তিগতভাবে জাকাত দেওয়া নহে, বরং সমগ্র দেশের গোটা অর্থ-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া ইসলামের পূর্ণাংগ আদর্শ অনুযায়ী গঠন করাই উহার তাৎপর্য। আর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ অর্থ : যে ন্যায় ও প্রচলিত কাজ মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর, তাহাকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পূর্ণ রূপে চালু করিতে হইবে এবং যে অন্যায় অপরিচিত ও ঘৃণিত কাজ মানুষের প্রগতির পথে অন্তরায় হইতে পারে, তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে—সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্রের প্রতি স্তর হইতে তাহা নির্মূল করিতে হইবে। এক কথায় ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে খোদা ও বান্দা'র সঠিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করণ এবং সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুস্থ করিয়া গড়িয়া তোলা। সেখানে না দলীয় অর্থ-কৃচ্ছ্রতার অস্তিত্ব থাকিবে, না ব্যক্তিগত কৃপণতার। না থাকিবে দেশে কোন প্রকার শোষণ-জুলুম, অপহরণ, আর না থাকিবে কোন প্রকার দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের অভিশাপ। বরং মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগেই প্রকৃত উন্নতি সূচিত হইবে।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ কোরআনের উপস্থাপিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানুষকে শুধু পারস্পরিক জুলুম ও শোষণ হইতে রক্ষা করা, তাহাদের আযাদী ও ধন-প্রাণের শুধু রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাষ্ট্রকে পরাক্রমণ হইতে শুধু বাঁচানোই নহে, উহার লক্ষ্য হইতেছে খোদার কিতাব অনুযায়ী সামাজিক সুবিচারের একটি পূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করা। উহার উদ্দেশ্য খোদা-নির্ধারিত সমস্ত পাপ ও অন্যায়ের উৎসমূলকে চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং খোদা নির্দেশিত যাবতীয় পুণ্য ও ন্যায় পন্থাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

বুনিয়াদী আইন

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য স্থান-কাল ভেদে কোথায়ও রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে, প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে, শিক্ষা-দীক্ষার অত্যাধুনিক প্রণালীও এই জন্য প্রবর্তন করিতে হইবে এবং সামাজিক প্রভাব ও জনমতের চাপকেও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে হইবে। বস্তুতঃ এহেন মহান উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুবই বিরাট ও ব্যাপক। ইহা মানুষের সামগ্রিক জীবন—জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকেই পরিব্যাপ্ত করিয়া লয়।

আল্লাহতায়ালা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদের (স) প্রতি যে পূর্ণাংগ বিধান ও জীবন-ব্যবস্থা নাজিল করিয়াছেন, তাহাই এই ইসলামী হুকুমাতের বুনিয়াদী আইন। নবীর মাধ্যমে আমরা দুইটি জিনিস লাভ করিয়াছি : একটি খোদার 'আল-কিতাব'—যাহাতে ইসলামের মৌলিক নীতিগুলি সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অপরটি সেই 'আল কিতাবে'র ব্যাখ্যা, যাহা তিনি খোদার সমর্থিত প্রতিনিধি (Authorized Representative of the Almighty) হিসাবে পেশ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা আমরা দুইভাবে পাইয়াছি। একটি নবীর মুখনিঃসৃত কথা, অপরটি তাঁহার নিজের নবুয়্যাতী জীবনকালের কর্মধারা। নবী করীম(স) কথা এবং কাজ—এই উভয় দিক দিয়াই খোদার আল-কিতাবের বিশ্লেষণ ও বাস্তব রূপায়ন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইসলামী রাজনীতিতে মানুষের কোন প্রভুত্ব নাই, আইন রচনার কোন অধিকার মানুষের নাই। কাজেই ইসলামী হুকুমতে মানুষ কোন আইন রচনা করিবে না। নিজেদের ইচ্ছামত কোন জিনিসকে হালাল (আইনসম্মত) ও কোন জিনিসকে হারাম (বে-আইনী) ঘোষণা করার অধিকার কোন মানুষের নাই। আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন :

www.pathagar.com

و لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام

لتفتروا على الله الكذب ○ (النحل)

—"তোমাদের মুখে যাহা আসে মিথ্যামিথ্যি বলিয়া দিওনা যে, ইহা হারাম, আর ইহা হালাল। কেননা, তাহার ফলে, তোমাদের খোদার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করিয়া বসিবে মাত্র।"

قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما

و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ○ (يونس - ٥٩)

—"হে নবী, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য যত নিয়ামত—জীবন যাপনের উপাদান ও কাজ কর্মের সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা—দান করিয়াছেন, তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত সেই সবের কোনটিকে হালাল আর কোনটিকে হারাম নির্দিষ্ট করিয়া লইতেছ কোন্ অধিকারে? খোদা কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না নিজেদের ইচ্ছামত কোন মত পোষণ করিয়া তাহা তোমরা খোদার উপর আরোপ করিতেছ?"

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ○

(الشورى - ٢١)

—"তাহাদের কি বহুসংখ্যাক অংশীদার প্রভু আছে, যাহারা তাহাদের জন্য জীবন যাপনের এমন ব্যবস্থা ও আইন রচনা করিয়া দিয়েছে যাহা রচনা করার কোন অনুমতি আল্লাহ্ দান করেন নাই?"

এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মূলতঃ আইন রচনার কোন অধিকার মানুষের নাই। মানুষ নিজের ইচ্ছা বা রুচি, কিংবা অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া বলিতে পারেনা যে, এই জিনিসটি কিংবা এই কাজটি হালাল, আর এইটি হারাম। তাই মানুষের রচিত কোন আইন বা বিধান স্বীকার করা

www.pathagar.com

পরিষ্কার শির্‌ক। তবে খোদার দেওয়া মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যেক যুগের বা প্রত্যেক দেশের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে ইসলামী আইন প্রণয়ন করার ইসলামী বিধান-অভিজ্ঞ মানুষের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। ইসলামী পরিভাষায় এই প্রচেষ্টার নাম হইতেছে "ইজ্‌তিহাদ"।

বিশ্বনবীর প্রতি কোরআন শরীফ এই জন্যই নাজিল হইয়াছে যে তদনুযায়ী মানুষের বিচার-ইনছাফ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করা হইবে। আল্লাহ্‌ নিজেই ইরশাদ করিয়াছেন :

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك
الله و لا تكن للخائنين خصيما ○ (النساء)

"—নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি পূর্ণ কোরআন শরীফ পরম সত্যতার সহিত এই জন্যই নাজিল করিয়াছি যে, তুমি সেই অনুযায়ী মানুষের উপর ঠিক খোদা-প্রদর্শিত পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করিবে এবং বিচার-ইন্‌ছাফ কায়েম করিবে। (কোরআনকে যাহারা এই কাজে ব্যবহার করিতে চাহেনা, তাহারা এই মহান আমানতের খিয়ানত করে) তুমি এই খিয়ানতকারীদের সাহায্য ও পক্ষসমর্থনকারী হইও না।"

হযরত রসূলে করীম (ছঃ) একবার আছ্‌হাবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন : এমন একটি সময় আসিবে যখন নিরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ফেত্‌না-ফাসাদ সমগ্র দুনিয়াকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। একজন ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! সেই বিপদ হইতে বাঁচিবার উপায় কি? উত্তরে বিশ্বনবী বলিয়াছিলেন :

كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم
بينكم و هو فصل ليس بالهزل ○ (ترمذى)

—"আল্লাহ্‌র কোরআন—আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানই—বাঁচিবার একমাত্র উপায়। তাহাতে অতীত কালের জাতিগুলির ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব-বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং বর্তমানের

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও তাহাতে রহিয়াছে। বস্তুতঃ উহা এক চূড়ান্ত বিধান, উহা কোন বাজে জিনিস নহে।"

অতঃপর হযরত ইরশাদ করিলেন ঃ

من عمل به اجر و من حكم به عدل و من عصم به فقد هدى الى صراط مستقيم ○ (البحر المحيط)

—"যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করিবে, সে উহার প্রতিফল লাভ করিবে। যে উহার অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করিবে তাহার শাসন সুবিচারপূর্ণ হইবে এবং যে উহাকে দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়া ধরিবে, সে সঠিক এবং সত্যকার কল্যাণের পথে পরিচালিত হইতে পারিবে।"

হযরত (ছঃ) কে—সেই সংগে নিখিল মুসলেমীনকে—আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ

ان احكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم ○

—"খোদার বিধান অনুযায়ী মানুষের উপর হুকুমাত (কায়েম) কর, তাহাদের মনের খেয়াল খুশী ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ করিওনা।"

এই সব আয়াত হইতে নিঃসন্দেহে জানা গেল যে, ইসলামী হুকুমাতের বুনিয়াদী আইন হইতেছে কোরআন ও হাদীস। মানুষের নিছক অভিজ্ঞতা, নিজস্ব মনোভাব কিংবা বিশেষ শ্রেণী বা দলের বিশেষ স্বার্থের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে আইন রচনা করা যাইতে পারে না।

ইসলামী আইনের ভিত্তিতে এককভাবে ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতীয় চরিত্র একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে গঠিত হয়। এই ঐক্য ও সুসংহত সামঞ্জস্যের দরুন ইসলামী মিল্লাত ও হুকুমাতের নৈতিক বুনিয়াদ অধিকতর মজবুত হয়। এ হেন ইসলামী হুকুমাতের অধীন যে ব্যক্তিই খোদাকে বিশ্বাস করে তাহাকেই এই নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। উহার দৃষ্টিতে যাহা সত্য, তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে এবং যাহা মিথ্যা—যাহা বাতিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই শাশ্বত আইনের আলোকে যাহা অন্যায় ও পাপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে সমগ্র জাতি,

www.pathagar.com

জাতীয় পার্লামেন্টের সমস্ত সদস্যও যদি মিলিত হইয়া ভোট দিয়া উহাকে ন্যায় ও পূণ্য বলিয়া ঘোষণা করে, তবুও তাহা "ন্যায়" ও "পুণ্য" বলিয়া স্বীকৃত হইবে না—হইতে পারেনা। পক্ষান্তরে কোরআনী বিধানে যাহা ন্যায়, যাহা সত্য এবং পুণ্য, সমগ্র জাতিও একত্রিত হইয়া উহাকে অন্যায়, মিথ্যা এবং পাপ বলিয়া নির্ণয় করিতে পারেনা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীকে যে সব অধিকার দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রী এবং পুরুষের জন্য যে 'হক্ব' নির্দিষ্ট করা হইয়াছে মুসলমান ও অমুসলমান নাগরিকগণকে যে মর্যাদা দান করা হইয়াছে; সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি যাহা নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্তনীয়। রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকও একত্রিত হইয়া নিজদের ইচ্ছানুক্রমে তাহাতে একবিন্দু রদ-বদল করিতে পারে না। ইসলামে যে মূলনীতি ও বুনিয়াদী আইন নির্ধারিত হইয়াছে: সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং পাপ ও পুণ্যের যে মুল্যমান নিরূপিত হইয়াছে, তাহা শাশ্বত ও অক্ষয়। সকল দেশে ও সকল যুগে তাহার উপরই ভিত্তি করিয়া রচিত হইবে ইসলামী শাসনতন্ত্র ও বিস্তারিত আইন।

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ... الكافرون ...

الفاسقون ○ (المائدة)

—"খোদার দেওয়া বিধান অনুসারে যাহারা বিচার-ফয়ছালা ও রাষ্ট্রপরিচালনা করে না, তাহারা জালেম—কাফের—ফাসেক।"

বস্তুতঃ খোদার দেওয়া বিধানকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা আইন রচনা ও রাষ্ট্র-পরিচালনা করে, তাহারা একই সংগে তিনটি বড় মারাত্মক অপরাধ করে। প্রথমতঃ খোদার বিধান, নিজের জীবন ও কর্মশক্তি এবং অধীনস্থ জনগণ—একসংগে এই সব কিছুর উপর সে জুলুম করে। অপর দিকে খোদার বিধানকে সে কার্যতঃ অস্বীকার ও অমান্য করে এবং তৃতীয় দিকে চূড়ান্ত ও নির্দিষ্ট সীমাকে সে পূর্ণ ধৃষ্টতা সহকারে লংঘন করে। আর এই জুলুম খোদাদ্রোহিতা ও সীমালংঘন করার পাপ যে সমাজে প্রবিষ্ট হয়, সে সমাজ চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না।

---

www.pathagar.com

জমহুরী খিলাফত

(Popular Vicegerency)

ইসলামী রাজনীতির তৃতীয় বুনিয়াদ হইতেছে জমহুরী খিলাফত—সর্বজনীন প্রতিনিধিত্ব। জীবনের সমগ্র বিভাগের জন্য খোদার একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব ও আইন-রচনার নিরংকুশ অধিকার স্বীকার করার পর এই জমহুরী খিলাফত এক অনিবার্য বিধান। ইহার অর্থ এই যে, মানুষের জীবন যাপনের পূর্ণাংগ বিধান রচনা করার অধিকার একমাত্র খোদা তায়ালার, তিনি সেই বিধান নবীর মারফতে মানুষের নিকট পাঠাইয়াছেন। এখন সেই বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, খোদার প্রতিনিধি হইয়া এই দুনিয়ায় সেই পূর্ণাংগ বিধান কায়েম করাই হইতেছে মানব-জীবনের একমাত্র কর্তব্য। ইবনে খাল্লেদুনের মতে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং তদনুযায়ী সমাজ-সংগঠন ও পরিচালনের নাম 'খিলাফত'। বস্তুতঃ মানুষ নিজে রাজ্যের মালিক নয়, প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি মাত্র।

খিলাফতের তাৎপর্য

খিলাফতের এই মত-ই মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীব-জন্তুর মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেণীগত পার্থক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। মানুষ ভিন্ন অন্যান্য জীব-জন্তুকে শুধু প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature)-ই পালন করিতে হয় এবং তাহা পালন ও অনুসরণের জন্য উহাদের স্বভাবগত প্রেরণা (Instinct)-ই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানুষ শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিয়াই চলিতে পারে না। শুধু স্বাভাবিক প্রেরণাই তাহার জন্য যথেষ্ট নয়। মানুষকে জৈব জীবনেরও উর্ধে আর একটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে; তাহা হইতেছে উহার মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্যই স্বভাবগত প্রেরণা ছাড়া খোদায়ী বাণীর মাধ্যমে তাহাকে আর একটি জিনিস দান করা হইয়াছে, যাহাকে বলা হয় 'ইসলাম'। ইহারই

www.pathagar.com

সাহায্যে মানুষকে বিশ্ব-নিখিলের প্রতি খোদার খলীফা বা প্রতিনিধি (Vicegarent) নিযুক্ত করা হইয়াছে। সেইজন্য অন্যান্য সৃষ্টির উপর শুধু হস্তক্ষেপের অধিকারই মানুষকে দান করা হয় নাই, সেই সংগে দেওয়া হইয়াছে উহাকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা। মানুষকে দেওয়া হইয়াছে বুদ্ধি-বিবেক, সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বোধ; দেওয়া হইয়াছে চিন্তা ও গবেষণা করিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনার অপূর্ব প্রতিভা। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নিযুক্ত দায়িত্বশীল ও তাঁহার নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য সুযোগ্য প্রতিনিধি। এই জন্য প্রাকৃতিক আইন ও স্বভাব-নিয়মের সংগে সংগে একটি শরিয়তী আইন—একটি নৈতিক বিধান ও একটি সুউজ্জ্বল জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করাও তাহার কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। বরং প্রকৃত পক্ষে এই শেষোক্ত আইন ও বিধান পালন করায়ই উহার সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একটি সরকারের সিভিল সার্ভিসের (Civil Service) কাজ শুধু সাধারণের জন্য, রচিত আইন পালন করাই নয়, উচ্চতর সরকারের যাবতীয় নির্দেশ ও বিশেষ নিয়মাবলী (Government Servant Conduct Rules) পালন করাও উহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু এই শেষোক্ত আইন পালনের উপরই উহার ভবিষ্যৎ উন্নতিলাভ একান্ত-ই নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে নিছক প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে মানুষের চেষ্টা সাধনা, উন্নতি ও উৎকর্ষলাভের এমন কোন কার্যসূচী রচিত হইতে পারে না, যাহা জীবন-পথের প্রত্যেকটি স্তরে—জীবন-যাপনের প্রত্যেকটি বিভাগেই—মানুষকে সঠিক পথ-প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে এবং যাহা অনুসরণ করিয়া মানুষ বৈষয়িক উন্নতিলাভের সংগে সংগে পরকালীন মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে।

ইহার কারণ শুধু এতটুকুই নহে যে, মানুষের উক্তরূপ কার্যসূচী ও ব্যবস্থা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাদান (Data) এই সৃষ্টিলোকে বর্তমান নাই। শুধু এই কারণেও নয় যে, মানুষের বুদ্ধি, আবিষ্কার-উদ্ভাবনী প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি উক্তরূপ ব্যবস্থা কার্যকর করিতে অসমর্থ; বরং উহার প্রকৃত কারণ এই যে, মানুষের এই অনন্ত জীবন ধারার শেষ অধ্যায়ে সফলতা ও ব্যর্থতা এবং উন্নতি ও অবনতি লাভের চূড়ান্ত ভিত্তি কি তাহাই মানুষের দৃষ্টি-শক্তির সম্পূর্ণ অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং মানুষের কোন্ বৈষয়িক কাজের কি ফল বা পরিণতি সেখানে পরিলক্ষিত হইবে, তাহা মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। কাজেই এই পৃথিবীতে খোদার খলীফা

www.pathagar.com

হওয়ার কারণে নিজ পদের দায়িত্ব পালনার্থে মানুষের যে কার্যসূচী ও বিধি-বিধানের প্রয়োজন তাহা মানুষকে খোদার নিকট হইতে 'অহীর' সূত্রেই লাভ করিতে হইবে।

এইভাবে মানবীয় ইচ্ছা (Human Will) খোদার ইচ্ছার (Divine will) এবং মানব-বুদ্ধি খোদায়ী জ্ঞানের অধীন হইবে। ইহার ফলে প্রথমতঃ মানুষের ইচ্ছা-শক্তি (Will Force) ও কর্মদক্ষতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। কেননা, প্রত্যেক পদক্ষেপেই মানুষ অনুভব করিতে পারিবে যে, বিশ্ব-স্রষ্টার অসীম শক্তি তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ উন্নতি ও উৎকর্ষলাভের গতি অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিবে। কেননা প্রত্যেকটি মৌলিক গুরুত্ব-সম্পন্ন ব্যাপারেই মানুষ সঠিক ও নির্ভুল পথ-নির্দেশ লাভ করিতে পারিবে। এবং ভুল অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পরীক্ষামূলক কার্যে তাহাদের কর্মশক্তির অপচয় করিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ মানব-প্রভুত্বের অর্থহীন ধারণার ভিত্তিতে কাজ করার সমূহ ক্ষতি হইতে মানুষ সর্বতোভাবে রক্ষা পাইতে পারিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে সমাজে না শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দিবে, না ও পুঁজিদারও মজুরের মধ্যে কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে; না হইবে দল ভিত্তিক কোন কোন্দল, না সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী-কেন্দ্রিক বিদ্বেষ-জনিত রক্তপাত। কারণ এই সব বিপর্যয়-মূলক অবস্থা একমাত্র মানব-প্রভুত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র-সমাজেই সম্ভব—বরং অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, খোদায়ী প্রভুত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে—হুকুমাতে ইলাহীয়ায়—তাহা সংঘটিত হওয়া সাধারণতঃ সম্ভব নহে।

সার্বজনীন খিলাফত

এই প্রতিনিধিত্ব বিশেষ কোন ব্যক্তি, বংশ বা শ্রেণীর জন্য রিজার্ভ করিয়া দেওয়া হয় নাই। যাহারাই খোদাকে, খোদার প্রভুত্ব ও বিধানকে স্বীকার করে এবং তাঁহার দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হয়, তাহারাই এই পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি। তাহার মধ্যে যাহারা খোদার আইন সবচেয়ে বেশী অনুসরণ করে, জমহুরী খিলাফতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করিবার জন্য কেবল তাঁহাদিগকেই নির্বাচিত করিতে হইবে।

আল্লাহ সমগ্র মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:

و هو الذى جعلكم خلائف فى الارض - (انعام)

"সেই মহান আল্লাহ্ ই তোমাদিগকে পৃথিবীতে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করিয়াছেন।"

www.pathagar.com

অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - (النور)

—"আল্লাহ্ ওয়াদা করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা খোদা, রসূল এবং খোদার বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং সেই অনুযায়ী সৎ কাজ করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের উপর পৃথিবীর খিলাফতের দায়িত্বভার অর্পণ করিবেন—যেমন তিনি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ - (يونس)

"সেই লোকদের পরে আমরা তোমাদিগকেই জমীনের বুকে খলীফা বানাইয়াছি। তোমরা কি রকম কাজ কর তাহা প্রত্যক্ষ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।"

উল্লিখিত আয়াতত্রয় হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, দুনিয়ার ইসলাম পালনকারী সর্বসাধারণ মানুষই আল্লাহতায়ালার নায়েব বা প্রতিনিধি। কিন্তু যেহেতু সেই সর্বসাধারণ মানুষ সকলে একত্রে ও একই সংগে খিলাফতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পরিচালনার যোগ্য হয় না এবং আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিও এই কার্য সমাধা করিতে পারে না, সেইজন্য খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব সকলের পক্ষ হইতে নির্বাচিত "খলীফাদের" উপরই ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু তাহাদের শক্তি ও অধিকার অতীব সীমাবদ্ধ। তাহারা কখনও সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করিয়া "ডিক্টেটর" হইতে পারে না। যে ব্যক্তিই মূল নিয়মতন্ত্রের বিরোধিতা করিবে, সে-ই অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। তাহার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে। এইভাবে নির্বাচিত খলীফা কিংবা খিলাফতের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা —কাহারও পক্ষেই ডিক্টেটর, তথা স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ্ হওয়ার সম্ভাবনা বা অবকাশ থাকে না। ইসলাম ও বাদশাহী, কিংবা ইসলাম ও ডিকটেটরবাদ এবং ইসলাম ও বর্তমান ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র মৌলিক ভাবেই পরস্পর বিরোধী। এইসব রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে কোন একটিও যেখানে হইবে—সেখানে আর যাহাই হউক, ইসলাম হইবেনা, একথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে চাই।

www.pathagar.com

ইসলামী হুকুমাতের সংগঠন

রাষ্ট্রপ্রধান

জমহুরী খিলাফত সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হইয়াছে তাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ইসলামী হুকুমাতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন এবং ইসলামী আইন জারী ও কার্যকর করণের জন্য একজন আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাহাকে পরামর্শদান ও দায়িত্ব পালনে বাস্তব সহযোগিতার জন্য একটি মজলিসে শু'রা বা রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ (Parliament) নির্বাচন করিতে হইবে। আমীর মুসলিম জনগণের মধ্য হইতে জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হইবে। জনগণ তাহাদের ব্যক্তিগত খিলাফত-অধিকার তাহার নিকট আমানত্ রাখিবে, আমীর জনগণের তরফ হইতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পরিচালক হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার কোন অধিকারই তাহার থাকিবেনা। সকল মানুষের মধ্যে কেবল তাহাকেই যে 'খলীফা' নামে অভিহিত করা হয়, তাহার অর্থ এই নয় যে, কেবল মাত্র সে-ই খলীফা—অন্য কেহ নয়। বরং তাহার অর্থ এই যে, রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ নিজনিজ খিলাফত অধিকার তাহার নিকট আমানত রাখিয়াছে মাত্র। আসলে প্রত্যেক মুসলিম বয়স্ক নারী ও পুরুষ-ই আল্লাহ্ র খলীফা। খিলাফতের বৃহত্তর ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য একজন লোককে দায়িত্বশীল বানাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হইবে। নির্বাচনে প্রত্যেক বয়স্ক মুসলিমের ভোট দানের অর্থ এই যে, আসলে সে-ই খোদার খলীফা, কিন্তু সে ইহার সামগ্রিক দায়িত্ব পালনের জন্য একজনকে মনোনীত করিতেছে। ইহাতে যে লোক নির্বাচিত হইবে, সে-ই একমাত্র খলীফা হইয়া যাইবেনা, বরং সকল ব্যক্তি-খলীফার তরফ হইতে দায়িত্বশীল হইবে মাত্র। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে 'খলীফাতুল্ মুসলেমীন' বলার ইহাই তাৎপর্য। কারণ ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রগঠন এবং রাষ্ট্র পরিচালন একেবারেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

জনসাধারণের মধ্য হইতে যাহাকে আমীর নির্বাচন করা হইবে রাষ্ট্রপরিচালনার মূল চাবিকাঠি এবং সমগ্র রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব তাহারই উপর অর্পণ করা হইবে। আমীর রাজ্যের অভ্যন্তরে ইসলামী আইন ও জীবন-ব্যবস্থার সংরক্ষক, জাতীয় স্বাধীনতার মুখপাত্র এবং রাষ্ট্রের প্রধানতম কর্মকর্তা হইবে।

আমীরের ক্ষমতা

বস্তুতঃ আমীর ইসলামের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকে। যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে আমীরের উপর একান্তভাবে নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। আমীর নিজে ব্যক্তিগতভাবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করিবে এবং রাষ্ট্র সমাজকে যতদিন পর্যন্ত ইসলামের বিধান অনুসারে পরিচালিত করিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত জনগণকে তাহার আনুগত্য ও অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাই আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ :

اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم - (النساء)

—"আল্লাহতায়ালার অনুগত হও, তাঁহার রসূলকে অনুসরণ করিয়া চল এবং তোমাদের মধ্য হইতে (নির্বাচিত) আমীরের অনুগত হইয়া থাক।" ইসলামী রাজনীতিতে আমীরের আনুগত্যকে বাস্তবগুরুত্বের দিক দিয়া আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্যের অধীন সমান মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত রসূলে করীম (ছঃ) বলিয়াছেন :

من اطاعنى فقد اطاع الله و من عصانى فقد عصى الله و من
يطع الامير فقد اطاعنى من يعص الامير فقد عصانى ○

(بخارى ، مسلم)

—"যে আমার আনুগত্য করিল, সে আল্লাহতায়ালার আনুগত্য করিল ; যে আমাকে অমান্য করিল, সে আল্লাহকেও অমান্য করিল। এবং যে (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য করিল সে আমার আনুগত্য করিল, আর যে আমীরকে অমান্য করিল, সে আমাকে অমান্য করিল।"

www.pathagar.com

'আমীর' সবসময়ই কোরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের রাষ্ট্রীয় "পলিসি" অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য। আমীর একদিকে আল্লাহর নিকট, অপর-দিকে মজলিসে শু'রা ও জনগণের নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবে। তাহার কার্যকলাপ পৃথিবীর যে কোন ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করিতে এবং উহার দোষত্রুটির প্রকাশ্য সমালোচনা করিতে পারিবে। ইহার পথে কখনই কোনরূপ আইনগত বা মর্যাদাগত বাধার সৃষ্টি করা যাইবে না।

মজলিসে শু'রার (পার্লামেণ্ট) অধিকাংশের মতেই রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারিত হইবে একথা ঠিক; কিন্তু আমীর সেই "অধিকাংশ" কি "কম সংখ্যকের"—অন্য কথায় মজলিসে শু'রার সংখ্যা-গরিষ্ঠের কিংবা সংখ্যালঘুর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে সবসময় এবং সকল অবস্থায় বাধ্য থাকিবে না। এখানে তাহাকে বিশেষ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রনীতির সীমার মধ্যে থাকিয়া যৎকিঞ্চিৎ "ভেটো" (Veto) প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই "ভেটো" কোরআন ও সুন্নাহর আলোকেই প্রয়োগ এবং উহারই ভিত্তিতে উহার বৈধতা যাচাই ও পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহা কখনই স্বেচ্ছাচার মূলক ও তাকওয়া বিরোধী হইতে পারিবেনা। যেখানে আল্লাহ তায়ালা জনগণের পরামর্শ গ্রহ-ণের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা হিসাবে মজলিসে শু'রা কায়েম করার নির্দেশ দিয়া-ছেন, সেইখানেই পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন:

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ○ (آل عمران - ١٠٩)

—"ইসলামী রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিতে যখন তুমি কোন সিদ্ধান্ত করিয়া লও, তখন একমাত্র খোদার উপরই একান্তভাবে ভরসা করিও"। অর্থাৎ কোরআন হাদীসের ভিত্তিতে গৃহীত আমীরের নিজের সিদ্ধান্ত মজলিসে শু'রার অধি-কাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তের বিপরীত হইলেও সে তদনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে কাজ করিতে পারিবে। স্পষ্টভাবে মনে রাখিতে হইবে, এই 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার সকল সময় এবং সকল অবস্থার জন্য নহে: বরং উহা বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং স্বাভাবিক ও জরুরী অবস্থার জন্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'ভেটো' প্রয়োগের পর কোরআন হাদীসেরই ভিত্তিতে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, এই "ভেটো" প্রয়োগ করা আমীরের পক্ষে কতখানি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। সেজন্য নিজেদের মধ্যে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ বা দ্বন্দ্ব-কলহ করা যাইবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশ এই:

www.pathagar.com

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ○ (النساء)

—"কোন বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মত-বিরোধ ও তর্কের সৃষ্টি হইলে তাহা আল্লাহ এবং রসূলের দিকে ফিরাও।"—অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালক ও জনগণের মধ্যে মত বিরোধ হইতে পারে, রাষ্ট্রকর্তাদের সহিত মত বিরোধ করার অধিকার জনগণের আছে। আর এই ধরনের মত-বিরোধ সৃষ্টি হইলে কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে তাহার মীমাংসা করিয়া লওয়াই ইসলামী জনতার প্রতি আল্লাহতায়ালার নির্দেশ।

রাষ্ট্রপ্রধানের জরুরী গুণাবলী

ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানে রাষ্ট্রপ্রধানের নিজস্ব গুণাবলী হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে :

(১) অকলংক আদর্শ ইসলামী চরিত্র

(২) জরুরী ইসলামী জ্ঞান ও ইসলামী আদর্শ সচেতনতা

(৩) শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও যোগ্যতা

(৪) আদর্শ রাষ্ট্র চালাইবার মত বুদ্ধি-জ্ঞান ও যোগ্যতা কর্মক্ষমতা'

(৫) ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা ও শত্রুর প্রতিরোধ করার উপযোগী সাহস হিম্মত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'খলীফা'র সংজ্ঞা হইবে : ''খলীফা মুসলিম জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। সে রসূলে করীমের প্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী উপায় উপাদানের সাহায্যে ইসলামী জীবন বিধানকে পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত করিবে এবং দ্বীনের এই আমানত রক্ষা ও ইসলামী আইন কার্যকর করণের পথে আসা সব বাধা প্রতিবন্ধকতা পূর্ণ শক্তিতে দূরীভূত করিবে।''

আমীরের পদচ্যুতি

কিন্তু 'আমীর' যদি খোদা ও রসূলের আনুগত্য না করে এবং তাহার বিধান অনুসরণ করিয়া না চলে, তবে তাঁহার আনুগত্য করা কিছুতেই জায়েজ হইবে না। বরং তখন তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করা-ই ঈমানদার নাগরিকদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ পরিষ্কার বলিয়াছেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ○ (الكهف)

www.pathagar.com

"যাহার দিল্ আমার স্মরণ (এবং আমার আনুগত্য মূলক ভাবধারা) শূন্য, নিজের নফসের অনুসরণ করাই যাহার অভ্যাস এবং যে ব্যক্তি যাবতীয় কাজ-কর্মে (ইসলামের বিধান মানিয়া চলে না; বরং ইসলামী বিধানের নির্ধারিত) সীমা লংঘন করে, তাহার আনুগত্য মাত্রই করিও না।" আরও বলিয়াছেন:

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ * (الشعراء)

—"যেসব লোক (ইসলাম নির্ধারিত) সীমা লংঘন করিয়া দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে—শান্তি, শৃংখলা এবং কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেনা, তাহাদের এমারত বা নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব একেবারেই স্বীকার করিও না, তাহাদের মাত্রই আনুগত্য করিও না"।

আরও অধিক সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে নিম্নলিখিত আয়াতে:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا - فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا * (الدهر)

—"নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি (হে নবী) কোরআন নাজিল করিয়াছি। (তাহাতে তোমার জন্য আইন-কানুন পরিষ্কার লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে)। অতএব ধৈর্যধারণ করিয়া কেবল খোদার হুকুম পালন করিতে থাক; সমাজের কোন পাপী, ফাসেক কিংবা কাফের লোকের আনুগত্য করিও না।"

উল্লিখিত আয়াত দুইটি হইতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রথম এই যে, একমাত্র খোদার বিধান-ই ইসলামী হুকুমাতের আইন হইবে—তাহাতে মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনার দ্বারা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার অধিকার কাহারও নাই। দ্বিতীয় এই যে, ইসলামী হুকুমাতে পাপী—খোদার বিধান লংঘনকারী, খোদার আইন অমান্যকারী এবং কাফের লোক কখনও রাষ্ট্রনায়ক কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে (Key post) নিযুক্ত হইতে পারে না। ইহার আর একটি অকাট্য দলীল হইল কোরআন মজীদের সেই আয়াত যাহাতে মুসলমানদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে: "তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, অনুগত হইয়া চল রসূলের এবং তোমাদের মধ্য হইতে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদেরও।" আয়াতের শেষ শব্দটি অকাট্য ভাবে প্রকাশ করে যে, মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই 'মুসলমান' হইতে হইবে। কোন অমুসলমান বা ইসলামী আদর্শ অমান্যকারী ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধান হইতে পারিবেনা। যদি এমন কোন ব্যক্তি মুসলিম-সমাজের রাষ্ট্রনেতা হইয়া বসে, কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হওয়ার পর ইসলামের সীমা লংঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা করিতে শুরু করে; অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তবে তাহার আনুগত্য করা বা তাহাকে রাষ্ট্রের গদিতে বসাইয়া রাখা মাত্রই জায়েজ নহে; বরং তাহাকে পদচ্যুত করিয়া সর্বদিক দিয়া উপযুক্ত এক খাঁটি মুসলিম ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করা সর্বসাধারণ মুসলমানের কর্তব্য হইবে।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) রোমান সম্রাটের দরবারে যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার একটি কথা হইতেও এই পর্যায়ে স্পষ্ট পথ নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন:

امير نا رجل ان عمل بكتابنا و سنة نبينا قررناه علينا

وان عمل بغير ذلك عزلناه منا - (فتوح الشام)

"আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের মধ্যেরই একজন লোক। সে যদি আমাদের কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করে, তবে আমরা তাহাকে আমাদের উপর বহাল ও প্রতিষ্ঠিত রাখি। আর যদি ইহা ছাড়া-ই এবং ইহার বিপরীত কাজ করে, তবে আমরাই তাহাকে পদচ্যুত করি।" 'আমীর' রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে মজলিসে শু'রার সদস্যদের সহিত পরামর্শ করা ত্যাগ করিলেও তাহাকে পদচ্যুত করা ইসলামী রাষ্ট্রনীতির বুনিয়াদী প্রয়োজন। তথাকথিত গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁহার পদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে যুক্তিসংগত হইতে পারেনা।

সমালোচনার অধিকার

উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহ হইতে পরিষ্কার রূপে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী হুকুমাতের আমীর (রাষ্ট্রপ্রধান) এবং তাঁহার সহকারী মজলিসে শু'রা (পার্লামেন্ট)-র সদস্যবৃন্দ যেমন জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হইবে, তেমনি আবশ্যক হইলে জনসাধারণেরই অনাস্থায় তাঁহাদিগকে পদচ্যুতও করা যাইবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিগত অধিকারের বলে 'আমীর' কিংবা অন্য কোন পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবে না। আমীর এবং মজলিসে শু'রার সদস্যদের সম্পর্কে অবাধে ও প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা করা যাইবে। রাষ্ট্রনায়কদের সমালোচনা করার অধিকার ইসলামী হুকুমাতের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই অত্যন্ত স্বাভাবিক অধিকার। ইহা স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের দেওয়া অধিকার। এই অধিকার কেহই কোন অবস্থায়ই হরণ করিতে পারে না, কাহারও হুমকি-ধম্‌কি, ভ্রূকুটি-কুটীল কটাক্ষ কিংবা গ্রেফ্‌তারি ও নির্বাসনের ভয়ে এই দ্বীনি অধিকার পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ) পরিষ্কার কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر -

"অত্যাচারী—ইসলামের নির্ধারিত সীমা লংঘনকারী—রাষ্ট্রনায়কের সম্মুখে স্পষ্ট সত্য কথা বলা সবচেয়ে উত্তম জিহাদ।"

এই হাদীস হইতে সমালোচনার শুধু অধিকারই প্রমাণিত হয় না, বরং ইহা দ্বারা প্রত্যেক জালেম ও ইসলামের বিরুদ্ধাচারী রাষ্ট্রনায়কের যাবতীয় কাজকর্মের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট সমালোচনা করা এবং তাহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা একটি দ্বীনি ফরজ বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই ফরজ যাহারা ভুলিয়া যায় তাহারা প্রকারান্তরে জুলুমেরই সহায়তা করিয়া ইসলামী হুকুমাতের ধ্বংস সাধন করে। শরীয়াতে এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আজাবের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। হাদীসে তাহাদিগকে شيطان اخرس 'বোবা শয়তান' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহারাই ইসলামী হুকুমাতের দুশমন ও বিশ্বাসঘাতক। হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ (রাঃ) বলিয়াছেন : "আল্লাহ কখনও অল্প সংখ্যক লোকের পাপে সকল লোককে আজাবে নিক্ষেপ করেন না, কিন্তু যখন পাপ ও জুলুম প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এবং তাহার বিরুদ্ধে একটি শব্দও কেহ উচ্চারণ না করে, তখন সর্বসাধারণের উপর ব্যাপকভাবে আজাব নাজিল হয়।" এই জন্যই আল্লাহ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন ঃ

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا

ان الله شديد العقاب - (الانفال - ٢٥)

—"যে কঠিন বিপর্যয় তোমাদের মধ্য হইতে কেবলমাত্র জালেমদিগকেই

www.pathagar.com

নহে, সমগ্র মানুষকে গ্রাস করিবে, তাহা হইতে সতর্ক হইয়া থাক। জানিয়া রাখিও, আল্লাহ্ বড় কঠিন আজাবদাতা।

এই প্রসংগে প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রাঃ) বিখ্যাত "খুত্‌বা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর-ই তিনি সমাগত ইসলামী জনতাকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত ভাষণ দিয়াছিলেন :

ايها الناس ! انى قد وليت عليكم و لست بخيركم فان
احسنت فاعينونى و ان اسأت فقومونى - الصدق امانة
و الكذب خيانة و الضعيف فيكم قوى عندى حتى اخذ له
حقه و القوى ضعيف عندى حتى اخذ الحق منه - اطيعونى
ما اطعت الله و رسوله فان عصيت الله و رسوله فلا طاعة
لى عليكم *

"হে সমবেত জনগণ! আমাকে তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা হইয়াছে, অথচ আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম লোক নহি। আমি যদি ভাল কাজ করি, তোমরা আমার সাহায্য করিও ; আর যদি অন্যায় করি, তবে আমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিও ; সত্যবাদিতা আমানত-বিশেষ, আর মিথ্যা ধ্বংসকারী। দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী, তাহার সব পাওনা আমি আদায় করিয়া দিব এবং শক্তিমান আমার নিকট দুর্বল,—তাহার নিকট হইতে অপরের পাওনা আমি উশুল করিয়া ছাড়িব। আমার আনুগত্য করিয়া চলিও—যত দিন আমি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিতে থাকিব। আর আমি যদি আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের না-ফরমানী করি, তাহা হইলে আমার আনুগত্য করিতে তোমরা বাধ্য হইবে না।"

হযরত আবুবকর (রাঃ) এখানে নিজের যে কর্তব্যের দিকে সংক্ষেপে ইংগিত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইসলামী হুকুমাতের আমীরের তাহাই সর্বাধিক গুরু-

www.pathagar.com

দায়িত্ব ও সবচেয়ে বড় কর্তব্য এবং রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করার ব্যাপারে যে ভিত্তির তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—খোদা ও রসূলের আনুগত্য করা,—বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রানুগত্যের তাহাই হইতেছে শেষ সীমা। কেননা এমন কোন আনুগত্য আদৌ করা যাইতে পারে না, যাহার ফলে খোদা ও রসূলের না-ফরমানী হইয়া যায়। নবী করীম (ছঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ০

"স্রষ্টার না-ফরমানী করিয়া সৃষ্টির আনুগত্য করা যাইতে পারে না।"

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ)ও খলীফা পদে নিযুক্ত হইয়া এইরূপ উক্তিই করিয়াছিলেন। তিনি 'খুতবা' দিতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন—"হে মানুষ! আমার কথা শোন।" তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল—"আপনার কথা শুনিব না। প্রথমে আপনি বলুন : যে কোর্তা আপনি পরিধান করিয়াছেন, উহার জন্য অত কাপড় আপনি কোথায় পাইলেন? ইতিপূর্বে সরকারী পর্যায়ে যে কাপড় বণ্টন করা হইয়াছে, তাহাতে তো এতো কাপড় একজনের ভাগে পড়ে নাই?"

হযরত উমর (রাঃ) যখন যথারীতি প্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের উভয়ের ভাগের কাপড় একত্র করিয়া এই জামা তৈয়ার করা হইয়াছে, তখন সে বলিল : "হাঁ, এখন বলুন, এখন আপনার কথা শুনিব ও মানিব।"

এই স্থানে বর্তমান দুনিয়ার "স্বর্গ" (?) সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নাগরিকদিগকে সমালোচনার কিরূপ অধিকার দেওয়া হয়, প্রসংগতঃ তাহাও জানিয়া লওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ বর্তমান রাশিয়ায় প্রেস ও জনমতের অভিব্যক্তির উপর সেন্সাস-অক্টোপাশের দুর্জয় বাঁধন এবং নিয়ন্ত্রণের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া—

—"জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রাশিয়ার প্রেস কোন সমালোচনাই করিতে পারেনা।" (পাকিস্তান টাইমস্ ১৯শে জুন,—১৯৫০ সন) ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরও এই অবস্থার কোনই পরিবর্তন হয় নাই। কেননা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতিই এইরূপ। ইহার ব্যতিক্রম হওয়া কিছুতেই এবং কখনও সম্ভব নহে।

একদিকে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা ও ইসলামপ্রদত্ত আযাদী লক্ষণীয়। অপর দিকে রাশিয়ার কমিউনিজম-প্রদত্ত স্বাধীনতা (?)ও দ্রষ্টব্য। ইসলামে

www.pathagar.com

কোন রাষ্ট্রপতি-তো দূরের কথা, স্বয়ং নবীর নিজস্ব কথা ও কাজের প্রতিকূলে যুক্তি প্রদর্শন এবং সত্য হইলে তাহার অনুসরণও অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। বদরের যুদ্ধে হযরত নবী করীম(ছঃ) প্রথমতঃ একস্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন, হযরত খোবাব (রাঃ) আসিয়া বলিলেন—"অহী অনুসারে এই স্থান ঘাঁটির জন্য নির্দিষ্ট না হইয়া থাকিলে আমাদের আর একটু অগ্রসর হইয়া ঘাঁটি স্থাপন করা উচিৎ।" উত্তরে হযরত নবী করীম (দঃ) বলিলেন---"ইহা আমার নিজের মত ও সাধারণ সমর কৌশলের দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। ফলে হযরত (ছঃ) খোবারের (রাঃ) কথা অনুসারে ঘাঁটি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইহা ইসলাম-প্রদত্ত আযাদীর চরমতম পরাকাষ্ঠা। কিন্তু অন্য দিকে রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনের ন্যায় অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তাদের মতামত সম্পর্কে "টু" শব্দটি করিবার অধিকার কাহারও নাই। কমিউনিষ্ট চীনের প্রধানমন্ত্রীও এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাশিয়ার প্রেস সরকারের সমালোচনা করিতে কিংবা সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ কোন মত প্রকাশ করিতে পারে না। খোদ চীনের অবস্থাও ইহার ব্যতিক্রম কিছুই নয়। বস্তুত মানবরচিত ব্যবস্থা নিরীহ জনগণের উপর কি অমানুষিক জুলুম ও অক্টোপাশের বাঁধন দাঁড় করাইতে পারে, ইহা তাহারই জলন্ত প্রমাণ।

কিন্তু ইসলাম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত উদার-উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ইসলামে আমীর ও অন্যান্য রাষ্ট্রকর্তাদের কেবল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন (Public Life) সম্পর্কেই সমালোচনা করা যাইবে তাহাই নয়, বরং তাহাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করা যাইবে। মানুষের জীবনকে 'প্রাইভেট' ও 'পাবলিক' এই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা এবং প্রাইভেট জীবনকে অজ্ঞতার অন্তরালে আচ্ছন্ন রাখিয়া কেবলমাত্র 'পাবলিক' জীবনের উপর সব কিছু গুরুত্ব আরোপ করা নূতন খোদাহীন গণতান্ত্রিক যুগের কীর্তি! কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা দুইটি স্বতন্ত্র জীবন নয়, একই জীবনের দুইটি আলাদা ক্ষেত্র মাত্র। তাই জীবনের এই উভয় ক্ষেত্রের মাঝে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। অন্যথায় সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবনে কখনই নীতি-নিষ্ঠা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এক ব্যক্তি তাহার প্রাইভেট জীবনে চোর হইয়া থাকে, তবে সমাজ-জীবনে—তথা রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে তাহার চৌর্যবৃত্তি সাধুতায় পরিবর্তিত হইতে পারেনা। এক ব্যক্তি যদি তাহার ব্যক্তিগত জীবনে দাগাবাজ, প্রতারক ও পরাস্বাপহরণকারী হয়; তবে সমাজ জীবনে তাহার ঈমানদার, সত্যবাদী ও সৎ হওয়ার কোনই কারণ থাকিতে পারেনা। কাজেই আমীর ও মজলিসে শু'রা নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষের

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্রকেই দেখিতে হইবে সর্বাগ্রে এবং তাহা যাচাই করিতে হইবে তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। দেখিতে হইবে : সে খোদাকে খাঁটিভাবে কতখানি ভয় করে, তাহার-বিশ্বাসপরায়ণতা ও আমানতদারীর উপর কতখানি নির্ভর করা যাইতে পারে। এই সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্তমান থাকিলে তাহার পর দেখিতে হইবে তাহার রাজনৈতিক প্রতিভা কতদূর তীক্ষ্ণ—ইসলামের ব্যাপক আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া সে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে ও সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিতে পারিবে কিনা। দেখিতে হইবে তাহার ইসলামী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং দূরদর্শিতা। কোন মুসলিম সমাজই এমন সব লোককে নিজেদের নেতা ও দায়িত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নির্বাচিত করিতে পারে না, যাহাদের হৃদয়-মনে খোদার ভয় ও আনুগত্যের স্পৃহা নাই—যাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে খোদার বিধান ও রসূলের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলেনা, যাহারা ধোঁকাবাজ, প্রতারক, পরাস্বাপহরণকারী এবং জনগণের অকল্যাণকামী ও অসেবাপরায়ন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) হযরত আবু মুসা (রাঃ) কে ইয়ামান প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার শেষভাগে তিনি বলিয়াছিলেন :

ان من ولى امر المسلمين يجب عليه ما يجب على العبد لسيده - (الطرق الحكمية)

—"যে লোক মুসলমানদের দায়িত্বশীল হইবে তাহার কর্তব্য তাহাই হইবে যাহা মনিব ও মালিকের জন্য গোলামের কর্তব্য।"

কাজেই এই সব দিক দিয়া যাহাদের নৈতিক চরিত্রের উপর সবচেয়ে বেশী আস্থা এবং ভরসা করা যাইবে, তাহাদেরই উপর অর্পণ করিতে হইবে এই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার বিরাট দায়িত্ব।

মজলিসে শু'রা ও উহার বৈশিষ্ট্য

আমীরকে পরামর্শ দান এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য নিদিষ্ট সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে একটি 'মজলিসে শূরা' গঠন করা ইসলামী রাজনীতির একটি অপরিহার্য কাজ। কোরআন শরীফে মুসলমানদের গুণ ও কার্য-পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া প্রসংগে বলা হইয়াছে :

৫—

www.pathagar.com

وامرهم شورى بينهم - (الشورى)

—"তাহাদের যাবতীয় কাজকর্ম নিজদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ লইয়া সাধিত হয়।"

অন্যত্র হযরত নবীকরীম (ছঃ) কে আদেশ করা হইয়াছে ঃ

وشاورهم في الامر - (آل عمران)

—"(সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়) কাজকর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর।"

এই জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র-নীতিতে "মজলিসে শু'রা" গঠন করার স্থায়ী নিয়ম করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে ইসলামী (ও ন্যায়সংগত) গণতন্ত্রের বুনিয়াদ।

আমীর এবং মজলিসে শু'রার সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি মূলনীতি আল্লাহ্‌তায়ালা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

ان اكرمكم عند الله اتقاكم —"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই লোকই খোদার নিকট অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ, যিনি তোমাদের সকলের অপেক্ষা বেশী খোদাভীরু ও ধার্মিক।" ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কমকর্তা নির্বাচনের জন্য ইহা একটি সাধারণ মূলনীতি। এই নীতি অনুসারে জনগণ নিজেদের মধ্যে যাহাকে সবচেয়ে ধার্মিক, খোদাভীরু, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং রাষ্ট্র-পরিচালনার যোগ্যতা ও প্রতিভাসম্পন্ন লোক বলিয়া মনে করিবে তাহাকেই "আমীর" পদে এবং এই ধরনের গুনে গুণান্বিত ব্যক্তিগণকে মজলিসে শু'রার সদস্য পদে নির্বাচিত করিবে।

মজলিসে শু'রার সদস্যদের গুণ ও যোগ্যতা কি থাকা বাঞ্ছনীয়, সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত দুইটি হাদীস হইতে অধিক সুস্পষ্ট নির্দেশ লাভ করা যায়। হযরত আলী (রাঃ) নবী মোস্তফার (ছঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কোরআন ও সুন্নাতে কোনও বিষয়ের নির্দেশ না পাইলে তখন আমাদের পক্ষে সঠিক পন্থা কী হইবে" ? উত্তরে হযরত নবীকরীম (ছঃ) বলিলেন ঃ

تجعلونه شورى بين اهل الفقه والعابدين من المؤمنين

ولا تقض فيه برايك خاصة - (رواه الطبراني في الاوسط)

www.pathagar.com

—"ইসলামী শাস্ত্রবিদ ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের লইয়া গঠিত মজলিসে শু'রার সম্মুখে বিষয়টি পেশ করিবে; কিন্তু কেবল নিজের মতের ভিত্তিতেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না।"

অর্থাৎ মজলিসে শু'রার অধিকাংশ সদস্যদের সুচিন্তিত মতে যে সিদ্ধান্ত হইবে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব না দিয়া আমীর কেবল নিজের মতের প্রাধান্যে কিছুই ফয়ছালা করিবে না। বরং সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিবে।

অন্য একটি হাদীসে হযরত নবী করীম (ছঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উমর(রাঃ) কে আদেশ করিয়াছেন:

وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللّٰهَ – (مستدرك وبيهقى)

—"তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে ঐ সব লোক লইয়া পরামর্শ কর, যাহারা খোদাকে ভয় করিয়া কাজ করে।"

অর্থাৎ যাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে খোদার বিধান পালন করিয়া চলে—যাহারা খোদার বিধান খুব ভাল করিয়া জানে, এমন লোকদের সমন্বয়ে মজলিসে শু'রা গঠন করিতে হইবে। ফাসেক, পাপী, খোদার বিধান পালনে অনভ্যস্ত এবং অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে শু'রার সদস্য নির্বাচন করা যাইতে পারে না।

মজলিসে শু'রার কার্যপদ্ধতি

মজলিসে শু'রার সম্মুখে ইসলামের বুনিয়াদী বিধান একটি অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা, উহারই ভিত্তিতে শু'রার সকল ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। আল্লাহতায়ালার উচ্চতর প্রভুত্ব-শক্তি এবং রসূল-চরিতের পথ-নির্দেশ ও নেতৃত্ব সেখানে চিরন্তন ও সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

ইসলামী রাজনীতির দৃষ্টিতে মজলিসে শু'রা একটি একাত্বক পার্লামেন্ট (Unitary Parliament)। ইহা জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী বিধানে পারদর্শী ও রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন নির্বাচিত লোকদের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা; ইহা "হাউজ অফ্ লর্ডস্" নহে, ইহার কোন সদস্যই বংশীয়-গোত্রীয় আভিজাত্য বা আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া নির্বাচিত হইবে না।

শু'রা একটি সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ একাত্বক ব্যবস্থা বলিয়া ইহার সদস্য-গণের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মালিক, ব্যক্তিগত স্বাধীন ও সত্যমত প্রকাশের অধিকারী। মজলিসে শু'রায় কোন দলাদলি বা Grouping থাকিতে পারে

www.pathagar.com

না। 'মেজরিটি আর 'মাইনরিটি' তথা সরকারীদল ও বিরোধীদল কিংবা মজুর-কৃষক ও ধনী-গরীবের কোন স্থায়ী দলবাদের অবকাশ ইহাতে নাই। শু'রার সদস্যগণ ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান সম্মুখে রাখিয়া সকল ব্যাপারে নিজের নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবে, সত্য মতের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব এবং মিথ্যা ও অন্যায় মতের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করাই হইবে প্রত্যেক সদস্যের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য।

এই পর্যায়ে কোরআন মজীদের একটি আয়াত হইতে মজলিসে শু'রার কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতির নির্দেশ পাওয়া যায়। আয়াতটি হইল :

يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى ط
واتقوا الله الذى اليه تحشرون - (المجادله - ٩)

—"হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা যখন পারস্পরিক বিষয়ে পরামর্শে লিপ্ত হও, তখন যেন তোমরা গুণাহের কাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন এবং রসূলের না-ফরমানীর বিষয় লইয়া পরামর্শ না কর (ও এই ধরনের কাজ সম্পর্কে কথা-বার্তা না বল)। বরং তোমরা যাবতীয় কল্যাণময় ও খোদার ভয়মূলক কাজেরই পরামর্শ করিবে, আর তোমরা সেই খোদাকে ভয় কর, যাহার নিকট বিচারার্থে তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।"

এই আয়াত হইতে স্পষ্টভাবে যে কয়টি মূলনীতি জানা যায়, সংক্ষেপে তাহা এই :

প্রথম : ঈমানদার লোকদের পারস্পরিক বিষয়ে পরামর্শ করা এবং পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় : পরামর্শ তো তোমরা করিবেই, কিন্তু এই পরামর্শের ব্যাপারে নেতিবাচক ও ইতিবাচক কয়েকটি সীমাকে অবশ্যই রক্ষা করিয়া চলিবে।

নেতিবাচক ভাবে মোট তিনটি সীমাকে রক্ষা করিতে হইবে। এক, কোন গুনাহের কাজের পরামর্শ করিতে পারিবেনা, পরামর্শ করিয়া কোন গুনাহের

www.pathagar.com

কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবেনা, যে কাজে মূলতঃই আল্লাহর না-ফরমানীহয়, তাহা অবশ্যই বর্জন করিতে এবং সেইরূপ কাজ যাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় খোদার না-ফরমান হইয়া যাইবে।

দুই, সীমা লংঘন হয় যে কাজে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেনা। এই সীমা আল্লাহর কোরআন ও রসূলের সুন্নাত দ্বারা নির্দিষ্ট। সামগ্রিক কাজ-কর্ম সম্পর্কে যে পর্যায়ে যে সীমা কোরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে, পরামর্শ করণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়নে তাহা কিছুতেই লংঘন করা যাইবেনা।

তিন, সামাজিক ও সামগ্রিক কাজ সম্পাদনের ও বিস্তারিত বা খুঁটিনাটি বিষয়ে নিয়ম-প্রণালী বা আইন প্রণয়নে রসূলে করীমের অনুসৃত আদর্শ এবং প্রদর্শিত পথ ও পন্থাকে পরিহার করা চলিবেনা। বরং তাহা অনুসরণ করিয়াই মজলিসে শু'রার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

ইতিবাচকভাবে পরামর্শ করিতে হইবে দুইটি মোটা মোটা ভাবধারাকে ভিত্তি করিয়া।

একটি এই যে, মূলগতভাবেই পরামর্শ হইতে হইবে 'বির্ (البر) সম্পর্কে। ইমাম রাগেবের ভাষায় البر শব্দের অর্থ হইল التو سع فى فعل الخير—'কল্যাণময় কাজের বিশালতা', 'বিপুল কল্যাণময় কাজ।' আর তাফসীরকারদের মতে ইহার অর্থ হইল ঃ

اداء الفرائض و الطاعات و ما يتضمن خير المؤمنين -

"নির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন, খোদার বন্দেগী অবলম্বন এবং মুমিন জনগণের সার্বিক কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন"।

এক কথায়, জনগণের সর্বাত্মক কল্যাণ-ই হইবে শু'রার লক্ষ্য এবং যাহাতে নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহারই বাস্তব কার্যসূচী গ্রহণ করাহইবে শু'রার একমাত্র দায়িত্ব—যদিও তাহা করিতে হইবে খোদার বন্দেগীমূলক নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

আর দ্বিতীয়টি হইল, 'তাক্ওয়া'। অর্থাৎ এই সব কাজ সম্পাদন করিবার ব্যাপারে শু'রা সদস্যদের মনে প্রধান উদ্বোধক, নিয়ামক, প্রেরণাদাতা ও নিয়ন্ত্রণকারী ভাবধারা হইবে খোদার ভয়। খোদাকে ভয় করিয়াই তাঁহার নিষিদ্ধ-কাজ বর্জন করিতে এবং তাঁহার আদেশ সমূহকে যথাযথ মর্যাদা দান ও পালন করিতে হইবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মজলিসে শু'রা (পার্লামেণ্ট) প্রধানতঃ পরামর্শ সংস্থা।

www.pathagar.com

এই আয়াত হইতে পরামর্শ সংস্থার রূপ ও কর্মনীতি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

ঐক্য, সমীকরণ এবং সামঞ্জস্য বিধানই ইসলামের উদার প্রকৃতির বাস্তব পরিচয়। হাজার রকম মতবিরোধ ও বিতর্কের পর ইহাই তাহাদিগকে একটা শেষ সিদ্ধান্তে মিলিত ও একত্রিত করিয়া দেয়, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক

এই প্রসংগে একটি বিশেষ কথা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকার এক জিনিস কিংবা একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ নয়। মূলতঃ ইহা দুইটি স্বতন্ত্র জিনিসের নাম। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান যদিও নীতিগত ভাবে এই মতই পোষণ করে, তবুও কার্যতঃ সরকারই এখন সর্বত্র 'রাষ্ট্রে'র স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বিচার করিলেও রাষ্ট্র ও সরকারকে কখনই এক জিনিস ধরিয়া লওয়া যায় না; আর কার্যতঃ তাহা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। বিভিন্ন দিক দিয়া এই পার্থক্যকে অনুধাবন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সরকার রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদানগুলির ন্যায় একটি উপাদান মাত্র; উহা রাষ্ট্রেরই একটি অংশ। তাই অংশকে 'সমগ্র' বলিলে যেমন ভুল হয়, সরকারকে রাষ্ট্র বলিলেও অনুরূপ ভুল হইবে—সন্দেহ নাই। কোন প্রাণীর শুধু মস্তিষ্ক যেরূপ 'প্রাণী' নহে, সেইরূপ কোন দেশের সরকারকেও 'রাষ্ট্র' বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা সরকারের লোক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। দেশের সমগ্র জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়; কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনা করে সমগ্র জনসমষ্টির একটি সামান্যতম অংশ মাত্র। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্র স্থায়ী ও চিরন্তন প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সরকার সাময়িক ও পরিবর্তনশীল; সরকারের পরিবর্তনে বা পতনে রাষ্ট্রের অবসান ঘটে না। কিন্তু রাষ্ট্র শেষ হইয়া গেলে সরকারের অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই উঠেনা। চতুর্থতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে, সরকারের তাহা নাই; সরকার রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু এই ক্ষমতা সরকারের নয়—সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের। পঞ্চমতঃ সরকারের নীতি বা স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তির নানা প্রকার অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ রাষ্ট্রই জনগণের সকল অধিকারের উৎস। ব্যক্তি অথবা সরকার সকলেই রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার লাভ করিয়া থাকে। ষষ্ঠতঃ রাষ্ট্র একটি অবয়বহীন শক্তি বা ক্ষমতা বিশেষ; সরকার উহার বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমেই কাজ করে। এই জন্য কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরকারকে দেহ এবং রাষ্ট্রকে আত্মার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ রাষ্ট্র ও সরকারের এই পার্থক্য ইসলামী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আরও প্রকট। রূপকভাবে রাষ্ট্রকে মনিব ও সরকারকে উহার চাকর বলা যাইতে পারে। মনিবই প্রায় যাবতীয় ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মালিক। চাকর শুধু হুকুমের দাস। মনিবের যাহা মর্জী, তাহা পূরণ করাই হয় চাকরের একমাত্র কর্তব্য। অন্যথায় চাকরের চাকুরী নষ্ট হইয়া যায়। রাষ্ট্র ও সরকারের বেলায়ও এই কথা পুরাপুরি সত্য। কিংবা একটি মসজিদকে রাষ্ট্র, ইমাম ও মোতাওয়াল্লীকে সরকার এবং নামাজীগণকে দেশের নাগরিকদের সহিত তুলনা করিলে উদাহরণটি অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে।

মসজিদের উদ্দেশ্য নামাজ পড়া, ইমাম মোতাওয়াল্লীর কর্তব্য নামাজের ব্যবস্থা করা, মসজিদের হেফাজত করা এবং নামাজীদের সর্ববিধ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা। এই কাজে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা দেখাইলে বা ইসলামী আদর্শ লংঘন করিলে নামাজীগণ তাহাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিতে পারে—আওয়াজ তোলা তাহাদের দ্বীনি কর্তব্য হইয়া পড়ে। ইসলামী শরীয়াতে নামাজীদের ইহা কোন অপরাধ নয়। অতএব ইমাম-মোতাওয়াল্লী কোন নামাজীকে এই অপরাধে মসজিদ হইতে বিতাড়িত করিতে কিংবা তাহার সহিত কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু মসজিদের কোন প্রকার অবমাননা বা ক্ষতি সাধন করিলে সেই মসজিদে তাহার প্রবেশ করারও অধিকার থাকিতে পারে না। তদ্রূপ ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মারাত্মক অপরাধ; কিন্তু সরকারের দোষত্রুটির সমালোচনা করা, তাহাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন করা কিছুমাত্র অপরাধের কাজ নয়, অতএব সাম্প্রতিক সরকার এই অপরাধের জন্য কাহাকেও কোন শাস্তি দিতে পারে না।

নির্বাচন

ইসলামী রাজনীতিতে দুইটি শর্তে ভোটাধিকার লাভ হইয়া থাকে—ইসলাম এবং ইসলামী চেতনা। এতদ্ব্যতীত ভোটাধিকার লাভের জন্য কোন শর্তই ইসলামী রাজনীতি স্বীকার করে না। বিশেষ কোন ডিগ্রী, নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ-সম্পত্তির মালিকানা বা কর প্রদান; অথবা বর্ণ, গোত্র ও অঞ্চলের কোন শর্ত আরোপ করা এবং তাহার বাহিরের লোকদিগকে ভোটাধিকার না দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। ইসলাম তাহার রাজ্যের অধিবাসী স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, শহরবাসী ও গ্রামবাসী এবং পথিক ও নিজ বাড়ীতে উপস্থিত—সকলেরই ভোটা-

www.pathagar.com

ধিকার রহিয়াছে। ইহা সার্বজনীন অধিকার; ইহা কেহই হরণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতীক, এখানে ইসলামী চেতনাশীল প্রত্যেকটি (বয়স্ক) মানুষই আল্লাহ্‌র খলীফা।

এই পর্যায়ে কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ্য:

و من يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن ٥

—"যে সব স্ত্রী ও পুরুষ ঈমানদার হইয়া নেক কাজ করিবে, (তাহারাই ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণ অধিকার সম্পন্ন নাগরিক হইতে পারিবে"।)

ইসলামী রাজনীতিতে নির্বাচনের অর্থ জনবল, জনপ্রিয়তা ও প্রচারশক্তির আসুরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঁখড়া কায়েম করা নয়—ইহা খোদার তরফ হইতে অর্পিত এক বিরাট ও জাতীয় কর্তব্য পালন মাত্র।

নির্বাচনের নীতি

ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে কোন পদের জন্য প্রার্থী হওয়ার প্রথার (Candidature) বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কোন ব্যক্তি কোন পদের জন্য প্রার্থী হইলে কিংবা কোন পদ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে তাহাকে কোন পদই দেওয়া যাইবে না।

তাহার কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পদ ও দায়িত্ব চাকুরী নয়—নিছক খেদমত বিশেষ। শক্তি ও পদ লাভের জন্য লালায়িত হয় এবং চেষ্টা করে শুধু তাহারাই, যাহারা সব সময় উহার স্থূল স্বার্থটাই লক্ষ্য করে। কিন্তু যাহারা রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং পদের গুরুদায়িত্বের কথা চিন্তা করে, যাহারা ইহাকে মানুষের খেদ্‌মত করার একটা উপায় মাত্র মনে করে এবং যাহাদের মনে পরকালে জওয়াবদিহি করার অনুভূতি সকল সময় অত্যন্ত তীব্রভাবে জাগ্রত থাকে, তাহারা কখনই ইচ্ছা করিয়া কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে পারে না; কিংবা সেজন্য কোন আগ্রহও প্রকাশ করিতে পারে না। বরং এই গুরুদায়িত্বের ভয়ে তাহাদের মন ও আত্মা সতত কম্পিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে কোন পদ গ্রহণ করিতে বলা হইলে তাহারা ঠিক হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) মতই জওয়াব দিবে—(যখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহকে খলীফা নিযুক্ত করিয়া যাইতে, তখন অন্তিম-শয্যায় শায়িত উমর ফারুক বলিয়াছিলেন) "খাত্তাবের বংশধরদের মধ্যে এক ব্যক্তিও যদি খোদার নিকট রেহাই পাইতে পারে, তবে তাহাই যথেষ্ট; আর হিসাব বাড়াইয়া লাভ নাই।"

www.pathagar.com

কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশই হউক কিংবা সমাজতান্ত্রিক দেশ, সকল জায়গায়ই নির্বাচন হইতেছে অর্থ-বল ও স্বৈরতন্ত্র প্রদর্শনের এক লীলা ক্ষেত্র। সেখানে সকল ব্যাপারেই যোগ্যতা একটি অপরিহার্য শর্ত হিসাবে গণ্য হইলেও এসেমব্লী নির্বাচনে সদস্য হওয়ার যোগ্যতার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয় না ; অথচ এসেমব্লীর নির্বাচন শুধু একটা ভোট দেওয়া কিংবা ভোট গ্রহণই নয়, কেবল তাহাতেই উহার প্রতিক্রিয়া শেষ হইয়া যায় না। বরং ভোট দেওয়ার অর্থ হইতেছে কাহারও উপর সমগ্র জাতি, দেশ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক দায়িত্ব অর্পণ করা। কাজেই এই ব্যাপারে সদস্য-পদের যোগ্যতা এবং নৈতিক চরিত্রের বিশিষ্টতা সর্বপ্রথম অনিবার্য হওয়া আবশ্যক। গণতন্ত্র অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এই ব্যাপারটিতেও পুঁজি, জন-বল ও প্রতারণা-শক্তির তাণ্ডবলীলা দেখাইবার অবাধ সুযোগ করিয়া দেয়। আর সমাজ-তান্ত্রিক দেশে ইহাকে কমিউনিষ্ট পার্টির একচেটিয়া অধিকারের বস্তু রূপে গণ্য করা হয়। সেখানে এসেমব্লী নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির মনোনীত ব্যক্তিই প্রার্থী হইতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সে-ই নির্বাচিত হইতে পারে। সেখানে নির্বাচন বলিতে ইহাই বুঝায়।

ইসলামে পদ লাভের জন্য কাহারও এতটুকু ইচ্ছা বা চেষ্টা প্রকাশ পাওয়াও তাহার অযোগ্যতার একটি অকাট্য প্রমাণ। তাবুক যুদ্ধের পর হযরত আবুমুসা আশ্‌য়ারীর সমভিব্যাহারে দুইজন মুসলমান নবীকরীমের খেদমতে হাযির হইল এবং তাঁহার নিকট কোন পদের প্রার্থনা করিল। তখন নবীকরীম (ছঃ) মিসওয়াক করিতেছিলেন। এই কথা শ্রবণের সংগে সংগে হযরতের মিসওয়াক থামিয়া গেল এবং হযরত আবু মুসা (রাঃ)-কে এই লোক দুইটির সংগে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। আবু মূসা (রাঃ) কম্পিত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—“হুজুর! সেই খোদার শপথ যিনি আপনাকে সত্যবিধান সহ পাঠাইয়াছেন ; এই লোক দুইটির মনের ইচ্ছা আমার আদৌ জানা ছিল না। আমি ইহাও জানিতাম না যে, তাহারা আপনার নিকট কোন পদ-প্রার্থনা করিবে।”

তখন নবীকরীম (ছঃ) বলিলেন :

انا والله لا نولي على هذا العمل احدا ساله ولا احدا

حرص عليه - (بخاری ، مسلم)

www.pathagar.com

—"খোদার শপথ, যে ব্যক্তি নিজে কোন পদ লাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, কিংবা কোন পদের প্রতি লোভ প্রদর্শন করিবে, তাহাকে আমি কখনই কোন পদে নিযুক্ত করিব না।"

হযরতের নিম্নলিখিত বাণীটি ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং রাষ্ট্রীয় পদে কর্মচারী নিয়োগ উভয় ব্যাপারেই সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্যঃ

من استعمل رجلا لمودة او لقرابة لا يشغله الا ذلك

فقد خان الله و رسوله و المؤمنين ০ (سيرة عمر ابن جوزى)

—"বন্ধুতা বা নিকটাত্মীয়তার কারণে যদি কেহ কাহাকেও কোন পদ দান করে, তবে সে খোদা, রসূল এবং সমগ্র মু'মিনদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে।"

কাজেই ইসলামী রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীদের নিকট হইতে কোন দরখাস্ত ও জামানত তলব করা হয় না এবং কাহাকেও নির্বাচনী প্রোপাগাণ্ডার অভিযান চালাইবার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন মানুষই সেখানে নিজ নিজ ভোট-এলাকায় ভাড়াটিয়া ক্যানভাসার ছাড়িয়া দিয়া বড় বড় প্রশংসাযুক্ত পোষ্টার ও হ্যাণ্ডবিল ছড়াইয়া, আর নগদ টাকা বণ্টন করিয়া এবং ভবিষ্যতে "আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দেওয়ার" বড় বড় ওয়াদা করিয়া সরল মনের ভোটদাতাগণকে বিভ্রান্ত করিবার এতটুকু সুযোগও পাইতে পারে না। ইসলামী আদর্শে কর্মকর্তা নির্বাচনের ভোট গ্রহণকার্য সম্পন্ন হইবে সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ ভাবে, তাহার সহজ এবং কার্যকর পন্থা এই হইতে পারে যে, নির্দিষ্ট তারিখে ভোট কেন্দ্রে প্রত্যেক ভোটদাতা উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ এলাকার লোকদের মধ্য হইতে সবচেয়ে খাটি ও আদর্শবাদী ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছা বিবেচনা অনুসারে ভোট দিয়া আসিবে। কেহ তাহার নিকট ভোট প্রার্থনা করিবে না—ভোট খরীদ করিবার জন্যও সেখানে কেহ উপস্থিত থাকিবে না। ভোটদাতাগণ "ভোট" কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমানত এবং ভোটদানকে একটি দ্বীনি কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে। খোদার আদেশ ঃ

ان تؤدوا الامانات الى اهلها -

www.pathagar.com

"প্রত্যেকটি আমানতকে তাহার যোগ্য লোকদের নিকট অর্পণ কর।" অনুসারে উপযুক্ত পাত্রেই এই ভোট অর্পণ করা ফরজ বলিয়া বিশ্বাস করিবে। নিজেকে নির্দিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত মনে করিলেও কেহ নিজেকে ভোট দিতে পারিবে না।

ইসলামের এই নিখুঁত ও সুসংবদ্ধ নির্বাচন-নীতির কেহ বিরুদ্ধতা করিলেও তাহাকে বাতিল ঘোষণা করিতে হইবে। নির্বাচনের ব্যাপারে দুর্নীতির আশ্রয় লওয়ার অপরাধ মারাত্মক হইলে তাহাকে বিচারালয়ে সোপর্দ করিতে হইবে।

ইসলামী রাষ্ট্রনায়কদের দায়িত্ব

ইসলামী হুকুমাত কেবল সেই সব লোকের সমন্বয়েই গঠিত হয়, যাহারা ঈমানদার,—যাহারা প্রকৃত পক্ষেই খোদাকে ভয় করে—যাহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিবার সময় দায়িত্বানুভূতির তীব্রতায় কাঁপিয়া উঠে এবং যাহারা একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তাহা যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য দিনের বিশ্রাম আর রাতের নিদ্রা 'হারাম' মনে করে এবং সেজন্য জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে।

ইসলামী হুকুমাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) গভীর রাত্রিতে এক অসহায় বিধবা বৃদ্ধা এবং তাহার ক্ষুধাতুর শিশুদের জন্য খাদ্যের বোঝা নিজ মাথায় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সংগী হযরত আব্বাস (রাঃ) বোঝাটি নিজের মাথায় লইতে চাহিলেন ; কিন্তু তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব-ভারে কম্পিত হৃদয়ে খলীফা গভীর কণ্ঠে জওয়াব দিলেন :

لا و الله انك لا تحمل جرائمي و ظلمي يوم الدين و اعلم

يا عباس ان حمل جبال الحديد و ثقلها خير من حمل

خلافة كبرت او صغرت - (ابن اسحق)

—"না, হে আব্বাস। খোদার শপথ, বিচারের দিন তুমি আমার অপরাধ এবং জুলুমের বোঝা বহন করিবে না। হে আব্বাস ! জানিয়া রাখ, ছোট হউক

www.pathagar.com

আর বড় হউক, জুলুমের বোঝা বহন করা অপেক্ষা লৌহ-পর্বত বহন করা অধিকতর সহজ।"

তিনি খাদ্য বহন করিয়া নিয়া, নিজ হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তথা হইতে গভীর রাত্রে ফিরিয়া যাওয়ার সময় পথি মধ্যে হযরত আব্বাসকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"হে আব্বাস! আমি যখন বৃদ্ধাকে দেখিলাম ক্ষুধাকাতর শিশুদিগকে মিথ্যা-মিথ্যি উপায়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন আমার মনে হইল, যেন একটি পর্বত ভাংগিয়া আমার পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। কিন্তু এখন মনে হইতেছে, সেই পাহাড় আমার উপর হইতে সরিয়া গিয়াছে।" বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে ইসলামী হুকুমাতের আমীর ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের জন্য সুমহান আদর্শ। এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূল জিনিস উহার বাক্যরূপ নয়—বরং প্রকৃত বস্তু হইতেছে অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং তাহা হইতেছে খোদার ভয়, পরকালে জওয়াবদিহি করিবার তীব্র আতংক। কাগজ কলমে সবচেয়ে নিখুঁত ও কল্যাণকর শাসনতন্ত্র রচনা করা তো অতীব সহজ; (এবং তাহাও ইসলাম ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না)কিন্তু উহাকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত করা সম্ভব হইতে পারে না—যদি না রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মনে খোদার ভয় জাগরুক থাকে এবং দায়িত্বানুভূতি তীব্র হইয়া দেখা দেয়। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র যদি নিখুঁত, নিষ্কলুষ ও পবিত্র না হয়, তবে কাগজ কলমের শাসনতন্ত্র কাগজেই থাকিয়া যায়, তাহা কখনও বাস্তবে রূপায়িত হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই আল্লাহতা'য়ালা ইসলামী হুকুমাতের কর্মকর্তাদের যোগ্যতার স্থায়ী মানদণ্ড নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন :

ان الارض يرثها عبادى الصالحون - (الانبياء)

"ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য বান্দারাই ইসলামী হুকুমাতের (খিলাফতের) অধিকারী হইয়া থাকেন।"

উক্ত আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের দুইটি গুণের কথাই বলা হইয়াছে; একটি হইতেছে "ছালেহীয়াত" বা সততা, ন্যায়পরায়ণতা, খোদার ভয় ও ধার্মিকতা; দ্বিতীয়টি হইতেছে "ছেলাহীয়াত" বা রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা, রাষ্ট্র-নীতি-জ্ঞান, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা এবং প্রতিভা। বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে এই দুইটি গুণই অপরিহার্য।

---

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার

নাগরিক (Citizen) শব্দের অর্থ নগর বা শহরের অধিবাসী। কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের পরিভাষায় নাগরিক বলিতে বুঝায় কোন দেশ বা রাষ্ট্রের এমন সব অধিবাসীকে, যাহারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় কর্মতৎপরতায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করে।

অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক একদিকে যেমন কতকগুলি অধিকার লাভ করে, তেমনি অন্যদিকে তাহাদের উপরও অর্পিত হয় কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করাও তাহাদের পক্ষে কর্তব্য হইয়া পড়ে। কেননা রাষ্ট্রের কার্যকারিতা যেমন নির্ভর করে নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন পালন করার উপর, তেমনি নাগরিকদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া কোন রাষ্ট্রই তাহার দায়িত্ব, পালন করিতে পারেনা। বস্তুতঃ রাষ্ট্র ও নাগরিক পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। নাগরিকরাই রাষ্ট্র গঠন করে। নাগরিকগণ যদি অনুভূতিসম্পন্ন, সমঝদার, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়; আর সেই সংগে রাষ্ট্র যদি সমর্থ হয় তাহাদের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিতে,তাহা হইলে রাষ্ট্র অনিবার্যরূপে এক উন্নত ও কল্যাণময় রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে রাষ্ট্রের পক্ষে উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। অধিকার ও কর্তব্য যে অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি শুধুমাত্র নিজেদের সম্পর্কেই সচেতন হয়, আর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে হয় অসতর্ক ও অবসাদগ্রস্ত, তাহা হইলে সে রাষ্ট্র কখনই শক্তিশালী হইতে পারে না—পারে না স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করিতে।

www.pathagar.com

যেখানে নাগরিকগণ অনেক প্রকারের অধিকার লাভ করিয়া থাকে সেখানে তাহাদের অনিবার্যরূপে বহু কর্তব্যও পালন করিতে হয়। সত্য কথা এই যে, একজন নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার লাভের যোগ্য অধিকারীই হয় তখন, যখন সে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়। নাগরিককে যখন কোন অধিকার দান করা হয় তখন সেই সংগেই কতকগুলি কর্তব্যও তাহার উপর অর্পিত হয়। প্রত্যেকটি অধিকারের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এক-একটি কর্তব্য। অন্য কথায় কর্তব্য পালন হইতেছে অধিকারের জন্মদাতা—অধিকার লাভের চাবিকাঠি। অধিকার হইতেছে নাগরিকদের প্রাপ্য, রাষ্ট্র তাহা পরিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের কর্তব্য হইতেছে নাগরিকদের অধিকারসমূহের পুরাপুরি সংরক্ষণ। তাহা করিতে রাষ্ট্র অসমর্থ বা ব্যর্থ হইলে অধিকার দানই অর্থহীন হইয়া যায়। নাগরিকদের কর্তব্য তাহারই মত অন্যান্য নাগরিকের অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা। বরং একদিকে নিজের অধিকার লাভ ও সেই সংগে অপরাপর নাগরিকদের অধিকারের সংরক্ষণই প্রত্যেকটি নাগরিকদের কর্তব্য। ফলে এক নাগরিকের পক্ষে যাহা অধিকার, অপর নাগরিকের পক্ষে তাহাই কর্তব্যে পরিণত হয়।

নাগরিক অধিকার নাগরিকদের উপর দুই প্রকারের কর্তব্য আরোপ করে। প্রথমতঃ অপর নাগরিকের অধিকারের যথাযথ মর্যাদা দান, তাহাকে তাহার অধিকার লাভের পূর্ণ সুযোগ দান ও অনুকূল পরিবেশ রচনা। অর্থাৎ কোন নাগরিক অপর কাহারও অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা তাহা লাভের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

আর দ্বিতীয় এই যে, নিজের অধিকার পুরাপুরি লাভ করার সংগে সংগে সে নিজের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা-প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ দান করিবে এবং তাহা সর্বোতভাবে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

ইসলাম স্বভাব-সম্মত জীবন ব্যবস্থা, মানবতার সার্বিক কল্যাণের নিয়ামক একমাত্র আদর্শ। ইসলাম মানুষকে অধিকার ও কর্তব্য এই দ্বৈত বন্ধনে নিবিড়ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইসলাম একদিকে নাগরিকদিগকে যাবতীয় অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছে। নাগরিকদের তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইতে ও তাহা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করার জন্য অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধও করিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, ইসলাম নাগরিকদিগকে সেজন্য বাধ্য করিয়াছে। এই প্রসংগে লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্য আদর্শের ও ইসলামী আদর্শের

www.pathagar.com

নাগরিকত্বের তাৎপর্য মূলগতভাবেই ভিন্ন ও পরস্পর পৃথক। ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে নাগরিক অধিকার খোদা ও রসূলের দ্বারা নির্ধারিত। ইসলামী রাষ্ট্র বা উহার কোন কর্তৃত্বশালী নাগরিকও এই অধিকারে কোনরূপ রদবদল বা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে না। এই অধিকার দেওয়াই হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, প্রত্যেক নাগরিক খোদানুগত্যের ভিত্তিতে আদর্শ জীবন যাপন করিবে এবং জনগণের কল্যাণ সাধনকে স্বীয় কর্তব্য রূপে গণ্য করিবে। ইসলাম জনগণের অধিকার ও কর্তব্যকে নির্ধারণ করিয়াছে তাহাদের সামর্থ্যানুসারে, তাঁহাদের সাধ্য ও শক্তির সহিত পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানের আদর্শবাদী ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হওয়াই তাহার একজন নাগরিক হওয়ার উপযুক্ত পরিচয়।

এই পর্যায়ে কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হইল:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّيْنِ

"তাহারা যদি তওবা করে—ইসলামী আদর্শ গ্রহণ ও পুরাপুরি পালন করিয়া চলার সিদ্ধান্ত করে আর সেই হিসাবে নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।"

(সূরা তওবা)

যে দ্বীনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত, সেই দ্বীন পালনের প্রতিশ্রুতি এবং উহার বাস্তব অনুসরণই হইতেছে নাগরিকত্ব লাভের প্রথম শর্ত। এইভাবে যাহারাই ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করিবে, তাহারা রাষ্ট্র সম্পর্কেও সকল বিষয়েই সমান অধিকার সম্পন্ন নাগরিক।

নাগরিকদের শ্রেণী পার্থক্য

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম মুসলিম নাগরিক; আর দ্বিতীয় অমুসলিম নাগরিক। ইসলামী পরিভাষায় অমুসলিম নাগরিকদিগকেই বলা হয় 'যিম্মী'।

এখানে প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদেরই নাগরিক অধিকার এবং তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইতেছে।

www.pathagar.com

মুসলিম নাগরিকদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বিশেষে সমস্ত মুসলিম নাগরিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমান অধিকারসম্পন্ন। এই ব্যাপারে শাসক ও জনগণের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া থাকে। উভয়ই পারস্পরিক মিলমিশ সহকারে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী। আর আনুগত্য ও সহযোগিতা এবং দ্বীনের খেদমত করার ব্যাপারে সকলেরই দায়িত্ব সমান।

নাগরিক অধিকার পর্যায়ে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি গণ্য হইয়া থাকে: (১) সামাজিক অধিকার (২) অর্থনৈতিক অধিকার এবং (৩) রাজনৈতিক অধিকার।

(১) **সামাজিক অধিকার:** নাগরিকদের জীবন, ধর্ম, ধন-সম্পদ, ইজ্জত আবরু সম্পর্কিত অধিকারসমূহ সামাজিক অধিকারের মধ্যে গণ্য। এই সকল অধিকার যথাযথভাবে লাভ করিতে না পারিলে নাগরিকদের পক্ষে সভ্য মানুষের জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। মানুষের মত উন্নত ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সব সামাজিক অধিকার একান্তই অপরিহার্য এবং জরুরী শর্তরূপে গণ্য। এককথায় ইহা হইল ইসলামী নাগরিকত্বের সহিত জড়িত মৌলিক অধিকার।

বাঁচার অধিকার: মানুষের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন জীবনের নিরাপত্তা লাভ। ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধান ইহার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কোরআন মজীদ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছে:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ -

'তোমরা মানুষ হত্যা করিওনা, যাহাকে আল্লাহতায়ালা সম্মানিত করিয়াছেন। হত্যা করা যাইতে পারে কেবল মাত্র সত্যের কারণে, সত্য-নীতি সহকারে।'

অর্থাৎ সাধারণভাবেই মানুষের জীবন সুরক্ষিত থাকিবে। সত্য ও আইনের খাতিরে হত্যা করার প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্ত মানুষের জীবন ও প্রাণ পূর্ণ নিরাপত্তা ও সার্বিক সংরক্ষণ লাভের অধিকারী। আর ইসলামী রাষ্ট্র এই নিরাপত্তা দানে ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়ী। জীবন বলিতে শুধু আয়ুটুকু বুঝায় না। মানুষের ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

কাজেই কোন নাগরিকের পক্ষেই অপর কোন নাগরিকের জীবন-প্রাণ ও ইজ্জত-আবরুর উপর হস্তক্ষেপ করা নিত্যান্তই অমানুষিক অপরাধ। অপার কাহাকেও ইহা হইতে বঞ্চিত করার অধিকারও কাহারও নাই। ইসলামী রাষ্ট্রও আইনের তাকীদ ছাড়া এই কাজ করিতে পারিবে না।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঃ ইসলাম নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বঞ্চিত নাগরিক মানুষ পদবাচ্য নহে। এই অধিকার যাহাতে নাগরিকগণ যথাযথভাবে পাইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। নিরপেক্ষ তদন্তে ও বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া এবং তাহাদের নির্দোষিতা প্রমাণের অবাধ সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত কোন নাগরিককে তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করার রাষ্ট্র-সরকারের কোন অধিকার নাই।

মালিকানা অধিকার ঃ ইসলামে তৃতীয় মৌলিক অধিকার হইতেছে বিত্ত ও সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার। প্রত্যেক নাগরিকেরই বৈধ উপায়ে উপার্জন করার ও উপার্জন করিয়া সম্পদ ও সম্পত্তির মালিক হওয়ার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। সেই সংগে স্বীয় মালিকানাধীন বিত্ত-সম্পত্তির ভোগ ও ব্যবহার করার অধিকারও নিশ্চিত থাকিবে। অপর কোন নাগরিক কাহারও এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি পাইতে পারে না। অনুরূপ-ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ইচ্ছায় সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয় করিতে পারে। অবশ্য এই অধিকার প্রয়োগ করিতে হইবে শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। শরীয়তের সীমালংঘনকারী ব্যক্তি-মালিকানাও ইসলামে স্বীকৃত নহে। ব্যক্তি-মালিকানার অধিকার প্রয়োগ যদি কোনো পর্যায়ে সমাজ ও সমষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে তাহা শরীয়তের ভিত্তিতে অবশ্যই হরণ করা যাইবে।

সাম্যের অধিকার ঃ এই পর্যায়ে আইনগত সাম্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আইনগত সাম্য অর্থ সমস্ত নাগরিক, ধনী-গরীব, অভিজাত, নীচবংশ-জাত উচ্চ ও নিম্নস্থ কর্মচারী, শাসক ও শাসিত সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমান, অভিন্ন। সকলেই আইনের নিকট জওয়াবদিহি হইতে বাধ্য, আইনের বিচার গ্রহণে বাধ্য। কেহই ইহার ঊর্ধে বিবেচিত হইতে পারেনা—হওয়ার দাবীও করিতে পারে না।

সামাজিক সাম্য ঃ ইসলামে মুসলিম নাগরিকদের পূর্ণ সামাজিক সমতা স্থানীয়ভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত। বংশ, বর্ণ, ধন-মালের ব্যবধান, ভাষা ও অঞ্চল কোন দিক দিয়াই মানুষের মধ্যে তারতম্য করা হয় না। এই সকল

www.pathagar.com

সমতা বিশেষভাবে ঘোষিত হইয়াছে নবী করীমের বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে। হযরত উমর ফরুক (রাঃ)ও ঘোষণা করিয়াছেন:

ليس بين الله و بين احد نسب الا بطاعته ، فالناس
شريفهم و وضيعهم في دين الله سواء - (الفاروق)

'আল্লাহ এবং মানুষের মাঝে কোনরূপ বংশীয় সম্পর্ক নাই, মানুষের সহিত খোদার সম্পর্ক শুধু খোদার আনুগত্য করার দ্বারাই স্থাপিত হয়। অতএব মানুষের মধ্যে অভিজাত বা নীচজাত যাহাই হউক না কেন, খোদার দ্বীনে সব মানুষই সর্বতোভাবে সমান।' (আলফারুক, মুহাম্মদ হাসান হায়কল)

চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার: প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকেরই অন্যান্য ব্যক্তি বা লোক-সমষ্টির সহিত যে-কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য সেই চুক্তির কোন শর্তই ইসলামের সামগ্রিক বিধানের বিপরীত হইতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কিংবা রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন ও বিধানের বিপরীত কোন শর্ত স্বিরিকৃত হইলে তাহাও নাকচ হইয়া যাইবে।

লেখা, বলা ও প্রচারকার্যের অধিকার: প্রত্যেক নাগরিকই স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস অনুসারে যে-কোন কথা বলিতে এবং উহার প্রচার করিতে পারিবে অসংকোচে, অকুণ্ঠিত ভাবে, অবাধে ও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকেই। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী কিছুই করা চলিবেনা। এই ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সরকারে পারস্পরিক মৌলিক পার্থক্যকে কোন ক্রমেই ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না। রাষ্ট্র স্থায়ী, মৌলিক ও ভিত্তিগত; আর সরকার সবসময়ই পরিবর্তনশীল। তাই সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লেখা বলা বা প্রচার করা সবসনয় রাষ্ট্রের বিরোধী নহে।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের অধিকার: প্রত্যেক নাগরিক নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করার স্বাধীনতা লাভ করিবে। এই ব্যাপারে কোনরূপ আইন বা রসম-রেওয়াজের প্রাচীর তুলিয়া নাগরিকদের জীবনকে সংকীর্ণ করিয়া তোলার কাহারও অধিকার থাকিতে পারেনা। কিন্তু বিবাহ ব্যতিরেকে কোন নারী-পুরুষের একত্র জীবন যাপন ইসলামী রাষ্ট্রে কিছুতেই চলিতে পারিবে

www.pathagar.com

না। অথবা ইসলাম বিরোধী কোন পদ্ধতিতেও পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারিবেনা। অনুরূপভাবে পারিবারিক জীবনে নৈতিকতাবিরোধী কোন আচরণ গ্রহণেরও অধিকার কাহারও নাই।

শিক্ষা লাভের অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকই মৌলিক শিক্ষা লাভের অধিকারী। শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও আদর্শ যে-কোনরূপ সরকার অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। রসূলে করীমের ঘোষণা :

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة -

'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ইল্‌ম হাছিল করা ফরয' কথাটি এই দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইল্‌ম ব্যতিরেকে না মুসলিম হওয়ার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব, না সম্ভব ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা।

(২) অর্থনৈতিক অধিকার

প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান হইতে উপকৃত হওয়ার অধিকারী। এই ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে জুলুম। উপার্জনের অবাধ অধিকারের সংগে সংগে উপার্জনের যে-কোন উপায় এবং পেশা গ্রহণেরও পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। এই ব্যাপারে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য বা তারতম্য সৃষ্টির কাহারও অধিকার নাই। অনুরূপভাবে সাধারণ ও উচ্চ পর্যায়ে যে-কোন সরকারী বা বে-সরকারী চাকুরী গ্রহণের ও যে কোন পদে নিয়োজিত হওয়ারও পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। সকলের জন্যই চাকুরীর দ্বার অবারিত থাকিবে। কেবল মুসলিম নাগরিকই নহে, অমুসলিম নাগরিকদেরও জীবিকার উপায় গ্রহণের পথে কোনরূপ বাধা থাকিবেনা। চাষাবাদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরী সকল ক্ষেত্রেই নাগরিকগণ সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকারী। অবশ্য এ প্রসংগে একথাও সত্য যে, ইসলামী আদর্শ-বিরোধী কোনরূপ রোজগার করার কোন অধিকারই কাহারও থাকিতে পারে না। শুধুমাত্র জায়েজ ও বৈধ পন্থায়ই উপার্জন করা সম্ভব।

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রত্যেকটি নাগরিককেই খাওয়া-পরা, থাকা, চিকিৎসা ও শিক্ষা লাভের অধিকার দান করা হইয়াছে। কোন একজন নাগরিকও ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে না। কেহ নিজে সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে রাষ্ট্র-সরকার তাহার জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য দায়ী।

www.pathagar.com

এজন্য প্রত্যেককে তাহার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুসারে রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও সরকারেরই অন্যতম কর্তব্য, যেন প্রত্যেকেই নিজের চেষ্টা ও শ্রমের বিনিময়ে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের যোগ্য হইতে পারে। অন্যথায়, সে মৌলিক প্রয়োজন পুরা করার দায়িত্ব সরকারের।

(৩) রাজনৈতিক অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে রাষ্ট্র খোদার খিলাফত এবং প্রত্যেকটি মুসলিম নাগরিক এককভাবে খোদার খলীফা। এই প্রত্যেক স্বতন্ত্র খলীফাগণের সমন্বয়ে সমান অংশিদারিত্বে গঠিত সরকারই ইসলামী খিলাফত। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সব খলীফা সব মুসলমান-ই সমান অধিকারসম্পন্ন। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্র পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেকটি বয়স্ক সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম নাগরিকই সকল গুরুত্বপূণ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মত ও রায় জানাইবার অধিকারী। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান সহ সকল পর্যায়ের পরিচালক নিয়োগ ও নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাহাদের সহিত পরামর্শ করা, তাহাদের রায় ও মত জানিয়া লওয়া একান্তই অপরিহার্য। মুসলিম জনগণের মত না লইয়া ইসলামী রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রীয় পদ দখল করার কাহারও অধিকার নাই। এই অধিকারের ব্যাপারে ধনী-গরীব, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সমান। আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে মুসলিম জনগণের স্বাধীন ও অবাধ মত জানাইবার ভিত্তিতে। জনমতের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে।

শাসকদের সমালোচনা ঃ

রাষ্ট্র সর্বোতভাবে ইসলামী আদর্শ ও আইন-কানুন পালন করিয়া চলিতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে সার্বিকভাবে খোদার নিকট দায়ী, অপরদিকে উহা দায়ী দেশের জনগণের সম্মুখে। সরকারের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের দৃষ্টিতে সরকারের ও সরকার পরিচালকদের সমালোচনা করার নাগরিকদের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। শাসকদের দোষ-ত্রুটি, অন্যায় আচরণ ও কাজকর্মের প্রতিবাদ করার শুধু অধিকারই নহে, ইহা করা প্রত্যেকটি মুসলিম নাগরিকের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। তাহা না করিলে সেজন্য খোদার নিকট জওয়াবদিহি করিতে হইবে। শাসন কর্তৃপক্ষ যদি ইসলামী শরীয়তের বিপরীত কোন নির্দেশ দেয় বা কোন আইন রচনা ও জারী করে, তবে তাহা পালন করা মুসলিম নাগরিকদের কর্তব্য নহে। পরন্তু ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের প্রধান যদি জনগণের আস্থা হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর কোন আস্থাভাজন ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করা মুসলিম নাগরিকদের দ্বীনি ফরয রূপে ঘোষিত হইয়াছে।

মুসলিম নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর জড়িত, অবিচ্ছেদ্য। যেখানে অধিকার, সেখানেই কর্তব্য। পরন্তু অধিকার লাভ করিতে হইলে দায়িত্ব পালন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইজন্যই অধিকার আলোচনার সংগে সংগে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও বলিতে হয়। বস্তুতঃ নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করা পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে নাগরিকদের বিশেষ কয়েকটি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

আনুগত্য : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকেরই সর্বপ্রথম ও বুনিয়াদী কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের পুরাপুরি আনুগত্য করিয়া চলা। আর খোদা ও রসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতেই আনুগত্য করিতে হইবে ইসলামী রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের আনুগত্য শর্তহীন নহে, বরং শর্তাধীন। আনুগত্য ততক্ষণ চলিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রকর্তা আল্লাহ ও রসূলের অনুগত থাকিবে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানই যদি কোরআন ও সুন্নাহ তথা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য পরিহার করিয়া চলে, তাহা হইলে নাগরিকগণও তাহার আনুগত্যের বাধ্য-বাধকতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া যাইবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের শুধু আনুগত্যই নহে, সেই সংগে উহার অনুগত হইয়া থাকা এবং সর্বব্যাপারে রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা করাও প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য। এই কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত না হইলে রাষ্ট্রীয় শাসন-শৃংখলা কার্যকর হইতে পারেনা।

আইন পালন : রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন পুরাপুরি পালন করা নাগরিকদের কর্তব্য। রাষ্ট্র ও সরকার সার্বিক স্বার্থ উদ্ধার ও জনগণের প্রতিভার স্ফূরণ ও বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যেই আইন প্রণয়ন ও জারি করিয়া থাকে। এই আইন পালিত না হইলে রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্বই অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়, শাসন ও শৃংখলা চুরমার হইয়া যায়। এই কারণে ব্যক্তিগতভাবে শুধু আইন পালনই যথেষ্ট নহে, অপর কেহ-ও যাহাতে কোনরূপ আইন ভংগ না করে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য।

www.pathagar.com

রাজস্ব আদায়ঃ যাবতীয় রাষ্ট্রীয় পাওনা আদায় করা, রাজস্ব ও অন্যান্য দেয় সঠিক সময়ে সরকারী তহবিলে জমা করাও নাগরিকদের কর্তব্য। এই ব্যাপারে সরকার যাহাতে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্যথায় রাষ্ট্র অচল হইয়া পড়া-ই স্বাভাবিক।

জনসেবাঃ সাধারণভাবে জনগণের খেদমত ও কল্যাণ বিধানে ব্রতী হওয়াও নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্রের বৈষয়িক উদ্দেশ্য যেহেতু জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন, এই কারণে প্রত্যেক নাগরিককেই এই খেদমতের কাজ যেমন করিতে হইবে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে, তেমনি মোটামুটিভাবে কোন ব্যক্তিই যাহাতে নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও অধিকার বঞ্চিত না হয়, কোন দুর্দশায় পড়িয়া না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও নাগরিকদের কর্তব্য।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সর্বাত্মক রূপ

ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বুনিয়াদী নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা হইল। একদিকে এই বিধান যেমন সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক এবং সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের জন্য অতি আধুনিক ও সময়োপযোগী; তেমনি এই ব্যবস্থা অনুসারে যেখানেই একটি রাষ্ট্র কায়েম করা হয়, সেখানকার মানুষের জীবনের সমগ্র দিকে ও বিভাগে হয় এক অপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা। একমাত্র এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা-ই মানুষকে ঠিক মানুষের মর্যাদা দান করিয়া সত্যিকার আযাদী ও মুক্তির উন্মুক্ত পরিবেশে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা-ই জাতি-ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র মানুষকে জীবন ও জীবিকা, সম্মান ও সম্পত্তি এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির পূর্ণ নিরাপত্তা দান করিতে পারে। সর্বোপরি, এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই বর্তমান আন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক তিক্ততা এবং হিংসা-দ্বেষ বিদূরিত করিয়া মহান মানবতার ভিত্তিতে পরম বন্ধুতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বিশ্ব-শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম। এই দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আরও ব্যাপক ভাবে বুঝিতে হইলে ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থ নীতি, বিচার, ইনছাফ এবং উহার পররাষ্ট্রনীতিরও আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিতে হয়। আমি এখানে সংক্ষেপে এই সব দিকে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব। তাহা হইতে দুনিয়ার মানব-রচিত অপরাপর জীবন-ব্যবস্থার উপর ইসলামের বিশিষ্টতা শ্রেষ্ঠত্ব এবং উহার সর্বাধিক স্বভাবসম্মত ও মানব প্রকৃতির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কথা সুস্পষ্ট রূপে ফুটিয়া উঠিবে, আশা করি।

---

www.pathagar.com

ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা

মানব সমাজ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি এই যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই এক আদমের সন্তান, অতএব সকলেই সমান ভাবে পরস্পরের জ্ঞাতিভাই। জাতি, অঞ্চল, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার দরুন মানুষকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার নীতি ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। বস্তুতঃ সমগ্র মানব জাতির একই আদম ও হাওয়ার সন্তান হওয়ার কথা ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً - (النساء)

—"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই মহান প্রভুকে ভয় কর ও মানিয়া চল, যিনি তোমাদের সকলকে একই "মানুষ" হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (এই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, প্রথমে) তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দুইজনের ঔরসে অসংখ্য পুরুষ ও নারী (সৃষ্টি করিয়া দুনিয়ার বুকে) ছড়াইয়া দিয়াছেন।" বলা বাহুল্য এখানে "একই "মানুষ" বলিতে আদমকেই বুঝানো হইয়াছে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মানুষের মধ্যে বর্ণ, অঞ্চল, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈষম্য স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ডে যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহাকে ইংরেজ বলিয়া চিনি, যে ব্যক্তি তুরস্কে জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাকে বলি• তুর্কী। ইসলাম এই বিভিন্নতাকে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার রূপে স্বীকৃতি দিয়াছে এবং ইসলাম মানুষের এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে খোদার অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে ঃ

www.pathagar.com

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ
وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ -

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈষম্য খোদার অস্তিত্বের একটি নিদর্শন, নিশ্চয়ই ইহাতে সারে জাহানের অধিবাসীদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।"

বস্তুতঃ এই সব জিনিসকে ইসলাম মানুষের মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টির একমাত্র ভিত্তি হিসাবে মোটেই স্বীকার করে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য ইসলাম সমর্থন করে তাহা বর্ণ, বংশ, জাতি ও ভাষার পার্থক্য নয়; সে পার্থক্য সম্পূর্ণতঃ নৈতিক ও আদর্শগত। যাহারা ইসলামের নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, মতবাদ আদর্শ বিশ্বাস করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্ম-জীবনে তাহা অনুসরণ করিয়া চলে, তাহারা এক জামায়াতভুক্ত—তাহারা এক জাতি। আর যাহারা তাহা বিশ্বাস ও পালন করে না তাহাদের দল সম্পূর্ণ আলাদা—তাহারা স্বতন্ত্র জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রথম জামায়াতের লোক-দের সমাজে এই দ্বিতীয় দলের কোনই সমাজগত বা জাতিগত স্থান থাকিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট অধিকার ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশ্যই বর্তমান থাকিবে। এই দুইটি জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হইবে না—হইবে আন্তর্জাতিক নীতি ও বিধান অনুসারে। কিন্তু তাহারা কখনই এবং কিছুতেই ইসলামী জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ -

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ
اِلَى الظُّلُمٰتِ - (البقرة)

—"আল্লাহ ঈমানদার লোকদের বন্ধু, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে ক্রমান্বয়ে আলোকের দিকে পরিচালিত করেন এবং কাফেরদের বন্ধু হইতেছে

www.pathagar.com

খোদাদ্রোহী শয়তানী শক্তিগুলি ; উহারা তাহাদিগকে কেবলই আলোক হইতে অন্ধকারের দিকে টানিয়া নেয়।"

এখানে ঈমানদার ও কাফের লোকদিগকে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি রূপে পেশ করা হইয়াছে।

বিদায় হজ্জের দিন বিরাট জন সমুদ্রের সম্মুখে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন :

ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء -
انما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم
خلق من تراب - (ترمذى)

—"আল্লাহ জাহেলী যুগের অহংকার ও বংশীয় গৌরব তোমাদের মধ্য হইতে চিরতরে দূর করিয়া দিয়াছেন—মানুষ এখন মাত্র দুইটি দলে বিভক্ত হইতে পারে—ঈমানদার ও খোদাভীরু, নয় কাফের ও পাপী। মূলতঃ সমগ্র মানুষই আদমের সন্তান, আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

সমগ্র মানবের ঐক্য প্রমাণ করার পর মানুষকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করার মূলীভূত কারণ এই যে, ইসলামী বিধান অনুসারে নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতেই সমাজ গঠিত হইয়া থাকে। তাই যাহারা এই আদর্শ স্বীকার করে না, তাহারা সে সমাজের মধ্যে শামিল বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা ; কিন্তু যাহারা সেই আদর্শ স্বীকার ও বাস্তব জীবনে কবুল করিয়া এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সর্বদিক দিয়া সমান হইয়া থাকে। বংশ ও গোত্রের কোন বৈশিষ্ট কিংবা আভিজাত্যের কোন গৌরব ও বৈষম্য সে সমাজে মাত্রই স্থান পাইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত অর্থ-সম্পদ ও ধন-দৌলতের দিক দিয়া মানুষে মানুষে বিন্দুমাত্র ফারাক করা হয় না। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে ধনশালী ব্যক্তি তাহার ধন-দৌলতের প্রকৃত মালিক নহে—প্রকৃত মালিক নিখিল মানুষ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্-তায়ালা। তিনি পৃথিবীর শৃংখলা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যাহাকে ইচ্ছা ধন বা রাজ্য দান করেন, আবার যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা উহা কাড়িয়া নেন। কাজেই যাহার নিকট ধন বা রাজ্য আছে, সে শুধু ইহার জন্যই সমাজে

www.pathagar.com

কোন বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারে না। ধন বা রাজত্ব কাহারও চিরস্থায়ী বা একচেটিয়া হইয়া থাকে না। এ সম্পর্কে কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছে :

اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء - (آل عمران)

—"আল্লাহ-ই সমগ্র রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। তিনি যাহাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা হয় উহা কাড়িয়া নেন।"

বস্তুতঃ দুনিয়ার বড় বড় রাজা, সম্রাট, জমিদার ও কোটিপতি—ইহারা কেহই প্রকৃত "ধনী" নহে, ইহারা ধন ও রাজ্যের মালিকানার নিরবিচ্ছিন্ন আবর্তন-ধারার এক একটি মন্‌জিল বিশেষ। নতুবা আসলে ইহারা সকলেই 'দরিদ্র'; ধনী হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ। কিছু সময়ের তরে এই ধন কাহারও হস্তগত হইয়া থাকিলে তাহা লইয়া কাহারও এতটুকু গৌরব করা চলেনা এবং সে জন্য মানব সমাজে কোন বিশিষ্টতাও সে পাইতে পারে না।

يا يها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنى الحميد -

—"হে মানুষ, নির্বিশেষে তোমরা সকলেই দরিদ্র—খোদার মুখাপেক্ষী, আল্লাহ্-ই হইতেছেন প্রকৃত ধনী ও স্বয়ং প্রশংসিত।"

বংশ-গৌরব, ধন-সম্পত্তি কিংবা জনশক্তি ইহার কোনটিই মানুষকে খোদার নিকট সম্মানিত ও সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে খোদার নিকট অধিক সম্মান এবং মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে পরিপূর্ণ ঈমান এবং তদনুযায়ী একনিষ্ঠ কর্মধারা। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

و ما اموالكم و لا اولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى الا من امن و عمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا - (سبا)

www.pathagar.com

—"তোমাদের ধন-সম্পত্তি এবং তোমাদের বংশ ও জনশক্তি—ইহার কোনটিই তোমাদিগকে আমার নিকট সম্মানিত বা নিকটবর্তী করিতে পারে না। কিন্তু ঈমান ও তদনুযায়ী আমল যাহাদের আছে, কেবল তাহারাই আমার নিকট সম্মানিত। তাহাদিগকে তাহাদের প্রত্যেক কাজের দ্বিগুণ ফল দান করা হইবে।"

মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার একটি মাত্র মাপকাঠি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা খোদার ভয়, নৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করার গুণ।

কেবল মাত্র এই দিক দিয়াই সমাজের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশিষ্ট প্রমাণিত হইবে, সমাজ-ক্ষেত্রে তাহাকেই অন্যান্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট ঘোষণা:

يا يها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوبا
و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم - (حجرات)

—"হে মানুষ, আমরা তোমাদিগকে একই নারী ও পুরুষের ঔরসে সৃষ্টি করিয়াছি এবং বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, ইহার সাহায্যে তোমরা পরস্পরকে চিনিবে। (এতদ্ব্যতীত ইহাদ্বারা আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খোদাভীরু ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিই খোদার নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।"

বিদায় হজ্জের দিন বিশ্বনবী বিশ্ব-মানবতার মৌলিক ঐক্য ও সাম্যের যে গভীর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত চমৎকার, মর্মস্পর্শী এবং সুস্পষ্ট—দুনিয়ার সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহার কোন তুলনা নাই। তিনি বলিয়াছিলেন:

ليس لعربى فضل على العجمى و لا لعجمى فضل على
العربى - و لا لابيض على اسود و لا لاسود على ابيض فضل
كلكم ابناء ادم و ادم من تراب - (مسند احمد)

www.pathagar.com

—"অনারবদের উপর আরববাসীদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য নাই, অনারবদেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা নাই আরবদের উপর। কৃষ্ণাংগের উপর শ্বেতাংগের এবং শ্বেতাংগের উপর কৃষ্ণাংগেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। বস্তুতঃ তোমরা সকলেই আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে মাটি হইতে।"

এই স্থানে হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) নিম্নলিখিত বাক্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

ا لناس شريفهم و وضيعهم في دين الله سواء -

—"খোদার দ্বীনে আশরাফ ও আতরাফ সব মানুষ-ই সমান।" দুনিয়ার মানব জাতির মৌলিক ঐক্য সম্পর্কে আজ হইতে সুদীর্ঘ দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এক উম্মী নবীর কন্ঠে ইসলামের যে সত্য সুন্দর ও শাশ্বত ধারণা বিঘোষিত হইয়াছে দুনিয়ার অন্ধ বিজ্ঞানবাদী মানুষ তাহা এতকাল নানা ভাবে অস্বীকার করিতে থাকিলেও আজ বিংশ শতাব্দীর এক যুগসন্ধিক্ষণে বিশ্বের সম্মিলিত জাতি সংঘ (U. N. O.) নিতান্ত অজ্ঞাতসারে তাহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিসংঘের (U. N. O.) একটি বিভাগ সমগ্র দুনিয়ার তথ্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া বহু চিন্তা ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে যে :

(১) জীব-বিজ্ঞানের দিক দিয়া মানব জাতির মধ্যে বংশ, জাতি, গোত্র ও দেশ কালের কোন বৈষম্য নাই ;

(২) চিন্তা ও মনন শক্তির দিক দিয়া দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি সর্বোতভাবে সমান—কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট নয়, বড় নয়, এবং

(৩) বিভিন্ন মানব-বংশের পারস্পরিক সংমিশ্রণে সন্তানের দৈহিক বা নৈতিক কোন ক্ষতি হইবার কোনই কারণ বা সম্ভাবনা নাই।

পারস্য কবির কথা আজ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে :

آنچه دانان کنند کنند نادان
و لیکن بعد از هزار رسوائی

—"জ্ঞানীগণ যাহা করেন, নির্বোধরাও তাহাই করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহা হাজার লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করার পর"—

কিন্তু ইসলাম মানুষের শুধু মৌলিক ঐক্যের কথা ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—আর আসলেও এই ব্যাপারটি এত সহজ নয় এবং ইহার

www.pathagar.com

মূল সত্য এইখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। ইসলাম আরও অগ্রসর হইয়া মানবের সমাজ-জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে। ইসলাম বলিয়াছেঃ মানবতার এই মৌলিক ঐক্য সত্ত্বেও মানুষে মানুষে পার্থক্য করা অপরিহার্য এবং সেজন্য একটিমাত্র মানদণ্ডকেই তারতম্যের স্থায়ী কষ্টি-পাথর হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছে নৈতিক চরিত্র, খোদা ভীরুতা এবং ব্যক্তি-জীবনের কার্যকলাপ।

মানুষের চিন্তা-শক্তি যে পর্যন্ত পৌছিয়া ব্যর্থ ও পংগু হইয়া পড়িয়াছে এবং সম্মুখের গভীর রহস্য উদঘাটিত করিতে অক্ষম হইয়াছে, আল্লাহ-তায়ালার বাণী সেইখানেই সুস্পষ্ট কন্ঠে প্রকৃত তত্ত্বের প্রচার করিয়া অসহায় মানুষকে পথপ্রদর্শন করিয়াছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার মূল্য এবং মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী। তাই অন্যান্য মানব রচিত সমাজ ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামে জন্মগত উচচ-নীচের কোনই অবকাশ নাই। সমাজের মধ্যে চরিত্রবান, ধার্মিক, খোদাভীরু হওয়ার দিক দিয়া কম বেশী ও ছোটবড় হইতে পারে—হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সামাজিক অধিকার ও মানবীয় মর্যাদা সকলেরই সমান—সে দিক দিয়া মানুষের পরস্পরে কোনই পার্থক্য হইতে পারে না। বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্মগত কোন অধিকার ও বিশিষ্টতা ইসলাম স্বীকার করেনা। এই জন্যই মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু শেষ নবীর কন্ঠে ঘোষিত হইয়াছেঃ

اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كان
رأسه زبيبة - (بخارى)

—"বিদঘুঁটে চেহারার কোন হাব্‌শী গোলামকেও যদি তোমাদের উপর আমীর কিংবা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় তবুও তাহার কথা শোন এবং তাহাকে মানিয়া চল।"

অর্থাৎ হাবশী দাস বলিয়া ইসলামী সমাজে তাহার কোনই অসম্মানই, অপমান বা মর্যাদাহানি হইতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা তাহার মধ্যে থাকিতে পারে এবং তাহা থাকিলে তাহাকেও "রাষ্ট্রপ্রধান" কিংবা অনুরূপ কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত বা নির্বাচিত করা যাইতে পারে। তখন তাহার আনুগত্য করা এবং তাহার নির্দেশে যাবতীয় আইন কানুন পালন করা ইসলামী হুকুমাতের প্রত্যেকটি নাগরিকের অবশ্যই

www.pathagar.com

কর্তব্য। এই হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ নিম্নলিখিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন :

ان امر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا - (مسلم)

—"কোন নাক-কাটা ক্রীতদাসকে যদি তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং সে খোদার বিধান অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালিত করে, তবে অবশ্যই তোমরা তাহার আদেশ পালন করিবে এবং তাহার আনুগত্য করিবে।"

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের রক্ত সম্মানার্হ। বিশেষ বিশেষ অপরাধ ব্যতীত কোন ক্রমেই মানুষের রক্তপাত করা যাইতে পারে না। একজন অপরজনের ধন-সম্পত্তি হরণ করিতে পারে না, কেহ কাহারও ইজ্জত নষ্ট করিতে পারে না। হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিয়াছিলেন :

فان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا -

—"তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও মান-সম্মান সব কিছুই পরস্পরের প্রতি আজিকার দিনের মতই সম্মানার্হ ও হারাম।"

ইসলামে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র ও উচ্চ-নীচের যে মানদণ্ড গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে আদর্শগত। ব্যক্তিগত চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া যেমন সহজ, তেমনি স্বাভাবিক। মন্দ থেকে ভাল এবং ভাল থেকে মন্দ হওয়া লোক-চরিত্রের একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু দুনিয়ার মানব-রচিত অন্যান্য জীবন-ব্যবস্থায় মানুষকে পারস্পরিক পার্থক্যের বুনিয়াদ হইতেছে জাতি, বর্ণ, ভাষা, গোত্র, দেশ ও অঞ্চল ;—যাহাতে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কৃষ্ণাংগ কখনও শ্বেতাংগ হইতে পারে না, ইংলণ্ডের অধিবাসী ইংরেজ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহার পক্ষে ইংলণ্ডে থাকাকালে ভারতবাসী কিংবা বাঙালী হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি মার্কিন জাতি কখনও ইরানী বা আরব হইতে পারে না। এশিয়ার অধিবাসী কখনও ইউ-

www.pathagar.com

রোপীয়ান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ভাষার বুনিয়াদে পার্থক্য সৃষ্টি করারও ঠিক একই অবস্থা। কিন্তু দুনিয়ার যে কোন জাতির যে কোন বর্ণের, ভাষার ও অঞ্চলের মানুষই অনায়াসে "মুসলিম" হইতে পারে, শুধু মত ও আদর্শের পরিবর্তন করা আবশ্যক মাত্র। কাজেই ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থা সর্বাধিক সত্য, স্বাভাবিক ও ইনছাফপূর্ণ।

ইসলাম মানব-সমাজকে সর্বপ্রকার নৈতিক পতন, পাপ ও অপবিত্রতার পংকিলতা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র করিতে চায়। সেজন্য শরাবকে চিরকালের তরে হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ শরাব মানুষের মন ও মগজের স্বাভাবিক শক্তি ও সুস্থতাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহাতে বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্বাস্থ্য এবং ভারসাম্য বিলুপ্ত হয়, মনের শক্তি শিথিল ও দুর্বল হইয়া যায়। মানুষ এই দুর্বল মুহূর্তে এমন সব কাজ করে, যাহা অন্য কোন সময় সে কিছুতেই করিতে পারে না। এইজন্য ইসলামে শরাব এবং সেই সংগে সমস্ত প্রকার জুয়া খেলাকে চিরকালের তরে হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ এই জুয়া মানব-সমাজে ভয়ংকর বিবাদ ও নিদারুণ শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং কোটিপতিকেও নিমিষে দেউলিয়া ও সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়।

কোরআনের ঘোষণা:

يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب
و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون -

"—হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই শরাব, জুয়া, পূজা-উপাসনার আস্তানা এবং পাশা খেলা অপবিত্র জিনিস ও শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে তোমাদের মংগল হইতে পারে"।

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة
و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله
و عن الصلوة - فهل انتم منتهون -

www.pathagar.com

الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوة - فهل انتم منتهون *

—"শয়তান শরাব ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ ও মারাত্মক শত্রুতার সৃষ্টি করিতে চায় এবং তোমাদিগকে খোদার স্মরণ ও নামাজ হইতে গাফিল করিতে চায়, কাজেই তোমরা কি ইহা হইতে ফিরিয়া থাকিবে না ?"

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী এবং পুরুষ একই সমাজ-বৃক্ষের দুইটি শিকড়, একজন না হইলে অন্যজন একাকী সমাজকে বাঁচাইতে পারে না। ইহাদের প্রকৃতি, শারীরিক গঠন-আকৃতি ও অংগ-সৌষ্ঠবে বিভিন্নতা ও পার্থক্য রহিয়াছে, সামাজিক কর্ম-বন্টন-নীতি অনুযায়ী তাহাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের কেহই নিজ নিজ এলাকার সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া অন্যজনের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইসলামের সমাজ-নীতিতে তাহা সবচেয়ে বড় অপরাধ। এই জন্যই ইসলামে পর্দা প্রথাকে সমাজের অপরিহার্য অংশ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যেসব রসম-রেওয়াজের দরুন মানুষের পাশবিক লালসা ও নফসের খাহেশ অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত হইয়া উঠে, ইসলাম সেইগুলিকে চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কারণ, ঐগুলির দরুন সমাজের শান্তি ও শৃংখলার মেরুদন্ড চূর্ণ হইয়া যায়। ইসলাম একান্ত ভাবে কামনা করে যে, সমাজে শান্তি স্থাপিত হউক, পাশবিক কাজ-কর্ম ও লালসার পংকিলতা হইতে সমাজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হউক। এইজন্য কোরআনে ঘোষিত হইয়াছে :

و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن -

"প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোন অশ্লীলতা ও পাপের নিকটেও যাইও না"।

এইজন্যই ইসলামী সমাজে যাহারা অনাচার, উশৃংখলতা, পর্দাহীনতা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নাচ-গান, মীনাবাজার, বিচিত্রানুষ্ঠান, মেলা ও নারীবাহিনীর গার্ড অব-অনার এবং নাচের সম্বর্ধনা গ্রহণের প্রচলন করিয়া মুসলিম নারীর শরম ও সতীত্বের দুর্গ-প্রাকার চূর্ণ করিয়া নির্লজ্জতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে চায়, তাহারা ইসলাম ও মিল্লাতে ইসলামীয়ার

www.pathagar.com

ভয়ানক দুশমন। দুনিয়া ও আখেরাতে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। উপরন্তু এইশ্রেণীর লোক কখনও ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কোরআন শরীফে স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হইয়াছে:

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم
عذاب اليم في الدنيا و الاخرة - و الله يعلم و انتم لا تعلمون *

(النور)

—"মুসলমানদের সমাজে যাহারা লজ্জাহীনতা ও পাপ-প্রথার প্রচলন করিতে ভালবাসে, তাহাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন আজাব নির্দিষ্ট আছে। (কোন কাজে লজ্জাহীনতার চর্চা হয়, আর কোন কাজে হয় না, তাহা) আল্লা তায়ালাই (ভাল) জানেন, তোমরা তাহা জাননা।"

এইস্থানে হযরত ইবনে আব্বাসের নিম্নলিখিত বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এবং চারিত্রিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক দুর্নীতি ও অনাচারের মর্মান্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন:

ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب
و لا فشا الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت و لا نقص قوم المكيال
و الميزان الا قطع عنهم الرزق و لا حكم قوم بغير حق الا
فشا فيهم الدم و لا خفر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو *

(رواه مالك)

—"কোন জাতির মধ্যে যখন আমানতে খিয়ানত করার (খুব ব্যাপক অর্থে) পাপ প্রসার লাভ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে ভীতি ও সাহসহীনতার সঞ্চার করেন, যখন সমাজে সাধারণ ভাবে ব্যভিচার প্রচলিত হয় তখন তাহাতে মৃত্যুর আধিক্য দেখা দেয়, পরিমাপ ও ওজনে কম

www.pathagar.com

দেওয়া এবং ঠকানো সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হইলে তাহাদের মধ্যে নিদারুণ অন্নাভাব দেখা দেয়, খোদার আইন পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়ভাবে শাসন-কার্য পরিচালনা করিলে সে জাতির মধ্যে অবাধ রক্তপাত হইতে থাকে এবং ওয়াদা ও চুক্তি ভংগ করিলে তাহাদের উপর শত্রুকে জয়ীও প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া হয়।"

ইসলাম সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর প্রেম, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা, সম্মান ও সম্প্রীতি স্থাপন করিতে চায়। এইজন্য রসূলে করীম (ছঃ) বলিয়াছেন: প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যাহার হাত বা মুখের দ্বারা অন্য মুসলমান কোনরূপ কষ্ট বা আঘাত পায় না। অন্যদিকে হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরকুৎসা-রটনা, কাহাকেও অপমানকর উপাধি দান, পরস্পরের প্রতি অমূলক সন্দেহ পোষণ করা প্রভৃতি যেসব সামান্য সামান্য কাজে পরস্পরের মধ্যে তিক্ততার বিষ বৃদ্ধি পায় তাহা সবই নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ) বলিয়াছেন:

ايّاكم و الظن فان الظن اكذب الحديث و لا تحسسوا
و لا تجسسوا و لا تناجسوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا
و كونوا عباد الله اخوانا * (بخارى)

—"অপরের প্রতি অমূলক ধারণা ও সন্দেহ হইতে দূরে থাক, কারণ ইহা অত্যন্ত মিথ্যা। শুধু শুধু কাহারও প্রতি কুধারণা পোষণ করিও না, পরের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইও না, পরস্পরে বিবাদ করিও না। হিংসা-দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা করিও না, কাহারও অসাক্ষাতে তাহাকে মন্দ বলিও না। বরং তোমরা সকলে খোদার খাঁটি বান্দাহ ও পরস্পর ভাই ভাই হইয়া বসবাস করিতে থাক।"

অন্য একটি হাদীসে বড়কে সম্মান করা এবং ছোটকে স্নেহ করাকে মিল্লাতে ইসলামীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا و يامر
بالمعروف و ينه عن المنكر - (ترمذى)

www.pathagar.com

—"যে আমাদের সমাজে বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ ও দয়া করে না, এবং ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ ও নিষেধ করে না, সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।"

এই নিয়ম অনুসারে মুসলমানদের পরস্পরের সাক্ষাৎকালে সালাম ও দোয়ার আদান-প্রদান করার রীতি চালু করা হইয়াছে; যেন লোকদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ভালবাসা, সদিচ্ছা ও সহানুভূতি জাগ্রত হয়।

কোর্‌আন শরীফে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে:

فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة - (النور)

—"অতএব তোমরা যখন কোন ঘরে প্রবেশ করিবে তখন পরস্পরের মধ্যে সালামের আদান প্রদান করিবে; ইহা খোদার নির্ধারিত দোয়া বিশেষ, ইহা খুবই মহান ও পবিত্র ব্যবস্থা।"

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা, ভালবাসা ও আত্মীয়তার ভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা পরস্পরের সাধারণ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সাময়িক ঋণ দেওয়া ও সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসপত্র দিয়া সাহায্য করার আদেশ করিয়াছেন। তাহা না করিলে তাহার প্রতি অভিশাপ দিয়াছেন। বলিয়াছেন: ইহারা এতদূর হীন ও সংকীর্ণমনা যে, নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ কাজ-কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস বা সরঞ্জামাদি দিয়া একে অপরের সাহায্য করিতেও প্রস্তুত নয় ويمنعون الماعون

পরিবার প্রথার উপরই ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এই পরিবারের বিভিন্ন সূত্রে সমাজের দূরবর্তী মানুষ নিকটবর্তী আত্মীয়ে পরিণত হয়। ফলে সমাজের প্রায় সকল মানুষই আত্মীয়তার বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে মানব-সমাজের ভিত্তিমূল অধিকতর মজবুত হয়। ইরশাদ হইয়াছে:

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة * (النحل)

www.pathagar.com

—"আল্লাহ তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের জন্য জুড়ি বানাইয়া দিয়াছেন (অর্থাৎ পুরুষের জন্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য পুরুষ)। তাহার পর তোমাদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনের ফলে পুত্র-পৌত্রের এক ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আরও বলা হইয়াছে :

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا - (الفرقان)

—"সেই মহান প্রতিভাশালী আল্লাহ্ পানি (শুক্র) হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টি ধারার সাহায্যে মানুষকে বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।"

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যে অংশকে মানুষের জন্য মংগলকর বলিয়া মনে করা হয় এবং যাহা লইয়া বর্তমান সভ্যতা গৌরবে উন্মত্ত প্রায়, ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় তাহা পুরাপুরি ভাবেই বর্তমান পাওয়া যায়। কিন্তু উহার ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অনাচার এবং খারাপ অংশগুলির কোনটারই ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নাই। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব নিরংকুশ ভাবে জনগণের অধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে এই দুনিয়াব্যাপী সমস্ত অশান্তির মূলীভূত কারণ। এই জন্যই ইসলামী সমাজে সমস্ত প্রভুত্ব একান্ত ভাবে সোপর্দ করা হয় খোদার হাতে। খোদার দেওয়া আইন-ই ইসলামী সমাজের বুনিয়াদী আইন, তাঁহার নির্ধারিত সীমা মানুষের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকারের একেবারে শেষ সীমান্ত। তাহা লংঘন করিয়া অগ্রসর হওয়ার এক বিন্দু অধিকার কাহারও নাই।

ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং উহার পূর্ণ বিকাশ লাভের জন্য আবশ্যক এমন একটি সমাজের, যেখানে মানুষের পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ-বৈষম্য নাই—সমস্ত মানুষই যেখানে সর্বোতভাবে সমান মর্যাদাসম্পন্ন। এই জন্যই ইসলামী সমাজে স্ত্রীলোকদিগকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহাদের জীবন-ব্যাপী কাজকর্মের জন্যও একটা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান দুনিয়ার বড় বড় রাজনীতিবিদ পণ্ডিত একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের মজলিসে শু'রা—পার্লামেন্ট—নির্বাচনের ব্যাপারে নারীদের ভোটাধিকার একটা স্বাভাবিক অধিকার। কিন্তু ইসলাম আজ হইতে সাড়ে

www.pathagar.com

তেরশত বৎসর পূর্বে যে স্বভাব-সম্মত ও গণ-অধিকার সম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাতে এই অধিকার পরিপূর্ণ রূপে স্বীকৃত ও রক্ষিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ সমাজের সাধারণ চরিত্র যত উচুঁদরের হয়, জমহুরী খিলাফত ঠিক ততদূরই উন্নত ও পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে। তাই সকল প্রকার আবিলতামুক্ত সত্যিকার স্বাধীন মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই দিন, যেদিন মানুষের উপর—মানব-জীবনের কোন একটি দিকেও—মানুষের প্রভুত্ব থাকিবে না, মানুষ মানুষের গোলাম হইবেনা; বরং সকল মানুষ সমান ভাবে মহান আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া এক খালেছ ইলাহী রাষ্ট্র কায়েম করিতে সমর্থ হইবে, যেখানে সকল মানুষই নিজের স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফূরণ ও জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধনের উপযোগী সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারিবে।

www.pathagar.com

ইসলামের অর্থ-ব্যবস্থা

ইসলাম মানুষের জন্য শুধু এক উন্নত ও আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাই উপস্থাপিত করে নাই, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করার জন্য এক নির্ভুল ও উজ্জ্বল অর্থ-ব্যবস্থাও পেশ করিয়াছে। বর্তমান দুনিয়ায় যে মারাত্মক সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের খোরাক, পোষাক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থান—মানুষের এই মৌলিক প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করার কোনই দায়িত্ব গ্রহণ করে না। এই জন্যই আজ সমাজের দুস্থ, অসহায়, পংগু, অক্ষম ও সর্বহারা ব্যক্তিগণ ধ্বংসের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং বাধ্য হইয়া কমিউনিষ্ট অর্থ-ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। কারণ কমিউনিষ্ট অর্থনীতি সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের উল্লেখিত প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করার বড় বড় গালভরা ওয়াদা করিয়া থাকে। পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্বের অধিকার সম্পূর্ণ অবাধ, সীমাহীন ও নিরংকুশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ও উপায়-উপাদান প্রয়োগ করার ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নাই। আর খরচ করার বেলায়ও পুঁজিবাদী সমাজ কোনরূপ বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে না। এই কারণেই জালেম পুঁজিবাদী সমাজ বড়ই অসমান—নানাবিধ অশান্তি ও বিপর্যয়ে জর্জরিত। তাহাতে এক শ্রেণীর লোক একচেটিয়া অধিকারে সমস্ত সম্ভাব্য উৎপাদন-উপায় প্রয়োগ করিয়া অন্য শ্রেণীর লোকদের বুকের তাজা উষ্ণ রক্ত নির্মমভাবে শোষণ করে। ইহারই কারণে এই ধরনের সমাজ-ব্যবস্থায় জাগিয়া উঠে সর্বধ্বংসী শ্রেণী-সংগ্রাম। বস্তুতঃ শ্রেণী-সংগ্রাম পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; ইহা একটা সাধারণ ব্যাপার। ইহারই ফলে কমিউনিষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হইয়া থাকে, যাহার দরুন মানবতার উপর নামিয়া আসে নির্মম নিষ্পেষণমূলক নিরংকুশ শাসন-ব্যবস্থার মর্মান্তিক অভিশাপ।

www.pathagar.com

কিন্তু ইসলাম এমন এক অর্থব্যবস্থা উপস্থাপিত করিয়াছে, যাহা কমিউনিষ্ট এবং পুঁজিবাদী উভয় প্রকারের অর্থব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। ইসলাম "পুঁজি" কে অস্বীকার করে নাই, অস্বীকার করিয়াছে পুঁজিবাদকে। তেমনি ইসলাম মানবতার সাম্যকে—তথা মানুষের সর্ববিষয়ের সমান অধিকারকে পুরাপুরি স্বীকৃতি দিয়াছে; কিন্তু নিছক উদরের ভিত্তিতে কোন অস্বাভাবিক-অবাস্তব, উগ্র সাম্যবাদ এবং সাম্যের দোহাই দিয়া ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার হরণ করার মতবাদ (কমিউনিজম) মাত্রই স্বীকার করে নাই। পুঁজিবাদ পুঁজিকে এতদূর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়াছে যে, উহাই হইয়াছে তাহার "খোদা"—তাহার একমাত্র প্রভু। উহাকে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার পরিবর্তে ব্যবহার করে যাবতীয় শোষণ পীড়ণ এবং আরও অর্থোপার্জনের মারাত্মক উপায় উদ্ভাবনের কাজে। তদ্রূপ, মানুষের উদর-সাম্যের দোহাই দিয়া কমিউনিজম সেই মানবতার উপরই চালাইয়াছে অমানুষিক বর্বরতার ষ্টিম রোলার। আর "সাম্যবাদ"কে ভিত্তি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অসাম্যের রাষ্ট্র। ইহা সবই আগাগোড়া একটি প্রবঞ্চনার অভিযান, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইসলাম এই উভয় প্রকারের অর্থ-ব্যবস্থার ঠিক মাঝখান (الاقتصاد) দিয়া চলিয়াছে। উভয় অর্থ-ব্যবস্থায় যে শোষণ পীড়ন ও জুলুম না-ইন্‌ছাফীর অবকাশ আছে, তাহাতে এক শ্রেণীর মানুষের যে চিরন্তন দুঃখ-মুছীবত-নির্যাতন নিপীড়ন ও নির্বাসন এবং অনাহারে অর্ধাহারে থাকার নির্মম জ্বালা ভুগিতে হয়, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় এই সবের কোনই সম্ভাবনা বা অবকাশ নাই। ইসলাম উহার সমাজে একপ্রকার আর্থিক সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর বটে; কিন্তু অর্থের পরিমাণ-সাম্য ইসলামী আদর্শের মোটেই অনুকূল নহে।

মনুষ্যজাতির সবচেয়ে দুঃখজনক এবং পীড়াদায়ক বিষয় হইতেছে তাহার রেজেক—তাহার জীবিকা সমস্যা। দুনিয়ার বুকে ইসলামের সুবিচার-পূর্ণ অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম না থাকার দরুন শক্তিমান মানুষেরাই সর্বপ্রকার উৎপাদন-উপায় ও জীবিকা-উৎসের উপর নিরংকুশ অধিকার স্থাপিত করে এবং অভাব-ক্লিষ্ট ও অধীন মানুষের দ্বারা তাহারা অমানুষিক ও নিকৃষ্টতম গোলামীর কাজ করাইয়া থাকে। ঠিক এই কারণেই মানব-সমাজে জুলুম, শোষণ-পীড়ন ও স্বৈরাচার চিরন্তন চলিয়া আসিতেছে। অথচ কোন মানুষই মনের ইচ্ছা বা আনন্দ-উৎসাহে অন্যের গোলামী করিতে প্রস্তুত হয় না। মানুষের গোলামী

www.pathagar.com

করা মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু দুর্বল, শক্তিহীন, দরিদ্র, লাঞ্ছিত ও দুঃখ-জর্জরিত মানুষ ইহা সবই করিতে বাধ্য হয়—যখন তাহাকে বলা হয় যে, ইহা না করিলে তোমার জীবিকা বন্ধ হইয়া যাইবে। ক্ষুধার জ্বালা বড় তীব্র ও দুঃসহ জ্বালা। উহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ সব রকমের শর্তই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এহেন নির্মম পরিস্থিতির মধ্য হইতেই জুলুম ও স্বৈরাচারের উৎপত্তি এবং এই ধরনের অবস্থার উপরই দাঁড়াইয়া থাকে পুঁজিবাদ, সামন্ততন্ত্র ও প্রতারণামূলক সাম্যবাদ।

কাজেই দুনিয়া হইতে জুলুম, শোষণ-পীড়ন ও সর্বপ্রকার স্বৈরাচারী নীতি চিরতরে দূরীভূত করিতে এবং দুর্বল ও অভাব-লাঞ্ছিত মনুষ্য জাতিকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উচ্চস্তরে উন্নীত করিতে হইলে সর্বপ্রথম "মানুষের হাতে মানুষের রেজেক" এই ভ্রান্তধারণা মানুষের হৃদয়-মন হইতে দূরীভূত করিতে হইবে এবং তাহাদের সম্মুখে এই নিগূঢ়তত্ত্ব উদঘাটিত করিয়া ধরিতে হইবে যে, জীবিকার উৎস খোদার সমগ্র সৃষ্টির জন্যই সমান ভাবে উন্মুক্ত। প্রত্যেকটি প্রাণীই তাহা হইতে নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ ও উপার্জন করিতে পারে। অতএব কোন মানুষেরই অন্য মানুষের সম্মুখে নত হইবার এবং ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করিবার আবশ্যকতা নাই। একজন মানুষ নিছক 'রুটি' বা 'ভাতে'র জন্য অপর একজনের গোলামী করিবে—ইহা মানবতার পক্ষে চরমতম লাঞ্ছনা, সন্দেহ নাই।

দুনিয়ার খোদাহীন মতবাদগুলি ধন সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে মানুষের মনে একটি বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। তাহারা মনে করে: আমরাই জীবিকার একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী; আমাদের হাতেই সকলের জীবিকা সীমাবদ্ধ। এই জন্য ইসলাম অধিকতর স্পষ্ট ও পৌনপুনিকতার সহিত এই ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করিয়াছে এবং মানব-মনে এই সত্য ও সঠিক ধারণা স্থায়ী করিয়া দিয়াছে যে, জীবিকা ও অন্নরুটি কোন মানুষের হাতে নয়, ইহা কেবল মাত্র খোদাতায়ালার ইখ্তিয়ারভুক্ত। দেশে তাঁহার বিধান অনুযায়ী অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করিলে কোন জীবেরই জীবিকার অভাব হইতে পারে না।

و الله يرزق من يشاء بغير حساب - (البقرة)

—"আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হয়, প্রচুর রেজেক দান করিয়া থাকেন।" কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে 'রেজেক' ব্যক্তি-বিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের হাতে কুক্ষিগত হইয়া থাকিতে পারে না। বরং প্রত্যেক উপার্জনকারী মেহনতী

www.pathagar.com

ব্যক্তির জন্যই জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। কেননা আল্লাহ নিজেই তাহা সকলের জন্য উন্মুক্ত ও অবাধ করিয়া রাখিয়াছেন। কোরআন বলে:

و جعل فيها رواسى من فوقها و بارك فيها و قدر فيها اقواتها

فى اربعة ايام سواء للسائلين - (حم السجدة)

—"আল্লাহ তায়ালা জমীনের উপর পাহাড়গুলিকে সুউচ্চ-সুদৃঢ় করিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে বহু উপকারী জিনিস রাখিয়া দিয়াছেন। তাহাতে চারি মৌসুমে (উপার্জনের জন্যে) খাদ্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন যাহা প্রত্যেক প্রয়োজনশীল প্রাণীর জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত।"

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا

من رزقه - (الملك)

—"সেই আল্লাহ, তিনি জমীনকে তোমাদের (জীবিকা উপার্জনের জন্য) অধীন, অনুকূল ও বিনয়ী-নম্র-মসৃণ করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা উহার ক্ষেত্রসমূহে শ্রম-সাধনা করিয়া (জীবিকা উপার্জন কর) এবং খোদার দেওয়া জীবিকা ভোগ কর।"

এই আয়াত দুইটি হইতে পরিষ্কার প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করার অধিকার সর্ব সাধারণ প্রাণী ও মানুষের জন্যই সর্বোতভাবে সমান। খোদার নির্দিষ্ট পথে (হালাল উপায়ে) যে যত পারো উপার্জন কর এবং তাঁহার নির্ধারিত ক্ষেত্র হইতে তাহা সন্ধান কর ও খোদার নিয়মে তাহা ভোগ ও ব্যবহার কর। অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সকল মানুষই যে একেবারে সমান পরিমাণ উপার্জন করিতে পারিবে, এমন কোন কথাই হইতে পারেনা। কারণ, মানুষের বুদ্ধি, প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও কর্ম-কৌশল স্বভাবতই সমান নহে। কাজেই উপার্জন-ক্ষমতাও সকলের সমান হইবেনা। তাই কাহারও ধন বেশী আর কাহারও কম হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়—অন্যায়ও নয়। এই কথাই আল্লাহতায়ালা স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন নিম্নলিখিত আয়াতে:

www.pathagar.com

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا و رفعنا بعضهم
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا - (الزخرف)

—"দুনিয়ার জীবনে মানুষের রুজি আমিই তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছি এবং আমিই (রুজির ব্যাপারে) কাহারও অপেক্ষা কাহাকেও বেশী দান করিয়াছি—যেন পরস্পর পরস্পরের দ্বারা কাজ করাইতে পারে।" বস্তুতঃ এই পার্থক্যই মানব-সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের মূল কারণ। ইহা না হইলে মানুষের সমাজ-সংস্থার দানা বাঁধিয়া ওঠা এবং তাহার পক্ষে সমাজবদ্ধ-জীবন যাপন করা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, রুজীর কম-বেশী হওয়ার কারণেই খোদার নিকট (এই দুনিয়ার সমাজেও) মানুষের সম্মান ও অধিকার কম-বেশী হয় না—খোদার নিকট শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড ইহা নয়।

মোট কথা ইসলাম সর্বসাধারণ মানুষকে জীবিকা উপার্জনের স্বাধীনতা দিয়াছে। অর্থাৎ উপার্জনের জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে পারে, শ্রম ও উপার্জনের অধিকার সকল মানুষেরই পক্ষে সম্পূর্ণ সমান। কিন্তু এই স্বাধীনতাটুকুও সম্পূর্ণ নিরংকুশ, বল্গাহারা ও বাধা-বন্ধনহীন নয়। বরং ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা যাবতীয় উপার্জন উপায়ের উপর রীতিমত 'কণ্ট্রোল' কায়েম করিয়াছে। অর্থোপার্জনের এমন অনেক উপায় আছে, যাহা পুঁজি-বাদী নীতিতে সংগত, কিন্তু ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার দৃষ্টিতে তাহার প্রয়োগ মোটেই সংগত নহে। যে সব কাজে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়, নৈতিক অধঃপতন ঘটে, অর্থোপার্জনের এইসব উপায়কে ইসলাম নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। যেসব শরীকদারী ব্যবসায়ে একজনের লাভ আর অপরজনের লোকসানের সম্ভাবনা বর্তমান, অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য সমাজের নৈতিক ক্ষতি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান, ইসলাম সেই সমস্ত কাজ ও উপায়কে চিরতরে হারাম করিয়া দিয়াছে। ইসলাম অর্থোপার্জনের কেবল সেইসব উপায় ও পন্থাকেই জায়েজ ঘোষণা করিয়াছে, যাহা সমাজের লোক-দের পরস্পরের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ইসলাম স্বাধীনভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জনের অনুমতি দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও নিরংকুশ ও স্বেচ্ছাচার মূলক নহে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা, বিশ্বস্ততা ও সাধুতা রক্ষা করিবার জন্য ইসলাম স্পষ্ট

www.pathagar.com

নির্দেশ দিয়াছে এবং ক্রেতাকে ওজনে কম দিতে, পরের মাল বেশী ওজন করিয়া লইতে, বাজার মূল্য অপেক্ষা ঠকাইয়া বেশী দাম আদায় করিতে এবং ভাল জিনিসের সহিত খারাপ মাল মিশাইয়া কিংবা পণ্যের ত্রুটি গোপন করিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করিতে ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়া দিয়াছে। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

و لا تنقصوا المكيال و الميزان - (هود)

—("দাড়িপাল্লার) ওজনে (বাটখারার কিংবা অন্য কোন প্রকার) মাপে বিন্দুমাত্র কম করিও না।"

এই জন্যই আদেশ করা হইয়াছে ঃ

و اوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لا تبخسوا الناس اشيائهم - (هود)

—"ওজন এবং মাপ সুবিচারের সহিত পূর্ণ করিও এবং মানুষের (নিকট বিক্রিত) জিনিসের কোনরূপ ক্ষতি করিওনা।"

এইরূপে বিভিন্ন সদুপায়ে উপার্জিত ধন-সম্পদের ব্যয় ও ভোগ করার উপরও ইসলামে স্পষ্ট বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। যে সব খরচের দ্বারা মানুষ অন্য মানুষকে নিজেদের শান-শওকত, বাহাদুরী ও বড়-মানুষীর জাঁকজমক দেখাইয়া থাকে, যে-সবের দ্বারা অন্য মানুষের উপর নিজেদের আভিজাত্য ও প্রভুত্ব কায়েম করার চেষ্টা করা হয়, ইসলামে এই ধরনের খরচও নিষিদ্ধ। এমন কি ইসলামী সমাজের কোন লোক একটি নির্দিষ্ট মাপ অপেক্ষা অধিক উঁচু কোন প্রাসাদও নির্মাণ করিতে পারে না। ইসলামের অর্থনৈতিক আদর্শে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত শ্রমের ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—একথা ঠিক, কিন্তু সেই সমস্ত অর্থ-সম্পদ কেবল নিজের বিলাসিতা-বহ্নির ইন্ধন জোগাইবার কাজে ব্যয়িত হইবে, ইসলাম তাহা আদৌ বরদাশ্‌ত করিতে পারে না।

ইসলাম মুসলমানদিগকে যেমন নামাজ পড়িতে আদেশ করিয়াছে তেমনি অর্থ সম্পদ সম্পর্কেও একমাত্র আল্লাহতায়ালার বিধান অনুযায়ী ব্যয়-ব্যবহার করিতে এবং তাহা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন না করিতে তীব্র ভাষায় আদেশ করিয়াছে। এই জন্যই ইসলামের সর্বাত্মক ব্যবস্থাকে যাহারা গ্রহণ

www.pathagar.com

করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা ইসলামের এই বিপুল ব্যাপকতা ও সর্বগ্রাসী রূপ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছে :

اصلوتك تامرك ان نترك ما يعبد اباءنا او ان نفعل
في اموالنا ما نشاء - (هود)

—"আমাদের পূর্বপুরুষরা যাহাদের পূজা-উপাসনা করিত কিংবা আমাদের ধন-সম্পত্তি লইয়া আমরা যাহা-ইচ্ছা করিতাম—হে নবী! তোমার নামাজ কি আমাদিগকে সেইসব পরিত্যাগ করিতে বলে" ?

অর্থাৎ নামাজ পড়িলে সর্বপ্রকার শির্‌ক এবং শোষণ-পীড়ন ও ধন-সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যয়-ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যথায় অন্তঃসার-শূন্য রুকু'-সিজদার কোনই মূল্য ইসলামে নাই।

ইসলাম মানুষের জীবন যাপনের "মান" অবশ্যই উন্নত করিতে চায়—মানুষের সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী জীবন ইসলামের কাম্য। কিন্তু তাহা কোন শ্রেণী-বিশেষ বা দল-বিশেষের জন্য নহে, বরং সাধারণভাবে সমগ্র মানুষের জন্যই ইসলাম একটি নিশ্চিত জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই জন্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক ধনশালী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতি বৎসরান্তে একটি নির্দিষ্ট হারে 'জাকাত' আদায় করার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'জাকাত' ইসলামী জীবন-বিধানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ, ইহা যথারীতি আদায় না করিলে কোন মানুষই 'মুসলিম' হইতে পারেনা। এই 'জাকাতের' সাহায্যেই ইসলামী সমাজের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদকে বিস্তারিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় যাহারা ব্যর্থ হয়, যাহারা তাহাতে যোগ দিয়াও প্রয়োজনানুরূপ উপার্জন করিতে সমর্থ হয়না অথবা যাহাদের কিছুই নাই, এই 'জাকাত' সেই শ্রেণীর সমস্ত লোকের অভাব মিটায়, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি সংগ্রহ করে এবং আকস্মিক বিপদকালে ইহা তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধু হইয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ ইসলামসম্মত পন্থায় ইহা সংগ্রহ ও বণ্টন করা হইলে একটি মানুষেরও অভাব থাকিতে পারে না। এই বিপুল প্রাচুর্যের পৃথিবীতে বঞ্চিত ও নিঃস্ব হইয়া থাকিতেও কেহ বাধ্য হইবে না। ধনীকদের নিকট হইতে রীতিমত জাকাত আদায় করার পরও যদি তাহা দ্বারা অভাবী লোকদের অভাব মোচন সম্ভব না

www.pathagar.com

হয় এবং অপরদিকে ধনিকদের নিকট (জাকাত আদায় করার পরও) প্রচুর অর্থ-সম্পদ ক্রমাগত সঞ্চিত হইতে থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র তাহাদের নিকট হইতে গরীবদের সাহায্যের জন্য আরও অধিক অর্থ আদায় করিতে পারিবে। কারণ জাকাত ও ছাদকা আদায়ের পরও তাহাদের সম্পদে গরীবদের 'হক্' রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালার ঘোষণা:

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم - (الذريات)

—"ধনীদের ধন-সম্পত্তিতে প্রার্থী, সব অভাবী ও বঞ্চিতদের জন্য "হক্" রহিয়াছে।" এই "হক্" জাকাত ও ছাদকা আদায়ের পরে বর্তিবে।

ইহার প্রতিকূলে সুদ প্রথা—টাকা দিয়া টাকা উপার্জন করা —ইসলামী সমাজে একটি অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক শোষণমাত্র—ইসলামে এই অপরাধের কোন ক্ষমা নাই। কারণ ইহাই ব্যক্তি মানুষ ও এক-একটি সমাজকে সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। ইহা লক্ষ হাতের অর্থকে একটি হাতে পুঞ্জীভূত করিবার এক মারাত্মক কৌশল। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে ইহার মাত্রই প্রবেশাধিকার নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন:

احل الله البيع وحرم الربوا - (البقرة)

—"অর্থোপার্জনের জন্য ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যকে আল্লাহ-তায়ালা একটি উত্তম বৈধপন্থারূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন, কিন্তু সূদকে চিরতরে হারাম করিয়াছেন।"

ইসলাম মানুষের ব্যবহারের অধিকার হিসাবে ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব স্বীকার করে। কোরআন শরীফে পরিষ্কার ভাষায় উক্ত হইয়াছে:

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده - (الاعراف)

"দুনিয়ার প্রকৃত মালিক আল্লাহতায়ালা। তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁহার বান্দাহদিগকে পৃথিবীর বেরাসত্ বা ভোগ-ব্যবহারের অধিকার স্বরূপ (মালিকানা) দান করেন।"

অপর আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন:

www.pathagar.com

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء

"বল হে আমাদের আল্লাহ! সবকিছুর নিরংকুশ মালিকানার অধিকারী একমাত্র তুমিই। তবে তুমি যাহাকে চাও এই মালিকানা দান কর।"

অর্থাৎ সবকিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহতায়ালা। তাঁহার এই মালিকানা নৈসর্গিক এক বিশ্বসত্য। কিন্তু তিনি নিজেই মানুষকে এই মালিকানার অধিকার দান করিয়া থাকেন। তখন মানুষও মালিক হইতে পারে। যদিও মানুষের মালিকানার অর্থ : ব্যয়-ব্যবহার ও ভোগ-দখলের অধিকার মাত্র। ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানার এই যে সুবিধাটুকু আছে, তাহা সীমাহীন ও বল্গাহারা নয়। ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগে যাহারা সমাজ-দেহের সবটুকু রক্ত শুষিয়া লয়, আর অপব্যয় ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অন্যায় পথে টাকা উড়ায়, কোরআন শরীফে তাহাদিগকে "নির্বোধ ও নীচ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং ইসলামী হুকুমাতকে তাহার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক্ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্র সেই সম্পত্তি নিজের কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাধীন রাখিবে, উহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং মালিককে উহা হইতে সাধারণ প্রয়োজন পরিমাণে বৃত্তি দিবে। শুধু ইহাই নয়, তাহাকে ইসলামী চরিত্র, অর্থ-সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার-নীতি ও ক্ষেত্রে এবং মানব-জীবনে উহার গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দেওয়াও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। তাহাতে কোন ফল লাভ না হইলে এবং তাহার আচরণে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত না হইলে তাহার মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। কোরআন শরীফের বাণী এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট :

و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قيا ما

و ارزقو هم فيها و اكسو هم و قولوا لهم قو لا معروفا - (النساء)

—"তোমাদের অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবনের স্থিতিস্থাপক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা নির্বোধ ও নীচাশয় ব্যক্তিদের হস্তে ছাড়িয়া দিওনা। অবশ্য তাহা হইতে তাহাদের খাওয়া-পরা প্রভৃতি বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান কর।"

www.pathagar.com

এই আয়াতে একটি ব্যাপক ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে।* অর্থ সম্পদ জীবিকা এবং জীবনের নির্ভর। তাই অজ্ঞলোকদের কর্তৃত্বে তাহা কখনও ছাড়িয়া দেওয়া জায়েজ নহে। কারণ তাহারা ভুল ও অন্যায় পথে উহা খরচ করিয়া সমাজ, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সর্বশেষে জাতীয় নৈতিকতাকে ধ্বংস করে। ইসলাম মানুষকে যে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার দান করিয়াছে তাহার অর্থ এই নয় যে, কেহ এই অধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ না হইলে—বরং তাহার দ্বারা সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিলে তবুও তাহার এই মালিকানা অধিকার হরণ করা যাইবেনা। মানুষের জীবিকা তো অপরিহার্য, তাহা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন পরিমাণে সরবরাহ করিতে হইবে। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকারের স্বাধীন ও নিরংকুশ প্রয়োগের অবকাশ নাই, তাহার উপর যথেষ্ট বিধি-নিষেধ আরোপিত হইয়াছে—যেন উহার প্রয়োগে নৈতিক-চরিত্র, তামাদ্দুন এবং সামগ্রিক অর্থব্যবস্থায় কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টি হইতে না পারে। তাই ছোট খাটো ভাবে প্রত্যেক অর্থশালী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সে যাহাকে ধন-সম্পত্তি দান করিতেছে, উহার ব্যবহার-ক্ষমতা তাহার আছে কিনা। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঠিক প্রয়োগ করিবার যোগ্য নয় এবং যাহারা নিজেদের সম্পদ ও সম্পত্তি অন্যায় পথে খরচ করে ইসলামী হুকুমাত তাহাদের মালিকানা-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ভার নিজেই গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

এ সম্পর্কে সর্বশেষ কথা এই যে, বিরাট বিরাট সম্পত্তি আর কোটি কোটি টাকার বিত্ত—যাহা এক ব্যক্তির উপার্জনে সঞ্চিত ও বিপুল পরিমানে স্তূপীকৃত হয়, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মীরাসী আইন অনুসারে তাহা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এই উপায়েই সম্পদ ও সম্পত্তির দ্রুতবিস্তার ও সুনিয়মিত আবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পত্তি ও সম্পদের একত্র সমাবেশ (Acumlation of welth) মাত্রই সম্ভব নয়। কোরআন শরীফ পরিষ্কার বলিয়াছে :

---

* এই আয়াত হইতে ইসলামে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা-অধিকারের সূত্রে ভোগ-ব্যবহারের সুযোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। যাহারা সমাজতন্ত্রবাদে প্রভাবান্বিত হইয়া সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অস্বীকার করেন কোরআনী আয়াতের মনগড়া অর্থ করিয়া এবং উহার ভিত্তি কোরআনেরই উপর স্থাপিত করিয়া, তাঁহারা ইসলামের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাঁহারা এই আয়াতটি সম্পর্কে একটু গভীর দৃষ্টিতে ও খাঁটি মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেই নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিবেন। —(লেখক)

www.pathagar.com

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ - (الحشر)

"অর্থ-সম্পদ যেন তোমাদের মধ্য হইতে কেবল ধনী লোকদেরই কুক্ষিগত হইয়া না থাকে।"

কিন্তু দুনিয়ার মানব-রচিত অন্যায় ও ভারসাম্যহীন অর্থ-ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, অর্থ-সম্পদকে একত্রীকরণ ও এক-কেন্দ্রিক করিয়া বিক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত হওয়ার হাত হইতে উহাকে অধিককাল বাঁচাইয়া রাখা এবং এক অজগরের অন্তর্ধানের পর অপর এক অজগরকে উহার পাহারাদার নিযুক্ত করিয়া দেওয়াই সে সবের একমাত্র লক্ষ্য। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকার দান করার নীতি ইহারই একটি ছোট্ট শাখা মাত্র। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইহাই সার কথা। কমিউনিষ্ট অর্থ-ব্যবস্থা বিভিন্ন হাত হইতে সম্পত্তি ও সম্পদ একত্রীকরণের যাবতীয় উপায় কাড়িয়া লইয়া সমগ্র রাষ্ট্র-শক্তিকে এই কাজে নিয়োজিত করে। সেখানে অসংখ্য পুঁজিদারকে ধ্বংস করিয়া একটি মাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজিদার সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ইসলাম ইহার কোন পন্থাকেও সংগত মনে করে না। ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির হাতেও যেমন অর্থ-সম্পদ একত্রিত ও পুঞ্জিভূত হইতে এবং অকর্মণ্য হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারেও উহার তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকা সম্ভব হয় না। ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় বিপুল অর্থ সম্পদের উপর কাহারও সাপ হইয়া বসিবার সুযোগ নাই—না ব্যক্তি বিশেষের আর না কোন রাষ্ট্র সরকারের। এই অর্থ-ব্যবস্থা কোন দেশে বাস্তবায়িত হইলে সে দেশের বিরাট জমিদারী কোটি কোটি কৃষক মজুরদের বুকের উপর জগদ্দল পাথর হইয়া বসিতে পারেনা। আর তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য কোন বিশেষ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের কোন বিল (?) উথাপন করা, তাহা লইয়া ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক করা এবং সর্বশেষে গরীবের কোটি কোটি টাকা জমিদারদের পকেটে খেসারত দিয়া জমিদারী ক্রয়ের প্রহসন করা কিংবা তাহা লইয়া আন্দোলন, ধর্মঘট ও রক্ত বিপ্লবের সৃষ্টি করার কোনই আবশ্যক হয় না। ইসলামী অর্থনীতি কার্যকর হইলে অতি স্বাভাবিক-ভাবে আপনা আপনিই—কোন আন্দোলন ও রক্তারক্তি ব্যতিরেকেই—তাহা ভাংগিয়া চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া যায় এবং ব্যক্তির বহু পরিশ্রম সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি নিমেষে অসংখ্য হাতে বিভক্ত ও বিস্তারিত হইয়া পড়ে।

ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের খাওয়া-পরা-থাকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—এই প্রাথমিক ও বুনিয়াদী প্রয়োজনগুলির

www.pathagar.com

পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। ইসলামী হুকুমাতে কেহ অভুক্ত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে না। প্রত্যেকের জন্যই বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সুবিচার সমান ভাবে সকল মানুষের জন্যই বিনামূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং তাহাতে কাহারও "হক্" কাড়িয়া লওয়া হয় না, কাহাকেও তাহার পাওনা হইতে বঞ্চিতও করা হয় না।

و لقد مكنا كم فى الا رض و جعلنا لكم فيها معا يش - قليلا ما تشكر و ن - (الاعراف)

—"আমরা তোমাদিগকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং এইখানেই তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর করিয়া থাক।" *

* ইসলামের অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে পাঠ করুন মৎপ্রণীত "ইসলামের অর্থনীতি"।

www.pathagar.com

ইসলামের বিচার-ব্যবস্থা

বিচার ও ইনছাফ প্রত্যেকটি মানুষের অতি স্বাভাবিক অধিকারের বস্তু। পানি, আলো ও বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রত্যেকটি মানুষই পাইতে পারে—এ অধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না, তেমনি সুবিচারও প্রত্যেকটি মানুষেরই সমান ভাবে প্রাপ্য। এই ব্যাপারে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, জমিদার-কৃষক, পুঁজিদার ও মজুর, কালো ও গোরা—এমন কি কাফের ও মুসলমানেও কোনরূপ পার্থক্য করা চলেনা। ইহাই বিশ্ব প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যশীল ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং ইহাই ইসলামের চিরন্তণী ব্যবস্থা।

কিন্তু দুনিয়ার গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম প্রভৃতি অস্বাভাবিক শাসন ব্যবস্থার অধীন ততোধিক অস্বাভাবিক ভাবেই মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয়। এমন কি, বিচার ইনছাফও সেখানে সকল মানুষের পক্ষে সুলভ নয়। আমেরিকার পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার কমিউনিষ্ট গভর্ণমেন্ট এবং ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী সমাজতন্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক সরকারের অধীন মানুষের এই অবাঞ্ছিত ও অমানুষিক বৈষম্য আজ তীব্রভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইসলাম উহার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় আইন-শাসন ও বিচার ইনছাফের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে মানুষের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করিতে মাত্রই রাজী নয়। উহার ইনছাফ নিরপেক্ষ, নির্বিকার ও সর্বজনে প্রযোজ্য।

এ সম্পর্কে কোরআন শরীফ অধিকতর স্পষ্টভাষী। তাহাতে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে:

www.pathagar.com

و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به - (النساء)

—"মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে তোমরা ফয়ছালা করিবে, তখন তোমরা পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনছাফের সহিত ফয়ছালা করিও। আল্লাহ তোমাদিগকে অতীব ভাল কাজের উপদেশ দিতেছেন।"

উপরন্তু নবীর প্রতি কোরআন শরীফ নাজিল হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে তাহা দ্বারা মানুষের মধ্যে সুবিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা। এই আয়াত আমি পূর্বেও একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি :

و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط - (الحديد)

—"নবীদের নিকট আমরা কিতাব এবং নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য "মানদণ্ড" নাজিল করিয়াছি—যেন মানুষ এই সবের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সুবিচার ও ইনছাফ কায়েম করে।"

অন্য কথায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রত্যেক হক্‌দারই নিজ নিজ পাওনা যাহাতে যথাযথভাবে পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা ইসলামী হুকুমাতের মস্তবড় দায়িত্ব।

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها -

"—আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক পাওনাদারের নিকট তাহার পাওনা যাহা তোমাদের নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে—যথাযথভাবে পৌঁছাইয়া দিতে তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন।"

পাওনাদারের পাওনা আদায় করিতে এবং অপরাধীকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করিতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এমন কি, নিরপেক্ষ বিচার যদি কোন নিকটাত্মীয় কিংবা স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধেও হইয়া পড়ে, তবুও তাহা যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করিতে কোনরূপ ইতস্ততঃ বা সংকোচ করা যাইতে পারেনা। এই ব্যাপারে বিচারক যদি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ও কুণ্ঠা, কিংবা লজ্জা-সংকোচের প্রশ্রয় দেয়, তবে তাহার স্থান বিচারকের

www.pathagar.com

"সিংহাসনে" নয়, তাহার স্থান প্রথমে আসামীর কাঠগড়ায় এবং পরে কারাগারের অন্ধকারাচ্ছন্ন কালোকুঠরীর অভ্যন্তরে।

يا يها الذين امنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو
على انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا
فالله اولى بهما - فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلوا او
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا - (النساء)

—"হে ঈমানদারগণ, ইনছাফের উপর মজবুত হইয়া দাঁড়াইয়া থাক—আল্লাহতায়ালার জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হও।—সেই সত্যের সাক্ষ্য যদি তোমাদের নিজেদের, পিতামাতার কিংবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়;—সে ধনী-ই হউক, আর গরীব-ই হউক(সত্যের স্বাক্ষ্য দিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হইও না।) তাহাদের প্রতি আল্লাহ তোমার অপেক্ষা অধিক সহনুভূতিশীল। কাজেই তোমরা দুষ্প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া ইন্‌ছাফ ও ন্যায়-বিচার পরিত্যাগ করিওনা। কিন্তু তবুও তোমরা যদি সত্যের বিপরীত সাক্ষ্য দাও কিংবা সত্য প্রচারের দায়িত্ব পালনে অবহেলা কর; তবে (জানিয়া রাখিও যে,) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত আছেন।"

নিরপেক্ষ সুবিচার ও ইন্‌সাফ করার জন্য ইসলামের ইহাই চরম ও অমোঘ নির্দেশ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ) নিজের জীবনেই খোদার এই নির্দেশের বাস্তব কর্মরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। মদীনার এক উচ্চ ধনী ও অভিজাত বংশের একটি মেয়েলোক চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছিল। হযরতের দরবারে এই মোকদ্দমা দায়ের হইলে হযরত উসামা ইব্‌নে জায়দ আসামীর পক্ষে সুফারিশ করিতে লাগিলেন। নবী মোস্তফা (ছঃ) তাঁহার উত্তরে জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন:

اتشفع في حد من حدود الله؟ ... انما اهلك الذين قبلكم
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم

www.pathagar.com

الضعيف اقاموا عليه الحد : — وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها - (بخارى ، مسلم)

—"খোদার অনুশাসন কার্যকর করার ব্যাপারে সুফারিশ কর? পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যখন তাহাদের অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি (কিংবা অনুরূপ কোন অপরাধ) করিত, তখন তাহারা তাহাকে রেহাই দিত; কিন্তু কোন দুর্বল বা ছোট বংশের লোক যদি চুরি কিংবা কোন অপরাধ করিত তখন তাহার উপর জগদ্দল শাসন-ভার চাপাইয়া দিত। (তোমরা খোদাকে ভয় কর এবং সব সময় নিরপেক্ষ ইন্সাফ করিও।) খোদার শপথ, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে—জানিয়া রাখিও—কোরআনের বিচার-ব্যবস্থা অনুসারে তাহারও হাত কাটিয়া দেওয়া হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ ইসলামী ফৌজদারী আইনের দৃষ্টিতে বড়-ছোট, গরীব-ধনী, শাসক-প্রজা, উচচ-নীচ এবং আপন-পরের মধ্যে কোন পার্থক্য বা তারতম্য নাই। হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ) নিজেকে পর্যন্ত বিচার ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পেশ করিতেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূকের (রাঃ) পুত্র আবুশাহ্মাও এই আইনের বিচারে মদ্য পানের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া খলীফার নিজের নির্দেশক্রমে দণ্ডিত হইয়াছিল এবং তাহাতেই সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার খিলাফতকালে বড় বড় প্রবল পরাক্রান্ত শাসনকর্তাদের অপরাধেরও প্রকাশ্য দণ্ড দান করা হইত। ইসলামের সাম্যনীতি এবং সর্বসাধারণের সুবিচার প্রণালীর কী অনুপম ব্যবস্থা!

কিন্তু ইহার প্রতিকূলে, বর্তমানকালের বড় বড় রাষ্ট্রকর্তাগণ—যাহারা গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের গালভরা বুলি আওড়াইয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভের মিথ্যা প্রয়াস পায়, তাহারা নিজদিগকে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসনের ঊর্ধে এবং আদালতের (Jurisdiction) এখতিয়ার-বহির্ভূত বলিয়া মনে করে। এমন কি, নিজেদের প্রভুত্বের বলে নিজেদের হাতের ক্রীড়নক পার্লামেণ্ট কর্তৃক "স্পেশাল পাওয়ার আইন" পাশ করাইয়া লয়। সেই আইন তাহাদিগকে জনগণের নাগালের অনেক ঊর্ধে তুলিয়া ধরে। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা, তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করিবার অধিকারও কাহাকেও দেওয়া হয় না। ইহারই অনিবার্য ফলে এইসব বড় বড় "খোদা"-দের দেখাদেখি সমাজের সাধারণ পর্যায়ে আরও অসংখ্য "ছোট

www.pathagar.com

খোদা''-ও মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। তাহারাও নিজদিগকে জনগণের উর্ধে স্থাপন করিয়া জনগণের উপর দুর্বিসহ জুলুম ও নির্মম পীড়ন চালাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার এক আদালতে দুইজন আসামীকে বিচারার্থ হাজির করা হয়। তন্মধ্যে একজন কৃষ্ণাংগ, অপরজন শ্বেতাংগ। কৃষ্ণাংগ আসামীটি একজন শ্বেতাংগ মহিলাকে ধর্ষণ করিয়াছিল, বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হয়। আর শ্বেতাংগ আসামীটি একজন কালো আদমীকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছিল, বিচারে তাহার ২০ পাউণ্ড জরিমানা হয় এবং তাহা মাসিক কিস্তিতে আদায়ের সুবিধা দেওয়া হয়। ফিল্ড মার্শাল স্মাটসের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা একটি সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া দাবী করে; কিন্তু সেখানকার সুবিচারের নমুনা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কতখানি সভ্য ও গণতান্ত্রিক।

ব্রিটিশ পেনাল কোড "সম্রাট (বা রাষ্ট্রপতি) কোন ভুল করিতে পারেন না, অতএব তাঁহার কোন দণ্ড বিধান করা যায় না" বলিয়া সম্রাট বা রাষ্ট্রপতিকে একেবারে 'খোদা' বানাইয়া দিয়াছে।* ব্রিটিশের পুচ্ছধারী রাষ্ট্রগুলিও কার্যতঃ এই স্বৈরনীতিই চালাইয়া যাইতেছে নিজ নিজ দেশের লক্ষ কোটি মুক জনগণের উপর। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সব রাষ্ট্রকর্তা যে এই ধরনের স্বৈরাচার ও অবিচার চালাইতে পারিতেছে, তাহার মূল কারণ এই যে, সমগ্র রাষ্ট্র-শক্তির ন্যায় বিচার-বিভাগ (Judiciary) কেও ইহারা নিজেদের মুঠির মধ্যে কাবু করিয়া লইয়াছে। ফলে বিচার-বিভাগ কর্তৃক তাহারা নিজেদের মর্জিমত রায় দান করাইতে সমর্থ হইতেছে। বস্তুতঃ বিচার বিভাগ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইত, ইহার উপর শাসন-বিভাগের (Executive) কার্যতঃ কোনরূপ কর্তৃত্ব যদি না থাকিত এবং উহা যদি কেবল খোদা-রসূলের আইনের নিকট দায়ী হইত, তাহা হইলে এইরূপ অবিচার করার কোন সুযোগই তাহারা পাইত না। ঠিক এই জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র-নীতিতে বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদা দান করা হইয়াছে। বিচার বিভাগ সমগ্র ভাবে খোদার প্রতিনিধি এবং কেবল তাঁহারই সমীপে দায়ী। শাসন-বিভাগই উহা নিযুক্ত করিবে একথা ঠিক; কিন্তু একব্যক্তি যখন বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হইবে, তখন সে নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত ভাবে খোদার আইন অনুযায়ী বিচার করিতে থাকিবে।

---

* "The Sovereign can do no wrong, and is therefore, not liable to punishment" penal code.

www.pathagar.com

বাদী কিংবা বিবাদী কাহারও প্রতি যথাযথ ভাবে রায় দান করিতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।

নিরপেক্ষ ইনসাফের জন্য নির্ভুল ও নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ একান্ত আবশ্যক। পক্ষান্তরে নির্ভুল প্রমাণ হইতে পারে না—যদি নিরপেক্ষ ও স্পষ্ট সত্যবাদী সাক্ষী না পাওয়া যায়। মানব-রচিত বিধানের বিচারও সাক্ষ্য ব্যতীত সম্ভব নয়, কিন্তু সেখানে সাক্ষীর সত্যবাদী হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সাক্ষী যদি এজলাশে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারে, তবে সেই মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অন্যায় রায় প্রদানে কোনরূপ বাধা হয় না।

কিন্তু আল্লাহতায়ালা প্রত্যেকটি ব্যাপারের বিচার ও রায়দান সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী সাক্ষী অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন :

و اشهدوا ذوى عدل منكم و ممن ترضون من الشهداء -

—"প্রত্যেকটি বিচার্য ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হইতে ন্যায়পরায়ণ ও সাক্ষী হিসাবে পছন্দ কর এমন লোককে তোমরা সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত কর।" অন্য কথায় ন্যায়পরায়ণ ও জনগণের আস্থাভাজন লোকেরাই বিচার্য ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত।

এইজন্য কোরআন মজীদ মুসলমানদের প্রতি প্রথমতঃ সত্য সাক্ষ্য স্পষ্ট ও নির্ভিক ভাবে প্রদানের আদেশ করিয়াছে এবং সাক্ষ্য গোপন করিতে কোরআন তীব্র ভাষায় নিষেধ করিয়াছে :

و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه اثم قلبه - (البقرة)

—"সাক্ষ্য গোপন করিওনা। যে তাহা গোপন করিবে, তাহার আত্মা ভয়ানক পাপী—সন্দেহ নাই।"

এই বাণীসমূহ দ্বারা ইসলামে সাক্ষীদিগকে বিশেষ ভাবে সাবধানও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কিংবা ওকালতীর মার-প্যাঁচের জোরে প্রকৃত অপরাধীকে যাহারা বে-কছুর খালাছ করিয়া দেয় বা দেওয়াইতে চেষ্টা করে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :

ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحيوة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيمة ام من يكون عليهم وكيلا - (النساء)

www.pathagar.com

—"শোন, তোমরা এমন লোক যে, তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো অপরাধীদের পক্ষে ওকালতী করিলে, কিন্তু বল দেখি, কিয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষে খোদার নিকট কে ওকালতী করিবে?—কিংবা সেইদিন তাহাদের পক্ষে কে উকীল হইবে?"

অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কিংবা ওকালতীর সুদক্ষ চালের সাহায্যে তোমরা হয়ত এই দুনিয়ার শাস্তি হইতে অপরাধীকে বাঁচাইলে; কিন্তু নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখ, কিয়ামতের দিন কোন মানুষ বিচারক হইবে না, সেদিন বিচারক হইবেন একমাত্র আল্লাহতায়ালা। দুনিয়ার মানুষ বিচারকের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য আর মিথ্যা যুক্তি-প্রমাণের দৌলতে অপরাধীকে 'নিরপরাধ' সাব্যস্ত করিতে হয়ত বা পারিবে, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহা করিতে কেহই সক্ষম হইবে না। সেখানে যেমন কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারিবেনা, তেমনি সেখানে কাহারও ওকালতীও চলিবে না। অতএব এই দুনিয়ার জীবনেই তোমরা সাবধান হইয়া যাও। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলামের বিচার-ব্যবস্থায় বর্তমান পদ্ধতির ওকালতী প্রথার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। সেখানে আইনবিদগণ মোকদ্দমার স্বরূপ নির্ধারণ এবং ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য বিচারকের সাহায্যকারী থাকিবে মাত্র।

ইসলামে নির্ভুল বিচারের জন্য নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের প্রয়োজন। কাহারও দাবী যদি সত্যও হয়, কিন্তু সে যদি নিরপেক্ষ সাক্ষ্য বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সক্ষম না হয়, তবে ফরিয়াদী যত বড় লোকই হউক না কেন, তাহার মোকদ্দমা বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। এক ইয়াহুদী ব্যক্তি চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-র লৌহবর্ম চুরি করিয়াছিল। খলীফা তাহার নিকট তাহা ফেরত চাহিলেন, কিন্তু সে তাহা ফিরাইয়া দিতে মাত্রই রাজী হইল না। খলীফাতুল মুসলেমীনের বর্ম চুরি করা সোজা কথা নয়—তিনি ইচ্ছা করিলেই পুলিশের দ্বারা চোরকে গ্রেফতার করিতে এবং নিজ হাতে তাহাকে মনের মত শাস্তি দিতে পারিতেন। কিন্তু ইসলাম এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার কাহাকেও দেয় নাই—খলীফাতুল মুসলেমীনকেও নয়। কাজেই হযরত আলী (রাঃ)-কেও একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় আদালতে হাযির হইয়া মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইয়াছিল। কাজী তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শুধু দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া কোন রায় দান করেন নাই, বরং বিচারের নিয়ম অনুসারে ফরিয়াদীকে তাহার দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করিতে বলিলেন। তিনি নিজের পুত্র হযরত হাসান এবং ক্রীতদাস কুনবারকে সাক্ষী হিসাবে আদালতে পেশ করিলেন। কিন্তু কাজী শুধু এই জন্যই খলীফা-

www.pathagar.com

তুল মুসলেমীনের মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন যে, ইসলামী বিচার-নীতি অনুসারে নিরপেক্ষ সাক্ষী তিনি পেশ করিতে পারেন নাই। নিরপেক্ষ সুবিচারের এই মহান আদর্শ নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই ব্যক্তি উচ্চস্বরে কালেমায়ে তাইয়েবা পড়িয়া উঠিল এবং বলিল—যে ধর্ম-ব্যবস্থায় এইরূপ নিরপেক্ষ বিচার-নীতি রহিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে সত্য। (ছাইউতী)

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সব বিচার-ফয়ছালা হইয়া থাকে—অর্থাৎ বাদী বিবাদী উভয়ই যেখানে মুসলমান, ইসলাম কেবল সেইখানেই সুবিচার করিতে বলে না। ইসলামী হুকুমাতের কাজীকে সর্বক্ষণ সুবিচারের শাণিত মানদণ্ড ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। মোকদ্দমার উভয় পক্ষ মুসলমান কিনা কিংবা উহার কোন এজ পক্ষ অমুসলিম নাকি, সেদিকে বিচারকের কোনই ভ্রূক্ষেপ থাকিবে না। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতিই তাহার নিরপেক্ষ বিচার-দণ্ড সমানভাবে প্রযুক্ত হইবে। কোন এক পক্ষ অমুসলিম হইলে তাহার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা বা অবহেলা প্রদর্শন এবং মুসলিম ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা মুসলিম বিচারকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। দ্বিতীয়তঃ বিচারকের মনে নির্দিষ্ট কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষও থাকিতে পারিবে না। কোন বিচারক একথা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিবে না যে, অমুক জাতির লোক যদি ফরিয়াদি হয় তবে তাহার দাবী সত্য হইলেও তাহার পক্ষে কখনও রায় দিব না। অনুরূপ ভাবে অমুক জাতির লোক যদি ফরিয়াদী বা আসামী হয়, তবে তাহাকে অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করিব-ই। কারণ এইরূপ জাতীয় বিদ্বেষ আল্লাহতায়ালার নিম্নলিখিত ফরমান দ্বারা সম্পূর্ণ হারাম হইয়া গিয়াছে ঃ

و لا يجرمنكم شنأن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون - (المائدة)

"—নির্দিষ্ট কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদিগকে তাহাদের প্রতি অবিচার করিতে উদ্ধত না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার কর, কারণ ইহাই তাক্ওয়া—তথা ধর্মপালনের অনুকূল নীতি।(জানিয়া রাখ,) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।" এমনকি বিচার্য বিষয় সম্পর্কে বিচারকের নিজস্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলেও উহারই ভিত্তিতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকেই রায় দান করার কোন অধিকার তাহার নাই।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খলীফা উমার ফারুক (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :

ما تقولون لكم لو ان امير المؤمنين شاهد امرأة على معصية ؟

—"বিচারক নিজেই যদি কোন নারীকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখিতে পায়, তবে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই কি সে তাহাকে অভিযুক্ত ও দণ্ড দান করিতে পারে ?" তখন হযরত আলী বলিলেন :

يا تي باربعة شهداء او يحد حد القذف شانه في ذلك شان سائر المسلمين -

"খলীফা বা বিচারককেও চারজন সাক্ষী পেশ করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাকেও জেনার মিথ্যা অভিযোগ তোলার দরুন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই ব্যাপারেও তাহার অবস্থা সাধারণ মুসলমানদেরই সমান"।

কমিউনিজম কিংবা পাশ্চাত্য ধর্মহীন গণতন্ত্র যে সর্বসাধারণ মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার-ব্যবস্থা কায়েম করিতে পারে না, তাহার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ভারতের উপকূলে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য কেরালায় কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হওয়ার সংগে সংগে যে সব বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম করিয়াছে[১], তন্মধ্যে একটি হইতেছে এই যে, সেখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের শাস্তি হ্রাস করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই ভাবে অসংখ্য রাজনৈতিক অপরাধীকে মুক্তি দান করা হয়।...মূলতঃ ইহারা সবই ছিল কমিউনিষ্ট। বিগতকালে একজন কমিউনিষ্ট জনৈক কংগ্রেস কর্মীকে হত্যা করিয়াছিল এবং তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। নির্বাচনের পরবর্তী ১৫ই এপ্রিল-ই তাহাকে এই দণ্ড দানের তারিখও নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কমিউনিষ্ট সরকারের এই বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমের সাহায্যে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডের হাত হইতে রক্ষা করা হয়।

কমিউনিজমের আইন বড়ই আশ্চর্য ধরনের। একটি মানুষকে অকারণ হত্যা করা হয়; কিন্তু হত্যাকারীকে কমিউনিষ্ট সরকার শুধু এই জন্যই বাঁচাইয়া নেয় যে, সে একজন কমিউনিষ্ট কর্মী। ইহাতো প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ্যবাদের

(১) কেরালায় প্রথম কমিউনিষ্ট সরকার কায়েম হওয়ার পরবর্তীকালের ঘটনা।

www.pathagar.com

মতই মারাত্মক। তাহাতে ব্রাহ্মণের জন্য এক আইন, আর শূদ্রদের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন আইন; তাহা হইলে প্রাচীন রক্ষণশীলতা ও আধুনিক প্রগতিবাদের মধ্যে কিংবা কমিউনিষ্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের মধ্যে আর কি পার্থক্য রহিল।

ধর্মহীন গণতন্ত্রের ধারক জনৈক কংগ্রেস নেতা ইহার প্রতিবাদ করিলে উত্তরে বলা হইল : ১৯৪২ সনে তোমরা যখন ক্ষমতালাভ করিয়াছিলে, তখন তোমরাও সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের মুক্তি দিয়াছিলে। এখানেও ঠিক অন্যায়ের সমর্থনে অন্যায়কেই যুক্তি হিসাবে পেশ করা হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কমিউনিষ্টদের নিকট অনাহুত নরহত্যার এমন কি দণ্ড আছে, যাহা কমিউনিষ্ট অকমিউনিষ্ট নির্বিশেষে সকলের উপর সমান ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে?—তাহা কিছুই নাই। বস্তুতঃ বিশ্বমানবের সকলের পক্ষে সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য সুবিচারপূর্ণ আইন হইতে পারে একমাত্র ইসলাম, অন্য কিছু নহে।

উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অদূর ভবিষ্যতে অমুক ব্যক্তি কোন অপরাধ করিতে বা কোন রাষ্ট্র বিরোধী কার্যে লিপ্ত হইতে পারে, এই সন্দেহে কাহাকেও পূর্বাহ্ণেই গ্রেফতার করা এবং কাহারও দ্বারা কোন অপরাধ ঘটিয়াছে ইহার শুধু সন্দেহ করিয়া—নিরপেক্ষ বিচারে দণ্ডনীয় প্রমাণ করার পূর্বেই—তাহাকে আটক করা সুস্পষ্ট জুলুম এবং না-জায়েজ।

ইসলামী শাসন সম্পর্কে বর্তমান কালের জড়বাদী অন্ধ মানুষের কতগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ সন্দেহ রহিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে তন্মধ্য হইতে দুই-একটি সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টা করা অপ্রাসংগিক হইবে না।

বর্তমান জগতের লোকদের ধারণা এই যে, ইসলামী বিধানে চুরি ও জেনার (ব্যভিচার) শাস্তি কঠোর, নির্মম এবং বর্বরতাপূর্ণ। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুরি এবং জেনার ইসলামী শাস্তি কঠোর বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু ইসলাম যে সমাজে এই শাস্তি প্রয়োগ করিবার নির্দেশ দেয় সে সমাজে ইহা কিছু মাত্র কঠোর কিংবা বর্বর মনে হইতে পারে না। ইসলামী হুকুমাতের নিয়ন্ত্রিত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সদুপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এহেন রাষ্ট্রের অধীন সমস্ত মানুষের তথা সমস্ত জীবের জীবিকার সংস্থান করার দায়িত্বও উহার উপর ন্যস্ত। অন্নহীনের অন্নের সংস্থান করা, বস্ত্রহীনের জন্য বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, ঘরহীনের জন্য বাসস্থান তৈয়ার করা, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষার আয়োজন করা প্রভৃতি রাষ্ট্রেরই ঐকান্তিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। একথা ইতিপূর্বে যথাসম্ভব বিস্তারিত রূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। অধিকন্তু, ইসলামী হুকুমাতের অধীন প্রত্যেকটি মুসলিম নাগরিকের মনে নবী

www.pathagar.com

মোস্তফার (ছ) এই বাণী সদা সর্বদা অবশ্যই স্মরণ থাকে "তুমি যদি খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া সুখের নিদ্রায় অচেতন হও এবং তোমার প্রতিবেশী অনাহারে রাত্রি কাটায়, তবে তোমার ঈমান আছে বলিয়া মনে করা যায় না।" এবং সেই অনুসারে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই যথাসাধ্য দান-খয়রাত ও পারস্পরিক সহানুভূতির অনাবিল ভাবধারায় পরিপ্লাবিত থাকে। অভাবী লোক কাহারও নিকট হাত বাড়াইয়া কিছু প্রার্থনা করুক, আর না-ই করুক, তাহার অভাব মোচনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে সম্পন্ন হয়। এহেন সমাজে এত সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ চুরি করে, তবে তাহার হাত কাটা যাইবে না কেন ?....এবং কাটা হইলে তাহা অতিরিক্ত বা অমানবিক শাস্তি হইল বলিয়া কোনক্রমেই মনে করা যাইবে কি ?

মোট কথা, চোরের হাত কাটিয়া দেওয়া বর্তমান পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রের অসমান সমাজ-ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই বর্বরতা, তাহা স্বীকার্য। কিন্তু ইসলামী হুকুমাতের সুবিচারপূর্ণ সমাজে তাহাই উপযুক্ত এবং সঠিক শাস্তি, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

মনে রাখিতে হইবে যে, সকল লোকের জীবিকার সংস্থান যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সকল নাগরিকের ধন-মান-প্রাণ রক্ষা করাও অনুরূপ ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। প্রথম দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা হইলে কাহারওই চুরি করার একবিন্দু প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কিন্তু তবুও যদি কেহ চুরি করে, তবে দ্বিতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য চোরকে আদর্শ শাস্তি দেওয়াও ইসলামী রাষ্ট্রেরই একান্ত কর্তব্য।

তাহার পর ইহাই বিবেচ্য যে, যে সমাজে পাশবিক লালসা সব-সময় উত্তেজিত হইয়া আছে, যেখানে পর্দাহীনতা, কুৎসিক নভেল-নাটক, সিনেমার অশ্লীলতা, নগ্নতা ও লজ্জাহীনতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, যেখানে বিবাহ খুবই কঠিন এবং জেনা খুবই সহজ কাজ, এমন সব সমাজে জেনাকারীকে "সংগেসার" করার শরীয়াতী শাস্তি দেওয়া অসমীচীন— সন্দেহ নাই। কারণ তাহা ইসলামী আইন জারী হওয়ার মত উপযুক্ত সমাজ নয়। কিন্তু ইসলাম যে সমাজ গঠন করে, তাহাতে মানুষের লালসায় উত্তেজিত হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। সেখানে মানুষের নফ্সের খাহেশ জাগাইয়া তোলার উপকরণও কিছু থাকিতে পারে না।

সেখানে নগ্ন ও অশ্লীল ছবির ছড়াছড়ি, পর্দাহীনতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বিবাহ এই সমাজে খুবই সহজ সাধ্য কাজ হইয়া যায়, কিন্তু জেনার সুযোগ একেবারেই থাকেনা।

www.pathagar.com

বিবাহ সেখানে এতই সহজ যে, একটি বিবাহে তৃপ্ত বা সুখী না হইলে একসংগে চারিজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করা যাইতে পারে। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ জেনা করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে দোর্‌রা মারা কিংবা "সংগেসার" করার শাস্তি দেওয়া—তাহাও আবার কমপক্ষে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়ার পর,—অন্যায় হইতে পারে কি?

বস্তুতঃ ইসলামী শাসন নিখিল মানুষের জন্য অতীব কল্যাণকর। ইনসাফ, সাম্য, অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা এবং সুবিচার মানুষ কেবলমাত্র ইসলামী হুকুমাতেই লাভ করিতে পারে।

www.pathagar.com

আইনের শাসন

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট-ই এই যে, সেখানে আইনের শাসন পূর্ণ মর্যাদা সহকারে কার্যকর হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে এই প্রশ্নটি জনসমাজে অধিকতর প্রকটরূপ ধারণ করিয়াছে। কালের যতই অগ্রগতি সাধিত হইতেছে, জনগণের সামাজিক সম্পর্ক যতই সম্প্রসারিত হইতেছে, সেই সংগে সামাজিক জটিলতাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রত্যেকটি মানুষের কতগুলি অধিকার স্বাভাবিক এবং সর্ববাদি সমর্থিত। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে উহার সংরক্ষণ কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তিগণ পরস্পর কর্তৃক সে অধিকারসমূহের বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার শুধু আশংকা-ই করিতেছেনা, সমাজের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ও কর্তৃত্বের দিক দিয়া এই ব্যাপারে তাহাদের মনে প্রবল আশংকাও জাগ্রত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় জনগণের অধিকার রক্ষার এমন সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হওয়া একান্ত অপরিহার্য বোধ হইতেছে, যাহা জনগণকে নিরপেক্ষ ইনসাফ ও সুবিচারের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করিবে, ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব নিরূপণ করিবে, ব্যক্তিগত অধিকার ও মর্যাদাকে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে সম্মানার্হ প্রতিপন্ন করিবে এবং সরকারের ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে স্বভাব-সীমা লংঘন করা হইতে বিরত রাখিবে।

আইনের শাসন বলিতে সাধারণতঃ এই কয়টি বড় বড় কথাই মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনের শাসনের ক্ষেত্র ইহা হইতেও অধিক ব্যাপক ও সম্প্রসারিত। বর্তমানে কোন-না-কোনরূপ আইনের আওতায় পড়েনা মানবজীবনের এমন কোনও দিক বা বিভাগের ধারণা পর্যন্ত করা যায়না। এই কারণে ব্যক্তিগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আইন রচনার জন্য এমন সব নীতি নির্ধারণ করা একান্তই অপরিহার্য, যাহা

www.pathagar.com

আইন-রচয়িতাদিগকে কোনরূপ সীমা লংঘনকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে দিবেনা। তাহারা যদি জনগণের সর্বসমর্থিত আজাদীকে নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত করিতে সচেষ্ট হয়ও, তবুও তাহাদিগকে সঠিক পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সেখানে স্বাধীন-মুক্ত বিচার বিভাগ বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যক।

বস্তুতঃ আইনের শাসন ব্যতীত পরিপূর্ণ আজাদী এবং উহার বিকাশ ধারণাতীত। ইহার গুরুত্ব এইভাবেও অনুধাবন করা যায় যে, এই দুনিয়ায় মানুষের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষা এবং উন্নয়ন ইহা ব্যতীত আদৌ সম্ভব হইতে পারেনা। হযরত উমার ফারুক (রাঃ) বলিয়াছিলেন :

متى تعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا -

—"মানুষকে তাহাদের মায়েরা স্বাধীন-রূপে প্রসব করিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা কবে হইতে কেমন করিয়া দাসানুদাস বানাইয়া লইয়াছ?"

অন্যকথায় মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। স্বাধীনতার অধিকার সম্পূর্ণরূপে জন্মগত। তাহাদের এই আজাদী হরণ করার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। হযরত উমারের এই কথাটি আইনের শাসন পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। যে কথা, যে কাজ এবং যে পদক্ষেপের ফলেই মানুষ মানুষের অধীন হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়—এ অধীনতা সম্যক হউক কি আংশিক—তাহাই আইনের শাসনের বিপরীত এবং মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের পক্ষে তাহাই অত্যন্ত হানিকর। মূলতঃ আইনের শাসন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের সর্বোন্নত মান এবং ইহা মূলগতভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের এই প্রকাশ সাধিত হওয়া সম্ভব। আজ হইতে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে নবী করীম (ছঃ) যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পর খুলাফায়ে রাশেদূন যে রাষ্ট্রকে উন্নতমানে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহাই ছিল মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের সর্বপ্রধান প্রকাশ। এই রাষ্ট্র আইনের শাসনের যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, রাষ্ট্রের ইতিহাসে তাহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। এই রাষ্ট্রে কেবলমাত্র খোদা ও তাঁহার রসূলের প্রদত্ত আইন-ই ছিল একমাত্র আইন। এই আইনের দৃষ্টিতে আরব-অনারব সব সমান ছিল। কালো-গোরায় ও ধনী-দরিদ্রে কোনরূপ পার্থক্য ছিলনা। বংশ ও আভিজাত্যের দিক দিয়া আশরাফ-আতরাফের কোন শ্রেণীবিভেদ ছিলনা। উচচ-নীচের কৃত্রিম বৈষম্যের নাম-চিহ্নও কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতনা। কোরআন ও সুন্নাহ সেখানে ব্যক্তিদের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করিয়াছে, সেখানে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রশাসকের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও সীমায়িত করা হইয়াছে। এই সীমা লংঘন করিয়া আইন রচনা করা এবং তাহা জারী করা খোদার প্রকাশ্য না-ফরমানী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ইউরোপে আইনের শাসন সম্পর্কিত ধারণা জন্মিয়াছে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে, যখন ইংলণ্ডের জনগণ তাহাদের বাদশাহকে ম্যাগনাকার্টায় (Magna Carta) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পাঁচশত বৎসর পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্র আইনের শাসনের এক পূর্ণাংগ কার্যক্রম বাস্তবভাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপিত করিয়াছিল। ইউরোপের অনুরূপ দুনিয়ার অন্যান্য মানবসমাজে একাধারে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরংকুশ ক্ষমতাধর রাজা-বাদশাহদের একচ্ছত্র শাসন চলিয়াছে। এই শাসনের অধীনে সাধারণ মানুষের অবস্থা জন্তু জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও মর্মান্তিক হইয়া দেখা দিয়াছিল। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তখন কাহারও কোন ধারণা ছিলনা। ইসলাম-ই সর্বপ্রথম দুনিয়ার সামনে এই ধারণা পেশ করিয়াছে।

বর্তমানে আইনের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'বিশ্বমানবাধিকার ঘোষণার' (United Nations Charter) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা সংরক্ষণ ও স্থিতিদানের নিয়ামক হইতে পারে। জাতিসংঘের মাধ্যমে দুনিয়ার প্রায় সবদেশই এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। এই কারণে বর্তমান সময়ে সমগ্র দুনিয়ায় আইনের শাসনের ব্যাখ্যা করা হয় ইহারই আলোকে।

এই ঘোষণাপত্র অত্যন্ত ব্যাপক। মানবীয় শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ এবং মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভের জন্য ইহাতে একুশটি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আইনের সংজ্ঞা প্রসংগে ইহাতে বলা হইয়াছে: 'আইন হইতেছে জনগণের ইচ্ছা-বাসনা ও আশা-আকাংখার প্রকাশ—এমন সব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, যাহারা প্রকৃত স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনে নির্বাচিত হইয়াছে। নির্বাচন বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে, স্বাধীন নিরপেক্ষ গোপন ভোটদানের নিয়মে নির্দিষ্ট সময়কাল অতীত হওয়ার পর পরই অনুষ্ঠিত হইবে।' এতদ্ব্যতীত বিশ্ব-মানবাধিকার ঘোষণায় কতকগুলি নাগরিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দান করা হইয়াছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, জন-সম্মেলন ও সংগঠনের স্বাধীনতা তাহার অন্যতম। অপরাধ না করিয়াও গ্রেফতার হওয়া ও অন্তরীণ হওয়া হইতে নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থাও ইহাতে করা হইয়াছে। এককথায় বলা যায়, বিশ্ব-ঘোষণায় আইনের শাসনের পরিসর অধিকতর ব্যাপক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জাতিসংঘের

www.pathagar.com

সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ইহা বাস্তবায়িত করার বাধ্যবাধকতা নিজেরাই গ্রহণ করিয়া লইয়াছে।

একথা সত্য যে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন। সাংস্কৃতিক ও তাহজিবী ঐতিহ্যও নানা রকমের, নানা প্রকারের। অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যাও বিচিত্র ধরনের। উহার স্বরূপও নানা ধরনের। রাজনৈতিক মতাদর্শও এক এক জায়গায় এক এক রকমের। এইরূপ অবস্থায় মানবাধিকারের বিশ্ব-ঘোষণা অনুযায়ী সর্বত্র কাজ করা যায় কিনা, সর্বত্র আইনের শাসন কায়েম করা সম্ভব কিনা, ইহা অবশ্য একটা প্রশ্ন।

কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও দুনিয়ার সর্বত্র সর্বদেশেই আইনের শাসন কায়েম হইতে পারে। অবশ্য সেজন্য আটটি শর্ত অবশ্যই পালনীয়।

প্রথম শর্ত এই যে, দেশের একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিতে হইবে। তাহাতে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সুস্পষ্টরূপে সংযোজিত হইবে। প্রশাসন বিভাগ এবং আইন-পরিষদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার সীমা-চৌহদ্দীও নির্ধারিত থাকিবে।

গ্রেটবৃটেনের লিখিত শাসনতন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও সেখানে আইনের শাসন কয়েকটি মৌলিক দস্তাবীজের সনদে প্রতিষ্ঠিত। একটি হইতেছে ম্যাগনা কার্টা। উহাতে হেবিয়াস কর্পাস দাখিলের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মামলা মোকদ্দমার শুনানীর জন্য জুরী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতঃপর সপ্তম শতাব্দীতে ইংল্যণ্ডের রাজারা মৌলিক অধিকারের দুইটি আইন মঞ্জুর করেন। আর অষ্টাদশ শতকের শুরুতে 'সেটেলমেণ্ট এ্যাকট' পাশ করা হয়। আসলে এইগুলি নাগরিক স্বাধীনতারই ঘোষণা ছিল। ইহার সাহায্যে আইন পরিষদের স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে এবং জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে উহার প্রাধান্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এইভাবেই বৃটেনে আইনের শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইয়াছে। আর লিখিত শাসনতন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও তথায় জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে কোনই অসুবিধা দেখা দেয় নাই। এক কথায় আইনের শাসন লিখিত শাসনতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই যে সে দেশে আইনের শাসন কায়েম হইবে এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। আসলে শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ইখতিয়ার সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত থাকিতে হইবে। ইহা শুধু লিখিত থাকাই যথেষ্ট

www.pathagar.com

নয়, সেই সংগে প্রশাসন বা আইন পরিষদ কর্তৃক নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর কোন সংকোচন বা নিয়ন্ত্রণ চাপাইয়া দেওয়া হইলে কিংবা উহারা নিজ নিজ কর্মসীমা লংঘণ করিলে বিচারার্থে আদালতে উপস্থিত হওয়ার ও বিচার প্রার্থনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সুযোগও থাকিতে হইবে। বস্তুতঃ আদালতী সংরক্ষণভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন অধিকার-ই রক্ষা পাইতে পারে না। অনুরূপভাবে প্রশাসন বিভাগ যদি শাসনতন্ত্র বিরোধী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে, তাহা হইলে আদালতী বিচারে উহার প্রতিরোধ সম্ভব হইতে হইবে।

এই পর্যায়ে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের শাসনতন্ত্রকে অবশ্যই জনগণের মর্জিমত এবং তাহাদের আশা-আকাংখার প্রতীক হইতে হইবে। যখন আইন প্রণয়নে জনমতের প্রতিনিধিত্বকে আইনের শাসন কায়েমের জন্য শর্ত হওয়ার কথা বলি, তখন শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে তো ইহা আরও বেশী জরুরী। অতএব দেশের শাসনতন্ত্র কোন এক ব্যক্তির হাতে নয়, গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা বিরচিত হওয়া আবশ্যক। এক ব্যক্তি কখনও সমগ্র জাতির মনের প্রতিধ্বনি হইতে পারে বলিয়া মনে করা মারাত্মক রকমের ভুল। কোন ব্যক্তির মধ্যে এতদূর যোগ্যতা থাকা আদৌ সম্ভবপর নয়।

কাজেই শাসনতন্ত্র রচনার মত জটিল ও সূক্ষ্ম দায়িত্বপূর্ণ কাজ এক ব্যক্তির পক্ষে সম্পন্ন করা আবাঞ্ছণীয় ব্যাপার। বর্তমানে রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব অপরিসীম, কর্মক্ষেত্র বিপুলভাবে সম্প্রসারিত। আইন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা আবশ্যক। একই ব্যক্তি এই সর্বক্ষেত্রেরই বিশেষজ্ঞ কখনই হইতে পারেনা। এই কারণে দুনিয়ায় প্রচলিত নিয়ম এই যে, কোন দেশ যখন শাসনতন্ত্র রচনা করার সিদ্ধান্ত করে, তখন সেজন্য জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। যদিও দুনিয়ার নানাদেশে ডিক্টেটর ও স্বৈরাচারী শাসকরা নিজেদের ইচ্ছামত একটা শাসনতন্ত্র তৈরী করিয়া জাতির উপর গায়ের জোরে চাপাইয়া দিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একব্যক্তির রচিত শাসনতন্ত্র কখনও আইনের শাসনের ব্যবস্থা করিতে পারে না—ইহা আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আইনের শাসনের দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র। এক কথায় বলা যায়, সরকার গঠন এবং উহার নীতি নির্ধারণ সম্পন্ন হইতে হইবে জনমতের অনুরূপ, জনমতের ভিত্তিতে। বিশ্ব-ঘোষণায় এই নীতিটি গৃহীত হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ 'প্রত্যেক নাগরিকই শাসনকার্যে সরাসরি ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবে।'

www.pathagar.com

বস্তুতঃ যেখানে যেদেশেই জনগণ নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পুরামাত্রায় সচেতন, সেখানেই এইরূপ গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও কয়েকটি মৌলিক বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রথমতঃ জনগণকে প্রশাসন কার্য চালাইবার জন্য নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ সুযোগ দিতেই হইবে। আইন প্রণয়নের কাজ সর্বোতভাবে সম্পন্ন হইতে হইবে গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা। আইনের শাসন কায়েম করিতে হইলে প্রত্যেক বয়স্ক নাগরিককে ভাটদানের অধিকার অবশ্যই দিতে হইবে, ভোট গণনা হইতে হইবে সম্পূর্ণ গোপনে। আর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে হইবে নির্দিষ্ট অবকাশের পরে পরে এবং নিয়মিতভাবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আটটি শর্তের মধ্যে ইহা তৃতীয় শর্ত।

সাধারণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন অবাধ নির্বাচন সরাসরিভাবেই সম্পন্ন হইতে পারে। কেননা এই উপায়েই জনমতের পূর্ণ ও নির্ভুল প্রকাশ সম্ভব। পক্ষান্তরে পরোক্ষ নির্বাচন (Indirect Election) কয়েকটি অনিবার্য কারণে জনমতের সঠিক প্রকাশের পরিপন্থী হইয়া থাকে এই নির্বাচনে নির্বাচনী কলেজ (Electoral College) সদস্য জনগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি প্রাচীরবৎ হইয়া দাঁড়ায়। পরবর্তী সব পর্যায়ে ভোটদানের ক্ষমতা তাহাদেরই কুক্ষিগত। ফলে জনগণ মত প্রকাশের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ নির্বাচনের আর একটি মারাত্মক দিক এই যে, ভোটদাতাদের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ হয় বলিয়। ভোটক্রয় ও প্রলোভন বা ধমকের সাহায্যে ভোটদানকে প্রভাবান্বিত করা সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনে এইরূপ হওয়া কিছুমাত্র সহজ নয়।

সমাজের সাধারণ লোকদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনা বর্তমান না থাকিলে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচিত করা যায়না বলিয়া বিভিন্ন মহল হইতে যে উক্তি করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও এই নির্বাচনের মাধ্যমেই জাগাইতে হইবে—জাগানো সম্ভব। অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব নয়। যে দেশের জনগণ সাধারণ নির্বাচনের সঠিক কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা প্রথম দিক দিয়া হয়তো ভুল করিবে, বার বার আঘাত খাইবে। কিন্তু কোন জননী যেমন শিশুর আঘাত পাওয়ার ভয়ে তাহাকে সবসময়ে নিজ ক্রোড়ে বা দোলনায় ঘুম পাড়াইয়া রাখেনা—তাহাকে চলিতে দিলেই সে চলার যোগ্যতা অর্জন করিবে, অনুরূপভাবে কোন জাতি সাধারণ নির্বাচনে ভুল করিয়া বসিবে এই বাহানায় প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন হইতে তাহাদিগকে

www.pathagar.com

ব ঞ্চিত রাখা শুধু অযৌক্তিক নয়, প্রচণ্ড ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়।

রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত ও পরিপক্ক করিয়া তুলিবার জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। ইহারই সাহায্যে ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে, ক্রমবিকাশ লাভ করে ব্যক্তিত্ব-নিহিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য ইহারই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

আইনের শাসনের পঞ্চম মূলনীতি এই যে, ব্যক্তিকে এমন সব কথাই বলার আজাদী দিতে হইবে, যাহাতে অপরের অসম্মান না হয়, যাহাতে বলপ্রয়োগ বা উচ্ছৃংখলতা ও আইনভংগের কাজের উৎসাহ দেওয়া হয় না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও এই পর্যায়েরই এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গৃহীত নীতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে জনমত প্রকাশ ও সমালোচনা প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকিতে হইবে। সরকারও স্বীয়নীতি আচরণ ও কার্যাবলী সম্পর্কে প্রকৃত জনমত যে কি, সে বিষয়ে অবহিত হইতে পারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকিলে। অতএব যে সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে, তাহাকে কোন বুদ্ধিমান সরকার বলা যাইতে পারেনা, গণতান্ত্রিক সরকার বলা তো দূরের কথা। কেননা সংবাদ সংগ্রহ ও জনমত যাচাইয়ের একমাত্র নির্ভুল উপায় হইতেছে সংবাদপত্র।

বস্তুতঃ পত্রিকাসমূহ প্রকৃত জনমত প্রচার ও প্রকাশ করিয়া সরকারের বড় খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে। এই হিসাবে স্বাধীন ও আলোকপ্রাপ্ত সংবাদপত্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য এক মহামূল্য সম্পদ। প্রগতিশীল সরকার এইরূপ সংবাদিকতা কেবল বরদাশ্‌তই করে না, উহার লালনও করে, উহাকে উৎসাহও দান করে। কিন্তু ইহার অর্থ কখনও এই নয় যে, সংবাদপত্র গণস্বার্থ-বিরোধী তৎপরতা গ্রহণ করিবে। কেননা আজাদী মাত্রেরই সীমা নির্দিষ্ট থাকে। প্রত্যেকটি অধিকারের সংগে সংগে দায়িত্বও জড়িত রহিয়াছে। জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কর্তব্য। এই জন-স্বার্থ বলিতে কি বুঝায় এবং কিসে জন-স্বার্থ রক্ষিত হয় ও কিসে তাহা বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষিত হওয়া আবশ্যক। প্রশাসন বিভাগের কোন ব্যক্তিকে যে কোন জিনিসকে জনস্বার্থ বিরোধী আখ্যা দেওয়ার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। শাসনতন্ত্র ও আইন বিধানে জনস্বার্থের সংজ্ঞা ও উহার বিপরীত জিনিসের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক। কোন রচনা বা বক্তৃতাকে জন-স্বার্থ বিরোধী বলিয়া আখ্যা দেওয়ার অধিকার কেবলমাত্র বিচার বিভাগেরই থাকিতে হইবে। অন্যথায় সরকার নিজের অপছন্দনীয় যে কোন কাজকেই জনস্বার্থ বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারে। ডিক্-

www.pathagar.com

টেটরী ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় তো শাসন কর্তৃপক্ষের স্বার্থকেই জনস্বার্থ বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ক্ষমতাসীনদের সমালোচনাকে জনস্বার্থ ক্ষুণ্নকারী বলিয়া দণ্ডিতও করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আইনের শাসনের ষষ্ঠ শর্ত হইতেছে জনসম্মেলন, জনসমাবেশ এবং জনসংগঠন করার অবাধ স্বাধীনতা থাকা। প্রত্যেক সমাজেই বিভিন্ন স্বার্থ সমন্বিত এবং বিভিন্ন মতাদর্শ ও দৃষ্টিভংগীসম্পন্ন মানুষ থাকে। দেশের আইনে জনমতের নির্ভুল প্রতিফলন সাধনের জন্য জনগণকে তাহাদের সম্মিলিত স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্মিলিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দল গঠনের স্বাধীনতা দিতে হইবে। সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন ধরনের হউক বা রাজনৈতিক ধরনের—তাহার উপর কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করার অর্থ হইল স্বাধীনতার অবর্তমানতা, স্বাধীনতাকে গলা টিপিয়া হত্যা করা। এইরূপ নিয়ন্ত্রণ গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, আইনের শাসন কায়েমের পক্ষে একান্তই মারাত্মক।

তবে একথাও সত্য যে,কোন সংগঠনকেই বে-আইনী ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কে এইরূপ তৎপরতা করিতেছে আর কে নয়, কোন্ ধরনের তৎপরতা ধ্বংসাত্মক এবং কোন্ ধরনের তৎপরতা গঠনমূলক, তাহার ফয়সালা করিবে কে? এই বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণের কোন অধিকার প্রশাসন বিভাগের থাকিতে পারে না। জনসম্মেলন ও জন সংগঠনের আজাদী স্বাধীন জাতির নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ব্যাপার। প্রশাসন বিভাগকে এই ব্যাপারে এক-তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া যাইতে পারে না। সরকারী কার্যক্রমের দ্বারা ক্রমাগতভাবে এই অধিকার গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রশাসন বিভাগের হস্তে তুলিয়া দেওয়ার অর্থ 'কশাই'র শাণিত ছুরির তলায় অসহায় ছাগলকে শোয়াইয়া দেওয়া। কোন সংগঠনের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও বে-আইনী তৎপরতার অভিযোগ হইলে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিচার বিভাগের নিকটই সমগ্র ব্যাপারটি উপস্থাপিত করিতে হইবে। কোন কোন শাসনতন্ত্রে 'আইন সম্মতভাবে' কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মৌলিক অধিকার-বিরোধী আইন রচনার সুযোগ সরকারের হাতে রহিয়াছে। অথচ আইনের শাসনের মূলকথাই হইল এই যে, মৌলিক অধিকার ক্ষুন্নকারী কোন আইন রচিত হইলে বিচার বিভাগের পক্ষে উহাকে শাসনতন্ত্র বিরোধী ঘোষণা করার অধিকার থাকা আবশ্যক।

অন্যকথায় প্রশাসন বিভাগ ও আইন পরিষদ—উভয়ের উপর বিচার বিভাগের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব থাকিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলেই আইনের শাসন কায়েম হওয়া সম্ভব। মৌলিক অধিকার যদি বিচার

www.pathagar.com

বিভাগীয় কর্তৃত্বাধীন না হয়, তবে তাহা অন্তঃসারশূন্য শ্লোগানে পরিণত হইবে। অতএব এক অসীমসাহসী স্বাধীন বিচার বিভাগ ব্যতীত আইনের শাসন কায়েম হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যে, প্রশাসন বিভাগ ও আইন পরিষদ কেহই উহার কার্যক্রমের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেনা। দ্বিতীয়তঃ বিচারপতি নিয়োগ ও পদচ্যুতির ব্যাপার এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণের ইখতিয়ার প্রশাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত না হইয়া তাহা সম্পূর্ণতঃ বিচার বিভাগের কর্তৃত্বাধীন হইতে হইবে। যে বিচার বিভাগের বিচারপতি ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণের ইখতিয়ার প্রশাসন বিভাগের আয়ত্তাধীন, সে বিচার বিভাগের পংগু ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ হওয়াই স্বাভাবিক, উহার স্বাধীন মর্যাদা লাভ করা কখনই সম্ভব হইবেনা। কিন্তু কেবল প্রশাসন বিভাগের প্রভাব মুক্ত হইলেই চলিবেনা, স্বয়ং বিচারপতিদের উপরও এই দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিতে হইবে যে, তাহারা যে-কোন মূল্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, এ পথে কোন বিপদের ঝুঁকি লইতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না। কোনরূপ ধমকেও তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইবে না এবং ভাংগিয়া পড়িবে না। ইসলামের ইতিহাসে এই ধরনের বিচারপতিদের অত্যুজ্জ্বল কার্যাবলীর কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহারা সত্য ও ইনসাফের ব্যাপারে খলীফাতুল মুসলেমীন বা রাজা-বাদশাহকেও একবিন্দু পরোয়া করে নাই।

আইনের শাসন কায়েম করার সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হইতেছে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা। আইনের শাসন ও নাগরিক স্বাধীনতা সেই সমাজেই প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হইতে পারে, যেখানকার জনগণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। বর্তমানেও দুনিয়ায় এমন দেশের অভাব নাই, যেখানে শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও সেখানকার সরকার যদি ইহার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে, তবে সেদেশের চেতনাসম্পন্ন জনগণ সরকারকে একদিনের তরেও বহাল থাকিতে দিবে না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মৌলিক অধিকার কাগজে কলমে লিখিয়া দেওয়াই উহার সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট নয়। ইহার নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার উপর। বস্তুতঃ আইনের শাসন পর্যায়ের এই দীর্ঘ আলোচনা হইতে এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত ধারণা জন্মে তাহা কেবল মাত্র ইসলামী রাষ্ট্রেই যথাযথ ও পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। বর্তমান গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাই ইহার প্রমাণ।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা

ইসলামী রাষ্ট্র আদর্শ ভিত্তিক ও আদর্শবাদী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় সুস্পষ্ট ও পূর্ণাংগ আদর্শের উপর এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সেই আদর্শের বাস্তব প্রতিষ্ঠা ও রূপায়ণ আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে সেই আদর্শের পুংখানুপুংখ অনুসরণ ও প্রচার সাধনই হয় উহার একমাত্র পরিচয়। এই কারণে এইরূপ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা অনুরূপভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শুধু বৈদেশিক আক্রমণের দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ নয়, আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া ইহার প্রতিরক্ষার নিঃখুত ব্যবস্থা করার গুরুত্ব উহা-পেক্ষাও অনেক গুণ বেশী।

ইসলামী রাষ্ট্র যেন মহাসমুদ্রে চলমান একটি বিরাট জাহাজ। তিনটি কারণে ইহার উপর বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে পারে। প্রথম দিক হইল ইহার ভিতরকার কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতির বিকল ও অচল হইয়া যাওয়া, কিংবা বিপরীত দিকে জাহাজকে চালাইয়া নেওয়া। দ্বিতীয় দিক হইল জাহাজের তলায় কোন ছিদ্রের অবস্থিতি বা কোন ফাটল সৃষ্টি, যাহার ফলে বিন্দু বিন্দু পানি প্রবেশ করিয়া গোটা জাহাজকেই অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে। আর তৃতীয় হইল প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি, যাহার দরুন এমন গগণচুম্বি উর্মিমালা উত্তুংগ হইয়া উঠিবে যে, গোটা জাহাজকেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক

আদর্শবাদী ও আদর্শভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রের উপরও অনুরূপ ভাবে তিনটি দিকের মারাত্মক বিপদ ঘনাইয়া আসিতে পারে। ইহার পরিচালক ও দায়িত্ব-সম্পন্ন কর্মকর্তাদের অজ্ঞতা বা অসহযোগিতার দরুন ইহা অচল হইয়া পড়িতে পারে, পারে বিপরীত দিকে বা কোন বক্র পথে চালিত হইতে। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

এই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন লোক ইসলামী আদর্শবাদ বিরোধী গোপন তৎপরতায় নিরন্তর মুখর হইয়া উঠিতে পারে, যাহারা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়, নয় ইহার একবিন্দু কল্যাণকামী। আধুনিক পরিভাষায় ইহাদেরই বলা হয় পঞ্চম বাহিনী (Fifth columnist)। আর তৃতীয় হইল বৈদেশিক শক্তির প্রকাশ্য ও সশস্ত্র আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে শুধু দেশ ও রাষ্ট্রেরই বৈদেশিক শক্তির কবলিত হইয়া পড়ার আশংকা হয় না, ইসলামী আদর্শবাদের চরম ক্ষতি সাধিত হওয়ার ও সমূহ বিপদ দেখা দেয়। এই রাষ্ট্রের উপর বৈদেশিক আক্রমণ হইতে পারে এমন সব শক্তির দিক হইতে, যাহারা এই রাষ্ট্রের আদর্শ—ইসলামের দুশমন। তাহারা মনে করে, এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও উন্নতি ইসলামী আদর্শেরই উৎকর্ষ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠার নামান্তর। আর তাহাই ইহাদের মর্মজ্বালার কারণ হইয়া পড়ে। তাই এই রাষ্ট্রকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করিবার জন্য উহার আদর্শ বিরোধী শক্তিগুলি পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও উহাকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা চালাইতে পারে। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করিতে হইবে এই তিনটি দিক দিয়া। ইহার কোন একটি দিক দিয়াও যদি ইহার প্রতিরক্ষা দুর্বল হইয়া পড়ে কিংবা উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে আদর্শবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে তাহাই সর্বাত্মকভাবে মারাত্মক হইয়া পড়িতে পারে।

প্রতিরক্ষার মৌলিক উপাদান

আদর্শবাদী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হইতেছে ইহার আদর্শিক শক্তি। সমর বিদ্যা পারদর্শীদের মতে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী শক্তি অস্ত্র-শস্ত্রের বিপুলতা ও আধুনিকত্ব নয়, বরং তাহা হইতেছে দেশের সমগ্র জনগণের মানসিক শক্তি, চিত্তবল। মানসিক শক্তির উৎস হইতেছে দৃঢ় প্রত্যয়, হৃদয়াবেগ ও অবিচল নির্ভরতা, নিজদের আদর্শ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আবেগ পূর্ণ মমত্ববোধ এবং উহার সংরক্ষণের জন্য আত্মোৎসর্গ করার প্রবল আকুতি। নিজেদের জাতীয় অস্তিত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে অটল বিশ্বাস এবং নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে অগাধ আস্থা নিজেদের জয়ের ও শত্রুর পরাজয়ের নিঃসংশয় কামনা; নৈরাশ্য ও হতাশার নিরসন, আশার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙ্গীন আলোকচ্ছটা। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি সামরিক অস্ত্রশক্তির সংগে সংগে আদর্শিক শক্তিরও ধারক হইয়া থাকে, তবে আদর্শবাদী ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অনুরূপ আদর্শিক শক্তির গুরুত্ব অসম্ভব রকম তীব্র হইয়া দেখা দেয়। এই

www.pathagar.com

আদর্শবাদিতার শক্তি নেতিবাচক হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাহাকে হইতে হইবে সম্পূর্ণরূপে অস্তিবাচক। নেতিবাচক ভাবে দেশের জনসাধারণ, শাসকমণ্ডলী রাষ্ট্রনেতা, সামরিক কর্মকর্তা, পুলিশ ও সাধারণ সেনাবাহিনীকে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস ও বাস্তব—উভয় দিক দিয়াই আদর্শবাদী হইতে হইবে, হইতে হইবে আদর্শের বাস্তব প্রতীক। আর সেই সংগে উহাকে প্রতিপক্ষের আদর্শের তুলনায় অধিক উন্নত, যুক্তি সংগত এবং সাধারণ মানুষের নিকট মর্মস্পর্শী হইতে হইবে। আদর্শবাদের ক্ষেত্রেই উহাকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহাই হইবে উহার Positive Action। বস্তুতঃ মানসিক ও নৈতিক শক্তি ব্যতীত কেবলমাত্র সমরাস্ত্রের শক্তির দ্বারা কখনই যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হয় না; সম্ভব হয় না সুষ্ঠুভাবে আত্মরক্ষা করা। ইহা সমর-বিজ্ঞান পারদর্শীদের কর্তৃক স্বীকৃত এক মহা সত্যনীতি। আদর্শবাদী দেশ ও রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস ইহার অকাট্য প্রমাণ।

মানসিক শক্তির পর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য হইতেছে নৈতিক শক্তি। নৈতিক শক্তি বলিতে বুঝায় বিশ্বস্ততা, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দয়ার্দ্রতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা। প্রেম ভালোবাসাপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব, আনুগত্য, আত্মদান, দৃঢ়তা ও সৌর্যবীর্য প্রভৃতি এই পর্যায়ের উন্নতমানের গুণাবলী। সমর-বিশেষজ্ঞদের চূড়ান্ত মত এই যে, শত্রুর মোকাবিলায় নিজেদের সংরক্ষণ এবং শত্রুকে পরাভূত করার জন্য এই গুণাবলী বিশেষ কাজ করে। কিন্তু ইহাতেই যদি অভাব পরিলক্ষিত হয় তবে অস্ত্রশক্তি যত প্রবলই হউক না কেন শত্রুর মোকাবিলায় আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এক একটা জাতির নৈতিক চরিত্রবল গড়িয়া উঠে তিনটি দিক দিয়া। সুস্থ ও নির্ভুল জাতীয়তাবোধ জাতির জনগণের রক্তমাংসে সংক্রমিত হওয়া প্রথম প্রয়োজন। কেননা উহার ফলেই এক সুদৃঢ় জাতীয় সত্ত্বা গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়, কোন সুস্পষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস থাকার ফলে তদৃষ্টিতে জাতির লোকদের জীবনে ও চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন সুচিত হওয়া আবশ্যক। ইহারই ফলে তাহারা আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের পবিত্র ভাবধারায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাই মৃত জাতির নিস্পন্দ দেহে জাগ্রত করে নুতন প্রাণের চাঞ্চল্য। এই জাতীয়তাবোধ নির্দিষ্ট আদর্শবাদের উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকে। বংশ, ভাষা বা বর্ণ কিংবা আঞ্চলিকতা ভিত্তিক ও ভূমিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ এইক্ষেত্রে

www.pathagar.com

কোন কল্যাণ দান করিতে পারেনা। বরং একটি জাতির অগ্রগতি সম্প্রসারণ ও পরবশকরণের ক্ষেত্রে ইহা গতিরোধকারী হইয়া থাকে।

আর তৃতীয় হইল বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহতায়ালা ও মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে সঠিক—সুস্পষ্ট ধারণা এবং বিশ্বাস। খোদার প্রতি ঈমান, খোদার সন্তোষ লাভের উদগ্র পিপাসা এবং পরকালীন কল্যাণ লাভের একনিষ্ঠ কামনা গোটা জাতির স্বভাব চরিত্রকে অতুলনীয় বানাইয়া দিবে। কেননা সর্বাত্মক ও উন্নত ধরনের চরিত্রে কেবল মাত্র খোদা ও পরকাল সম্পর্কিত নির্ভূল ধারণা ও বিশ্বাস হইতেই জাগিতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নয়। এই কারণে সমগ্র দেশে স্থায়ী প্রতিরক্ষা শক্তির উদ্বোধনের জন্য খোদা ও পরকাল বিশ্বাস সৃষ্টির এক সঠিক আদর্শবাদ ও নৈতিকতা ভিত্তিক আন্দোলন চলিতে থাকা একান্তই অপরিহার্য।

প্রতিরক্ষা ও জাতীয় ঐক্য

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টিতে জাতীয় ঐক্য ও একত্ববোধ এক বিরাট শক্তি বিবেচিত হইয়া থাকে। জাতীয় অনৈক্য, মতবিরোধ ও আদর্শিক পার্থক্য বৈষম্য জাতীয় শক্তিকে দুর্বল করিয়া দেয়; একথা সূর্যের মতই দেদীপ্যমান। কোন জাতি যদি কোন প্রকারের অনৈক্য ও বিরোধে নিমজ্জিত হইয়া থাকে তবে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ইহাই হইতে পারে উহার নিশ্চিত পরাজয়ের কারণ। অস্ত্র-শস্ত্রের সুবিপুল স্তুপ এবং প্রাচুর্যও এই জাতি ও দেশকে পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। এই ধরনের জাতির উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সতত প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাদের লেলিহান জিহ্বা উহাকে করায়ত্ব করার জন্য লোলুপ হইয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত বিদেশী শক্তির গোলামীই হয় ইহার ললাট লিখন। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে জর্জরিত জাতিগুলির গোলামী জীবনের দীর্ঘ ইতিহাসই উহার প্রমাণ। এই অপরিহার্য ঐক্য ও একত্ববোধ সৃষ্টির প্রধানতম ভিত্তি হইতেছে আদর্শ, চিন্তা-বিশ্বাস ও মতবাদের ঐক্য।

ঐক্যের দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে জাতীয় লক্ষ্যের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও প্রেম এবং উহার তৃতীয় ভিত্তি হইতেছে জাতির জনগণের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও উহার উদারতাপূর্ণ আচরণ। উহার চতুর্থ ভিত্তি রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শ-বাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, পক্ষপাতহীনতা, ইনসাফ, সর্বশ্রেণীর মানুষের অধিকার পরিপূরণ এবং শান্তিশৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা। এ সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিলে জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে ও শত্রুর কুক্ষিগত হইয়া পড়িতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু এই ঐক্য ও একত্ববোধ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য

www.pathagar.com

হইতেছে নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তি, আদর্শের ব্যাপক প্রচার, আদর্শের শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী সমগ্র পরিবেশ গড়িয়া তোলা। মাটির প্রেমচর্চা ও দেশের গানের অনুষ্ঠান এই প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে না।

প্রতিরক্ষায় মৌলিক প্রশ্নঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দুইটি প্রশ্ন মৌলিক। একটি এই যে, শত্রু কে, উহার শক্তি কতখানি এবং উহার সামরিক পরিকল্পনা ও ইচ্ছা বাসনা কি? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা কিরূপ হওয়া উচিৎ। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দ্বিতীয় প্রশ্নের সঠিক জওয়াব প্রথম প্রশ্নের সঠিক জওয়াবের উপরই অনেকখানি নির্ভরশীল। দুশমন যে প্রকৃতির ও যে ধরনের হইবে, যেমন হইবে উহার সামরিক পরিকল্পনা; ইচ্ছা বাসনা ও কলাকৌশল (Strategy), প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা ঠিক সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রহণ করিতে হইবে। শত্রু যদি সামান্য ও নগণ্য হয়, তবে উহার মোকাবিলায় বিরাটায়তন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ দেশের অর্থনৈতিক, সমাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ধ্বংস ডাকিয়া আনার কারণ হইবে। আর স্বয়ং দেশরক্ষার দৃষ্টিতে উহাই কঠিন বিপদ সৃষ্টি করিবে। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ যদি অনেক বড়শক্তির আধার হইয়া থাকে, আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করা হয় ক্ষুদ্রশক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া কিংবা দুশমনের সামরিক পরিকল্পনা ও ইচ্ছা-কামনা তথা মতি-গতি সম্পর্কে কোন খবর, কোন ধারণাই যদি না থাকে তাহা হইলেও দেশ-রক্ষার ব্যাপারটি অত্যন্ত সংগীন হইয়া দেখা দিবে। আর উহার পরিণামে সমগ্র দেশ ও জাতি এক কঠিন বিপদেরও সম্মুখীন হইয়া পড়িতে পারে।

বস্তুতঃ আদর্শবাদী রাষ্ট্রের বড় দুশমন হয় অপর কোন আদর্শবাদী রাষ্ট্রই। যে রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন মতাদর্শ নাই—নেতিবাচকও নয়, অস্তিবাচকও নয়, শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণনীতি কিংবা মাটির বুভুক্ষাই যাহার একমাত্র সম্বল, আদর্শবাদী রাষ্ট্রের সহিত উহার মোকাবিলা নিতান্তই সামরিক। আদর্শবাদী রাষ্ট্রের নিকট উহার আক্রমণ বিশেষ কোন কঠিন বিপদ টানিয়া আনিতে পারেনা। কিন্তু প্রতিবেশী যে রাষ্ট্র বিপরীত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, যাহার কাজ শুধু নিজ দেশেই সে আদর্শের রূপায়ন ও বাস্তবায়ন নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকেও তাহাদের আদর্শের অক্টোপাশে বন্দী করিয়া লওয়ার স্থায়ী ষড়যন্ত্র পরিচালনা ও দেশের অভ্যন্তরে আদর্শবাদের ভূয়া শ্লোগানে ভুলাইয়া এবং নিজেদের সস্তা প্রচার-পত্রের মাধ্যমে নব্যসমাজকে তাহাদের আদর্শে

www.pathagar.com

দীক্ষিত করিয়া পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি করিতেও কছুর করেনা, যে রাষ্ট্রের নায়করা মুখে আন্তর্জাতিক শান্তির দোহাই দেয়, আর বাস্তব কাজে বিশ্বজয়ের অনন্ত ক্ষুধার তাড়নায় জর্জরিত, সে রাষ্ট্রের মোকাবিলায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং গভীরভাবে ভাবনার বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ রাষ্ট্রের বাহ্যিক বন্ধুত্বের জন্য প্রসারিত হস্ত, গোপন বিষাক্ত ব্যাঘ্র নখর কিংবা মিশ্রীর ছুরি কিনা, তাহা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে প্রতি মুহূর্ত। যদিও সাধারণতঃ এই ব্যাপারে বিরাট অবজ্ঞা, অবহেলা ও অবিমৃশ্যকারীতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই বাহ্যিক বন্ধুত্বের আচরণের বিষাক্ত ছোরার ঘা খাইয়া ছটফট করিয়া মরিতে হয়।

বস্তুতঃ দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। উহা যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ হইতে পারে তেমনি হইতে পারে আদর্শিক সাম্রাজ্যবাদও। আর ইসলামী আদর্শবাদী রাষ্ট্রের প্রকাশ্য দুশমন হইয়া থাকে এই সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদই—তাহা লাল হউক, পীত হউক, আর সাদা হউক, কিংবা কালো হউক, সব সাম্রাজ্যবাদ-ই সমানভাবে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে মারাত্মক। অতএব ইহাকে এই সব ধরনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবিলায়ই সতত সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে। ইহার ভিতরকার কল-কব্জাকে যেমন সদা সক্রিয় ও সচল করিয়া রাখিতে হইবে, তেমনি উহার তলদেশে কোনরূপ ছিদ্র বা ফাটল সৃষ্টি হইতে না পারে সেজন্যও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সংগে সংগে উহাকে বন্ধ করিবার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আর বাহির সমুদ্রের যে কোন দিকের ঝড় ঝঞ্ঝা ও উত্তাল তরংগমালার মুখেও যাহাতে ইসলামী রাষ্ট্রের এই নূহের কিশ্তী নিমজ্জিত হইয়া না যায় অতল সমুদ্রে, সেজন্য খুব শক্ত করিয়া হাল ধারণ করিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে আদর্শবাদী ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হইবে অতীব দুর্বল।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দৃঢ়তা বিধানের উপায়

অতএব প্রতিরক্ষার ব্যাপারে শত্রুদের প্রকৃতি ও গতিবিধি সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকা এবং উহারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আদর্শবাদী ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে একান্তই কর্তব্য। এক কথায় দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও গাফলতী প্রদর্শন কিংবা অসতর্ক হইয়া থাকা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। অতএব সঠিক পথে ইহার ব্যবস্থা করা দায়িত্বশীলদের কর্তব্য।

www.pathagar.com

সামরিক কলা-কৌশলের দৃষ্টিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বলিষ্ঠ করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একান্তই জরুরী :

(১) জনগণের মনোবল ও মানসিক শক্তিকে প্রবলতর করিয়া তোলা

(২) জনগণের নৈতিক, চারিত্রিক ও আদর্শিক শক্তি বৃদ্ধি করণের ব্যাপক ও পূর্ণাংগ ব্যবস্থা গ্রহণ,

(৩) আভ্যন্তরীণ শান্তি-নিরাপত্তা ও নিয়ম-শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধান,

(৪) জনগণকে বিদেশী ও বিপরীত আদর্শবাদের মুখে দুর্বিনীত, দুর্জয় ও অনমনীয় করিয়া তোলা এবং সেই সংগে উহার প্রতি শত্রু মনোভাবসম্পন্ন করিয়া গড়া,

(৫) দেশের সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সর্বোতভাবে গণমুখী, গণসমর্থনপুষ্ট এবং জনগণের প্রত্যক্ষ শরীকদারীর ভিত্তিতে মজবুত করিয়া তোলা,

(৬) বাস্তব ও বৈষয়িক শক্তির পূর্ণ সম্ভার সংগ্রহ করা এবং উহার যথাযথ ব্যবহারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ,

(৭) প্রতিরক্ষার জন্য নির্ভুল পরিকল্পনা গ্রহণ,

(৮) যুদ্ধবিদ্যা ও প্রতিরক্ষা কুশলতায় পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ ও দক্ষতা, বিচক্ষণতা অর্জন,

(৯) সেনাধ্যক্ষ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের উন্নত আদর্শ চরিত্র এবং মহৎ গুনাবলীর ধারক হওয়া,

(১০) প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত অনাক্রমণ ও বন্ধুতার চুক্তি করা—এরূপ সতর্কতার সহিত যে, এই বন্ধুতা যেন মিশ্রীর ছুরি না হয়,

এই মোট দশটি দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিকগুলিকে সামনে রাখিয়াই এক পূর্ণাংগ ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা রচনা করিতে ও তদানুযায়ী উহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

এখানে আমরা সংক্ষেপে এই কয়টি বিষয়ে ইসলামের পথ-নির্দেশ লাভ করিতে চেষ্টিত হইব।

মনোবল ও মানসিক শক্তি

প্রতিরক্ষার কথা চিন্তা করিলেই সাধারণভাবে সর্বপ্রথম সামরিক বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল সম্ভার, বৈষয়িক ও বাস্তব সাজ-সরঞ্জামের কথাই মনের পটে ভাসিয়া উঠে। মনে করা হয়, প্রতিরক্ষার জন্য কেবল মাত্র এইগুলিই

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়, এইগুলির ব্যবস্থা হইয়া গেলে অন্য কিছুর চিন্তাই করিতে হইবে না, আর এইগুলির ব্যবস্থা না হইলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমর-বিজ্ঞান-পারদর্শীদের মতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে জনগণের মনোবল ও মানসিক শক্তি, তাহার পর নৈতিক শক্তি এবং সর্বশেষে বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের শক্তি। তাহাদের মতে বস্তুগত শক্তির স্বল্পতার দরুন পরাজয়ের ঘটনা দুনিয়ার ইতিহাসে খুব কমই ঘটিয়াছে। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ হইয়া থাকে মূলতঃ মানসিক ও নৈতিক শক্তির অভাব বা দুর্বলতা। বিজয় লাভ ও শত্রু দমনের ব্যাপারেও ইহাই সত্য। মানসিক ও নৈতিক বলসম্পন্ন জাতিগুলি জয়ী হইয়া থাকে সেই সব জাতির উপর, যাহারা মানসিক ও নৈতিকতার দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল, যদিও উহার বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তির বিপুলতা বিরাজিত। মানুষের ইতিহাস—বিশেষ ভাবে ইসলামের ইতিহাস—ইহারই দৃষ্টান্তে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে।

মানসিক শক্তির দিক দিয়া ঐশ্বর্যবান জাতি পরাজয়ের মুখে দাঁড়াইয়াও বিজয়ের নিশান উড্ডীন করিতে সমর্থ হয়। শত্রুর বিজয়কে নিমিষে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারে উহার নিশ্চিত পরাজয়ে। ইসলাম প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় জয় ও পরাজয়ের ব্যাপার এই মানোবলের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কোরআন মজীদে ঘোষণা করা হইয়াছে :

و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين -

(آل عمران)

'তোমরা সাহসহীন হইও না, চিন্তা ভারাক্রান্ত হইও না, তোমরাই বিজয়ী ও উন্নত হইবে, যদি তোমরা ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হও।"

কোরআনের দৃষ্টিতে পরাজয় ও পরাভব মানসিক দুর্বলতার অনিবার্য ফল। ঘোষণা করা হইয়াছে :

ان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون - (الانفال)

www.pathagar.com

"তোমরা ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন একশতজন লোক হইলে কাফেরদের এক সহস্র ব্যক্তির উপর জয়ী হইতে পারিবে। কেননা কাফেরদের জ্ঞান-বুদ্ধি বলিতে কিছু নাই।"

কেবল সমর-ক্ষেত্র বা জরুরী অবস্থায়ই নয়, সাধারণ ও শান্তির সময়ও জনগণের এই মানসিক শক্তির গুরুত্বই অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে প্রতিনিয়ত জীবন্ত কোন আদর্শের ধারক লোকদের সহিত বুঝিতে হয়, সেখানে ইহার গুরুত্ব দ্বিগুণ তিন-গুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া যায়।

নৈতিক ও আদর্শিক শক্তি

সমর-পারদর্শীদের সিদ্ধান্ত এই যে, বস্তুগত শক্তি ও সাজ-সরঞ্জামের মোকাবিলায় নৈতিক শক্তি অধিক কার্যকর। চূড়ান্ত ফয়সালা উহারই ভিত্তিতে হইয়া থাকে। "অপারেশ্যান অব্ ওয়ার" গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছেঃ "যুদ্ধের ময়দানে সাফল্য লাভের জন্য সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে দৃঢ়সংকল্প, উন্নত নৈতিকতা, নিয়মানুবর্তিতা, ও শৃংখলাবদ্ধতা, বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, দৈহিক শক্তি এবং বিপদ-মুছীবত সহ্য করার গভীরতর সহিষ্ণুতা বর্তমান থাকা আবশ্যক। লড়াই'র ময়দানে নৈতিক শক্তির পরীক্ষাই হয় বারে বারে। আনন্দের সহিত হাসিমুখে বিপদের ঝুঁকি লওয়া শারীরিক শক্তি অপেক্ষা নৈতিক শক্তির উপর অধিক নির্ভরশীল।...প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সাফল্য নৈতিক অবস্থার ভাল কিংবা মন্দ হওয়ার উপর নির্ভর করে।"

প্রখ্যাত বিশ্বজয়ী নেপোলিয়ান বোনাপার্ট'র উক্তিও এখানে উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছিলেনঃ

"নৈতিক শক্তি দৈহিক শক্তির তুলনায় অন্ততঃ তিনগুণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

কোরআন মজীদ বারবার ঘোষণা করিয়াছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য নির্ভর করে ঈমান ও ছবর-এর উপর। কোরআন বলেঃ

ان يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين -

"উচচমানের ঈমানও ইয়াকীন এবং পরিপূর্ণ ছবর ও দৃঢ়তা যদি থাকে, তাহা হইলে দশগুণ শক্তির উপর বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হইবে"।

فان تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين - (الانفال)

"আর দুর্বল ঈমান ও ছবর লইয়া অন্ততঃ দ্বিগুণ শক্তির মোকাবিলা তো অতি সহজেই করিতে পারে।" ইসলামের ইতিহাস এই সত্যকেই উজ্জ্বল সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

www.pathagar.com

এই পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, যে শাসক শ্রেণী জাতির নৈতিক চরিত্রকে নানাভাবে বিনষ্ট করার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহারা সেই জাতির শুধু ভবিষ্যতকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করেনা, সেই দেশের প্রতিরক্ষা-কেও দুর্বল করিয়া দেয়।

ঐক্য ও শৃংখলা

নিয়ম-শৃংখলা ছাড়া সেনাবাহিনীর ধারণাই করা যায় না। সক্রেটিস বলিয়াছেন :

> "সেনাবাহিনীর জন্য নিয়ম-শৃংখলার সুষ্ঠুতা একান্তই জরুরী। শৃংখলাহীন ফৌজ মানুষের একটা ভীড় মাত্র। ইঁট, চুনা, সুর্কী, বালু ও অন্যান্য সামগ্রী যেমন আপনা হইতেই কোন ইমারত বানাইয়া দেয়না, অনুরূপ-ভাবে জনতার কোন ভীড়ও 'সেনাবাহিনী' নামে অভিহিত হইতে পারে না।"

বস্তুতঃ ফৌজ যতদূর সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হইবে, উহা ততদূরই শক্তি-শালী হইয়া উঠিবে। জাতির শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতাও অনুরূপ ব্যাপার। জাতি যদি সুসংগঠিত ও শৃংখলাবদ্ধ হয়, তবে দীর্ঘদিনের, মাসের ও বছরের লড়াই লড়াও সম্ভব হইতে পারে এবং নাজুক অবস্থার মোকাবিলা করাও সহজ হয়; কিন্তু যদি নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া জাতীয় জীবনে থাকে অনৈক্য, বিরোধ ও বিক্ষিপ্ততা, তাহা হইলে শুধু এই কারণেই গোটা জাতি পরাভূত হইতে পারে।

ইসলাম তাই জাতীয় জীবনে চরম ও পরম ঐক্য ও একাত্মতা সৃষ্টির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়াছে এবং অনৈক্য ও বিরোধকে পরাজয়ের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। কোরআন মজীদ বলিয়াছে :

يا يها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون - و اطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا ط ان الله مع الصبرين - (الانفال - ٨٥)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন শত্রুবাহিনীর মুখোমুখী হইবে তখন অবশ্যই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহকে খুব বেশী করিয়া স্মরণ করিবে, আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য মণ্ডিত হইবে। আর তোমরা আনু-

www.pathagar.com

গত্য করিবে আল্লাহর এবং তাঁহার রসূলের ; আর তোমরা পরস্পরে অনৈক্য ও ঝগড়া বিবাদে মশগুল হইবে না। তাহা যদি হও, তবে তোমরা ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া যাইবে, তোমাদের শক্তি ও উন্নতি হাওয়ায় উড়িয়া যাইবে। তোমরা অবশ্যই ধৈর্যধারণ করিবে, আল্লাহ এই ধৈর্যশীলদের সংগেই রহিয়াছেন।"

জিহাদী মনোভাব ও প্রকৃতি

ইহা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য সেনাবাহিনীর মধ্যে উদগ্র জিহাদী মনোভাব, যুদ্ধ প্রবণতা ও যুদ্ধবাদী মেজাজ-প্রকৃতি প্রবল হইয়া থাকা একান্তই আবশ্যক। সেই সংগে পূর্ণ নির্ভীকতা, অসীম সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্মদানের ভাবধারা, দক্ষতা, চাতুর্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা, শক্তি ও পৌরুষই এমন সব গুণ, যাহা ব্যতীত কোন জাতি বা সেনাবাহিনী শত্রুর মোকাবিলায় বিজয়-সাফল্য লাভ করিতে পারেনা। ভীরু, কাপুরুষ, আয়েশ-আরামপ্রিয়, অলস ও মৃত্যুভীরু লোকদের ভাগ্যে চিরদিন পরাজয়, অপমান, লাঞ্ছনা ও পরাধীনতাই লিখিত থাকে। কোরআনের ঘোষণা :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - (الانفال - ٧٢)

"নিশ্চয়ই যে সব লোক ঈমান আনিয়াছে, হিজরাত করিয়াছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে তাহাদের মাল ও জান দিয়া, আর যাহারা সহকর্মীদের আশ্রয় দিয়াছে, সাহায্য করিয়াছে, তাহারা পরস্পরের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক।....

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রাষ্ট্র কাঠামো

নৈতিক ও মানসিক শক্তির পর দেশের শক্তিবৃদ্ধি ও দৃঢ়তা লাভ নির্ভর করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া গঠিত সুষ্ঠু রাষ্ট্র কাঠামোর উপর, বিশেষভাবে জরুরী অবস্থায় এবং যুদ্ধ চলাকালে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক। জনৈক প্রখ্যাত ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা পারদর্শী বলেন :

"যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সরকারের উপর দেশবাসীর পরিপূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা, সমর্থন ও সহযোগিতা থাকা একান্তই আবশ্যক। কোন সরকার

www.pathagar.com

যখন যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করে, তখন তাহার দেশের অভ্যন্তরে এমন অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম-শৃংখলা চালু থাকা আবশ্যক; যেন দেশের অর্থব্যবস্থা সঠিক ও সুচারু রূপে চলিতে পারে এবং শত্রুর রাজনৈতিক মর্যাদা ও ব্যবসায়ী কর্তৃত্ব যেন উহার মুকাবিলায় খতম হইয়া যায়। (Direction of War)।"

যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মানুষ ধ্বংস হয়, সীমাহীন ও অপরিমেয় মূলধন, উপায়-উপাদান ও সাজ-সরঞ্জাম বিনষ্ট হয়। আর জনগণের জীবনে ইহার তীব্র প্রভাব পড়ে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় না হইলে এই সর্বাত্মক ক্ষতির আঘাত সহ্য করিয়া লওয়া সহজ হইতে পারেনা। এইরূপ অবস্থায় না যুদ্ধের জন্য মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে, না প্রয়োজনীয় রসদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম যথা সময়ে ও যথাস্থানে পৌঁছা সম্ভব হয়। ইহার অনিবার্য পরিণামে সেনাবাহিনী দুর্বল ও আস্থাহীন হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জনগণের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ এবং নৈরাশ্য ও হতাশা ছড়াইয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেও উদ্যত হইতে পারে। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে সফল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি

বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি বলিতে বুঝায় সেনাবাহিনী, যুদ্ধ সরঞ্জাম, রসদ, যানবাহন ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের উপায়-উপকরণ প্রভৃতি। জনৈক ইউরোপীয় সমর বিশেষজ্ঞ বলেন:

"বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক আজাদী এবং তামাদ্দুনিক ও সামাজিক জীবন নির্ভর করে এ অবস্থার উপর যে, জাতির নিকট যথেষ্ট সংখ্যক দৃঢ়, সুষ্ঠু, সুসংগঠিত, উচ্চতর প্রশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং আধুনিকতম যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনী বর্তমান আছে কি, নাই।"

"যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য যুদ্ধের অস্ত্র-সস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম এবং উপযুক্ত যান-বাহনের পুরাপুরি ব্যবস্থা থাকা একান্তই জরুরী।"
(Direction of War)

কোরআন মজীদে এ পর্যায়ে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে:

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

www.pathagar.com

عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم ج لا تعلمونهم ج الله يعلمهم ط وما تنفقوا من شئ في سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون * (الانفال - ٦٠)

—"আর তোমরা যতদূর তোমাদের সাধ্য-সামর্থে কুলায় বেশী বেশী শক্তি, দক্ষতা এবং সদা-প্রস্তুত 'ঘোড়া' তাহাদের (শত্রুদের) সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত রাখিবে, যেন উহার সাহায্যে আল্লাহ্‌র ও তোমাদের নিজদের শত্রুদিগকে এবং এমন সব শত্রুদিগকে—যাহাদিগকে তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ জানেন—ভীত সন্ত্রস্ত করিতে পার। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যাহাকিছু ব্যয় করিবে, তাহার পুরাপুরি প্রতিফল তোমাদিগকে আদায় করিয়া দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হইবে না।"

যুদ্ধে শত্রুর হামলা হইতে বাঁচাইতে পারে এমন সর্বপ্রকারের অস্ত্র-শস্ত্র, —তাহা যাহাই হউক না কেন—সংগ্রহ করা এবং উহা দ্বারা সেনাবাহিনীকে সদা-সজ্জিত ও প্রস্তুত রাখার-ই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এই আয়াতে।

নির্ভুল পরিকল্পনা

এই সব সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্র-শস্ত্রের বিপুল সম্ভার সবই নিরর্থক হইয়া যাইবে যদি ইহা সঠিক, সুষ্ঠু ও নির্ভুল পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করা না হয়। "প্রতিরক্ষা রাজনীতির" জনৈক বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন:

> "যুদ্ধে সুফল লাভ নির্ভর করে সেনাপতির পরিকল্পনা তৈয়ার করার উপর। কেননা যুদ্ধ কোন্ প্রতিরক্ষা নীতি অনুযায়ী চলিবে, সেজন্য কত সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন হইবে এবং যুদ্ধ-বিজ্ঞানের কোন্ সব নীতিকে কার্যকর করার সম্ভাবনা আছে, তাহা সেনাধৈক্ষ্যই ঠিক করিবে। পরিকল্পনার পূর্ণতা বিধানের জন্য কি সব প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী, প্রস্তুতির জন্য কতখানি সময় প্রয়োজন এবং সে কতটা সময় সেজন্য পাইবে, তাহাও তাহার-ই বিবেচ্য।"

প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ

ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামের-ই ভিত্তিতে স্থাপিত এবং ইসলামের বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্র বিধায় ইহার অধীন মু'মিন নাগরিক মাত্রই ইহার প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী। এই রাষ্ট্রের উপর যখনই কোন শত্রু-রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া বসিবে, তখনই সাধারণভাবে সব মুসলমানের প্রতি-ই আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ ঘোষিত হইবে:

www.pathagar.com

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ○ (البقرة)

"যেসব লোক তোমাদের উপর হামলা করিয়াছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, এই যুদ্ধ হইবে খোদার পথে।"

يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ○ (النساء)

"হে ঈমানদার লোকেরা, জিহাদের জন্য তোমরা অস্ত্র ধারণ কর এবং অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া কিংবা সকলেই একত্রে রওয়ানা হও ও ঝাঁপাইয়া পড়ে।"

শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা প্রতিরক্ষার দৃষ্টিতে অত্যন্ত জরুরী কাজ। এই পর্যায়ে নবী করীম (ছঃ) ইরশাদ করিয়াছেন:

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ○ (بخاري، مسلم)

—"আল্লাহ্‌র পথে একদিনকাল সীমান্ত পাহারা দেওয়া সমগ্র দুনিয়া ও উহার উপরে অবস্থিত সব জিনিস হইতেও উত্তম।"

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার গুরুত্ব এতবেশী এই কারণে যে, এখানে এই দেশরক্ষার সংগে সংগে দ্বীন-ইসলামের হেফাজতের প্রশ্নও জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আর এই কাজ সব মুসলমানেরই স্থায়ী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা এক সর্ববাদী সম্মত কথা। প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ ইমাম আলাউদ্দীন আবুবকর ইবনে মস্‌উদ আলকাসানী লিখিয়াছেন:

واما اذا عم النفير بان هجم العدو على بلد فهو فرض
عين يفترض على كل واحد من احاد المسلمين ممن هو قادر
عليه ○ (البدائع الصنائع - ج۷ ص۹۸)

"যখন ঘোষণা করা হইবে যে, শত্রু আক্রমণ করিয়াছে এবং জনগণকে উহাতে যোগদান করিবার জন্য সাধারণভাবে আহ্বান জানান হইবে, তখন যুদ্ধ করিতে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের-ই উহাতে যোগদান করা ফরজে-আইন হইয়া যায়।"

---

www.pathagar.com

ইসলামের পররাষ্ট্র নীতি

ইসলামের পররাষ্ট্র নীতির মূলকথা হইতেছে শান্তি এবং সন্ধি। কাজেই অন্য কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি করিলে তাহা যথাসম্ভব রক্ষা করিতেই প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতে হইবে। আল্লাহ বলিয়াছেন :

وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله

—"মুশ্‌রিকদের মধ্যে কেহ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তবে তাহাকে আশ্রয় দান কর—যেন সে খোদার কালাম শুনিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে।"

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه
هو السميع العليم - (الانفال - ٦١)

—"কাফের যদি সন্ধি করার জন্য নতি স্বীকার করে তবে তাহাদের এই নতি স্বীকারকে তুমি গ্রহণ কর এবং খোদার উপর পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন এবং সব জানেন।"

এই আয়াত দুইটি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিবাদমান দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে এক পক্ষ হইতে যখনই সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, অন্য পক্ষকে সেই প্রস্তাবে অবশ্যই রাজী হইতে হইবে, উপযুক্ত শর্তে সন্ধি ও চুক্তি করিয়া বিবাদ বিসম্বাদের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এবং যতদিন পর্যন্ত এই সন্ধি বর্তমান থাকিবে, ততদিনের মধ্যে উহার একটি ধারারও বিরোধিতা করা কোন ক্রমেই জায়েজ হইবে না। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহতায়ালা সন্ধি করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন এবং সেজন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم
إن الله يحب المتقين - (التوبة)

—"কিন্তু যে সব মুশরিকের সহিত তোমরা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছ, তাহার পর তাহারা তোমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে (তোমাদের কোন শত্রুকে) সাহায্যও করে নাই (তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও না)। তাহাদের সন্ধি শেষ মেয়াদ পর্যন্ত কায়েম রাখ। কারণ, সন্ধি ভংগ করার পাপ যাহারা ভয় করিয়া চলে, তাহাদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন।"

নবী মোস্তফা (ছঃ) তাঁহার নিজের জীবনেই সন্ধি রক্ষা করা এবং ওয়াদা পূর্ণ করার জলন্ত নিদর্শন বাস্তব রূপেই উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ হোদায়বিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সন্ধির কথাবার্তা হইতেছিল। চুক্তির একটি ধারায় স্বীকার করা হইয়াছিল যে,

من جاء المسلمين من قريش يردونه ومن جاء قريشا من
المسلمين لا يلزمون بردّه ○ (نور اليقين)

মক্কার লোক মুসলমান হইয়া মদীনায় চলিয়া আসিলে তাহাকে কাফেরদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; কিন্তু কোন মুসলমান কুরাইশদের নিকট ফিরিয়া গেলে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।" ঠিক সেই মুহূর্তে আবুজানদাল নামক মক্কার এক নওমুসলিম কাফের কর্তৃক আহত হইয়া সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইল এবং মুসলমানদের নিকট সাহায্য ও আশ্রয় চাহিল। তাহার মর্মান্তিক দুরাবস্থা দেখিয়া চৌদ্দশত অসি নিমিষে নিষ্কোষিত হইয়া ঝন ঝন করিয়া উঠিতে পারিত। আছহাবগণ ইহাকে সন্ধির এই ধারার অন্তর্ভুক্ত গণ্য না করিতে এবং কাফেরদের হস্তে তাহাকে সোপর্দ না করিতে হযরতের নিকট অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ওয়াদা পূর্ণ করা এবং সন্ধির প্রত্যেকটি ধারা রক্ষা করার পবিত্র শিক্ষা দান করার জন্য আসিয়াছিলেন যে মহামানুষ, তিনি তাহা করিতে মাত্রই রাজী হইলেন না। এই মাত্র যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার একটি ধারারও বিরোধিতা করা তিনি মারাত্মক অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন:

www.pathagar.com

اصبر واحتسب فان الله جاعل لك و لمن معك من المستضعفين

فرجا ومخرجا انا قد عقدنا بيننا القوم صلحا واعطيناهم واعطونا

على ذلك عهدا فلانغدر بهم هذا ○ (نور اليقين)

"হে আবুজানদাল! ধৈর্য ধারণ কর, সংযম ও সতর্কতার সহিত কাজ কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার ও তোমারই মত অন্যান্য দুর্বল মজবুর সংগীদের জন্য মুক্তির কোন পথ ও পন্থা করিয়া দিবেন। আমরা এই লোকদের সহিত সন্ধি করিয়াছি। তাহারা আমাদের নিকট উহা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, আর আমরাও দিয়াছি। অতএব এখন আমরা সন্ধিভংগ করিতে পারি না।"

এইরূপে অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত ইসলামী হুকুমাতের যদি সন্ধি থাকে এবং সেই রাষ্ট্র যদি উহার অধীনস্থ মুসলিম প্রজাদের উপর অত্যাচার নিষ্পেষণ ও পাইকারী ভাবে খুন-খারাবীর ষ্টীম রোলারও চালাইতে থাকে, তবুও সন্ধি বর্তমান থাকা পর্যন্ত ইসলামী হুকুমাতের পক্ষে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কিছুতেই সংগত নয়। এমন কি উহার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করাও জায়েজ হইবে না। যদি একান্তই সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে হয়; তবে প্রথমে স্পষ্ট ভাষায় সন্ধি ভংগ করার ঘোষণা দিতে হইবে। তাহার পর উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য "ডিপ্লোমেসি" অনুসারে মুখে মুখে সন্ধি ও অনাক্রমণের চুক্তি দৃঢ় করা আর গোপনে একের বা উভয়ের সৈন্য পরিচালনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম মুনাফেকী ছাড়া আর কিছুই নহে। ইসলাম এই মুনাফেকী ও পাশ্চাত্যের হীন "ডিপ্লোমেসী" মাত্রই সমর্থন করে না। কোরআন পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দিতেছে:

و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان

الله لا يحب الخائنين (الانفال)

"সন্ধি-চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির (বা রাষ্ট্রের) বিশ্বাসঘাতকতা করার সম্ভাবনা মনে করিলে উহার সন্ধি ফেরত দাও (চুক্তি ভাংগিয়া ফেল,) ফলে উভয়

www.pathagar.com

দলই সমান হইবে (উভয়ই জানিতে পারিবে যে, তাহাদের মধ্যে কোন সন্ধি নাই—একপক্ষ অন্যপক্ষের উপর যেকোন সময় আক্রমণ চালাইতে পারে)। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের মাত্রই ভালবাসেন না।"

হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ) বলিয়াছেন ঃ

"কোন জাতি (বা রাষ্ট্রের সহিত কাহারও সন্ধি থাকিলে উহার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহাতে কোন রদবদল করিবে না, বিশ্বাসভংগের ভয় হইলে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাহাকে চুক্তির শেষ হওয়ার নোটিশ দাও।"

বস্তুতঃ বিশ্বাসঘাতকতার কোন স্থান ইসলামে নাই, তাহা কাফেরদের সংগেও নয়। এমন কি, কোন কাফের জাতি বা রাষ্ট্রের সহিত যদি ইসলামী হুকুমাতের সন্ধি এবং অনাক্রমণের চুক্তি থাকে এবং এই সময় অন্য এক মুসলিম জাতি বা রাষ্ট্রের সংগে সেই কাফেরদের যুদ্ধ বাঁধে, এক্ষণে সেই মুসলমানগণ ইসলামী হুকুমাতের নিকট সাহায্য চাহিলে এবং সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বলিলে, সেই যুদ্ধে যোগদান করা ইসলামী হুকুমাতের পক্ষে মাত্রই জায়েজ নহে।

وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر الا على قوم
بينكم و بينهم ميثاق - و الله بما تعملون بصير O (الانفال)

—"কোন মুসলমান (জাতি বা রাষ্ট্র) তোমাদের নিকট দ্বীন ইসলাম রক্ষার জন্য যদি সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাহারা যদি তোমাদিগকে এমন এক জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে ডাকে, যাহাদের সহিত তোমাদের সন্ধি (অনাক্রমণ চুক্তি) আছে, (তবে তাহাদের সাহায্য করিতে গিয়া চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করিতে পারিবে না)। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম দেখিতে পাইতেছেন।"

ইসলাম তাহার সমস্ত পররাষ্ট্র-নীতির বুনিয়াদ স্থাপিত করিয়াছে ঈমানদারী, সততা, ন্যায়-পরতা, সত্যবাদিতা এবং ইনছাফের উপর। আর বর্তমান দুনিয়ার পররাষ্ট্রনীতি চলিতেছে নিছক ধোঁকা, প্রতারণা ও ফেরেববাজির উপর। ইসলাম তাহা চিরতরে খতম করিয়া দিয়া সততা, ন্যায়পরতা, বন্ধুতা ও সত্যাদর্শের ভিত্তিতে নূতন পররাষ্ট্র নীতি রচনা করিতে চায়। ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা এই যে, যাহা বলা হইবে, তাহা করিতে হইবে। ওয়াদা করিলে

www.pathagar.com

তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। ওয়াদা করিয়া পূর্ণ না করা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং বলা এক, করা আর এক, কিংবা করা এক, বলা আর এক—ইহা সবই ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইসলামী হুকুমাত উহার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদান কেবল নিজের জাতীয় স্বার্থের জন্যই ব্যয় করে না—যেমন করিয়া থাকে দুনিয়ায় জাতীয় রাষ্ট্রগুলি (National States)। ইসলামী হুকুমাত তাহার সম্পদ-সম্পত্তি নিযুক্ত করে দুনিয়ার সামগ্রিক স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং নিখিল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত। তেমনি সন্ধি ও সংগ্রামের ব্যাপারেও উহা কখনও ইসলাম নির্ধারিত সীমা লংঘন করে না। এই জন্যই ইসলাম কাহারও সহিত জিহাদ করিবার পূর্বে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাচাই করিয়া দেখে মুজাহিদীনকে—মুজাহিদগণ জাতীয় রাষ্ট্রের সৈনিকদের মত হিংস্র ও পশু প্রকৃতির হয় না—শুধু মারা এবং কাটা, খুন-খারাবী, ধর্ষণ, বলাৎকার আর লুঠতরাজ প্রভৃতি পাশবিক আচরণ তাহাদের দ্বারা কখনও অনুষ্ঠিত হয় না। বরং তাহারা দুর্দম সংগ্রামের সময়ও পরিপূর্ণ নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলে অটল গাম্ভীর্য ও অবিচল সংযম ও ধৈর্য সহকারে। অকারণ ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি করা ইসলামী জিহাদ নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই ইসলামী মুজাহিদীনের হাতে রক্তপাত খুবই কম হইয়া থাকে। শিশু, বৃদ্ধ ও বেসামরিক নর-নারীর উপর তাহাদের তরবারির আঘাত কখনও পড়ে না। লড়াইয়ের ময়দানে প্রবল উত্তেজনাময় পরিবেষ্টনীতেও একথা তাহারা আদৌ ভুলিয়া যায় না যে, প্রত্যেকটি গতিবিধি, প্রতিটি পদক্ষেপ এবং তরবারীর প্রত্যেকটি ঘূর্ণনের জন্য খোদার নিকট জওয়াবদিহি করিতে হইবে। এই জন্যই একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামের ইতিহাসে যত বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহার সব কয়টিকেই "রক্তপাতহীন বিপ্লব" (Bloodless Revolution) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

মানুষের রক্ত ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মানার্হ। বিনা কারণে মানুষের রক্তপাত কিছুতেই করা যায় না। সে কারণও কোন মানুষ নিজ ইচ্ছামত নির্ণয় করিতে পারে না; বরং তাহা ইসলামই ঠিক করিয়া দিয়াছে—কোন্ কারণে এবং কোন্ অবস্থায় এক ব্যক্তির রক্তপাত (কতটুকু পরিমাণে) করা সংগত! ইসলামের এই নির্ধারিত সীমা লংঘন করার অধিকার কাহারও নাই। এই প্রসংগে চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রাঃ) একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। লড়াইয়ের ময়দানে এক কাফের-শত্রুকে পরাজিত করিয়া হযরত আলী (রাঃ) তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। তাহাকে হত্যা করিবার জন্য তরবারি নিষ্কোষিত করিয়াছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে সেই সৈনিকটি

www.pathagar.com

হযরত আলীর মুখে থুথু নিক্ষেপ করিল। অমনি হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন—"আমি শুধু খোদার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই লড়াই করিতেছি—তোমাকে ঠিক সেই জন্যই হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিয়াছ, ইহাতে আমার মনে ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। এক্ষণে আমি যদি তোমাকে হত্যা করি তবে তাহা "খালেছ ভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে" হইবে না, তাহা নিছক ক্রোধ এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনা বশতঃই করা হইবে। কাজেই আমি তোমাকে হত্যা না করিয়া মুক্ত করিয়া দিলাম।"

কাফের শত্রু এই কথা শুনিয়া মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুনিয়ার ইতিহাসে যেমন এই ধরনের আচরণের কোন তুলনা নাই, তেমনি কাফের শত্রুটিও কোন দিন দেখে নাই শোনে নাই যে, প্রাণের শত্রুকে এইভাবে অস্ত্রের তলে পাইয়াও কেহ ছাড়িয়া দিতে পারে। এইরূপ অস্বাভাবিক আচরণ একমাত্র ইসলামী নীতি ও ইসলামী মুজাহিদদের দ্বারাই সম্ভব। ইসলামের এই মহীয়ান আদর্শ দেখিয়া সে তওবা করিল এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ইসলামে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য মানুষকে হত্যা করার রীতি একেবারেই নাই। হযরত নবীকরীম (ছঃ) কখনই নিজের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাহাকেও শাস্তি দেন নাই। বস্তুতঃ ইসলাম মানুষের মনে এমনি একনিষ্ঠা, স্বার্থহীনতা ও তাকওয়ার সৃষ্টি করে...ইসলামের যুদ্ধ-নীতি ইহাই। এই কারণেই ইসলামী মোজাহিদীন যখন কোন রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সে দেশের ধন-সম্পত্তি ও স্ত্রী লোকদের সতীত্ব সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, মুজাহিদগণ পার্থিব স্বার্থ লাভের কিংবা নিজেদের প্রবৃত্তির চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে কখনও যুদ্ধ করে না। তাহাদের মনে সব সময়ই খোদার সন্তোষ এবং পরকালের শান্তি লাভ একমাত্র লক্ষ্য রূপে জাগরূক থাকে।

ইসলামী জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে খোদার "দ্বীন"কে পরিপূর্ণ রূপে কায়েম করা, শিরক, বিদয়াত ও ইসলাম বিরোধী সমস্ত কার্যক্রম, আইন-কানুন ও রসম-রেওয়াজকে নিশ্চু-নাবুদ করিয়া দেওয়া এবং মানুষের উপর হইতে মানুষের প্রভুত্ব, মানুষের জুলুম নিষ্পেষণ সম্পূর্ণরূপে খতম করিয়া দিয়া এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও আইন বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন করিয়া অনাবিল শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করা। কারণ, মানুষের অশান্তি ও দুঃখ-দুর্ভোগ খোদার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ব্যাপার। তাহা দূর করিবার জন্য যুদ্ধ-সংগ্রাম এবং রক্তপাত করিতে হইলেও তাহাতে কিছুমাত্র

www.pathagar.com

আপত্তি থাকিতে পারে না। এই জন্যই আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ٥

—"বস্তুতঃ ফেতনা ফাসাদ, অশান্তি ও জুলুম নিষ্পেষণ সাময়িক যুদ্ধ সংগ্রাম ও রক্তপাত অপেক্ষা অনেক কঠিন এবং দুঃসহ"।

অতএব—

قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ٥ (الانفال)

—"ফেতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সহিত যুদ্ধ কর, যেন ফেতনা-ফাসাদ চিরতরে মিটিয়া যায় এবং যেন নিরংকুশভাবে একমাত্র খোদার দ্বীন ও রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব কায়েম হয়।"

মনে রাখিতে হইবে যে, ফেতনা দূর হওয়া এবং খোদার দ্বীনের রাষ্ট্র কায়েম হওয়াই ইসলামী জিহাদের শেষ লক্ষ্য। এই ফেতনা ও অশান্তি দূর করিবার জন্য যদি ফেতনাকারীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও পরাভূত না করা হয়, তবে সে অশান্তি এবং ফেতনা সমগ্র মানবতার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দেখা দিবে।

اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٥ (التوبه)

—"(ফেতনা দূর করিবার জন্য) যদি যুদ্ধ না কর তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিবে এবং বিরাট বিপর্যয় ও মহাভাংগনের সৃষ্টি হইবে।"

ইসলাম মুসলমানকে যুদ্ধ করিবার আদেশ কেন দিয়াছে এবং কোন্ কোন্ সময় কোন্ কোন্ অবস্থা ও কারণে অস্ত্র প্রয়োগের অনুমতি দিয়াছে, তাহার মূলনীতি উল্লিখিত আয়াত গুলি হইতে পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারা যায়।

সন্ধি ভংগ করা একটি মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ নাই। বিশ্বাসঘাতকতার পাপে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ঘটিতে থাকে। এই জন্য আল্লাহতায়ালা এই বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশ্বাসঘাতকদিগকে মাত্রই পছন্দ করেন না :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ। ফলতঃ বিশ্বাস ভংগকারীদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করণ এবং তাহাদের বিষদাঁত ভাংগিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাহাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

যুদ্ধ ঘোষণা না করাকে অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন:

الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم ○ (التوبه)

—"যে জাতি নিজেদের সন্ধি-চুক্তি এবং শপথ ভংগ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর না কোন্ কারণে?"

ঠিক তদ্রূপ মানুষের উপর যখন পাইকারী ভাবে জুলুম নিষ্পেষণ শুরু হয়, মানুষ যখন চরম দুঃখে আর্তনাদ করিয়া উঠে এবং জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তখন সেই জালেমদের হিংস্রতা ও পাশবিকতা দূর করিয়া সেই মানুষদিগকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও নির্মল শান্তিতে আশ্রয় দানের জন্য ও যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কোরআন মজীদে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে:

لم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال والنساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ○ (النساء)

—"তোমরা কেন জিহাদ কর না আল্লাহতায়ালার পথে এবং দুর্বল মানুষদের (ঈমান ও জীবন রক্ষার) জন্য;—তাহাদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রহিয়াছে; তাহারা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া) বলিয়া উঠিয়াছে: হে খোদা আমাদিগকে এই স্থান হইতে বাহির করিয়া এই দেশের অত্যাচারী শাসকদের জুলুম হইতে রক্ষা কর"।

অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যে সব কারণে জিহাদ ঘোষণা করা যায়, তন্মধ্যে উল্লিখিত কারণগুলি অন্যতম।

ইহার কোন একটি কারণ বশতঃ যদি কোন কাফের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে প্রধানতঃ দুইটি কারণে সেই যুদ্ধ ত্যাগ করিতে ইসলামী মুজাহিদগণ বাধ্য হয়। প্রথমতঃ কাফেরগণ যদি খালেছভাবে তওবা করে এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রকার অন্যায় জুলুম ও নিষ্পেষণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহারা আর "কাফের শত্রু" থাকিবেনা, বরং তখন তাহারা মুসলমানদের ভাই হইয়া যাইবে—তখন ইসলামের দেওয়া স্বাধীনতা ও যাবতীয় সুযোগ সুবিধা তাহারা সমানভাবে ভোগ করিতে পারিবে। কোরআন মজীদে বলা হইয়াছে:

فان تابوا و اقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين -

—"কিন্তু তাহারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনের ভাই।"

অন্যত্র বলিয়াছেন :

—"ফেত্না-ফাসাদ সৃষ্টি করা হইতে যদি তাহারা বিরত হয়, তবে কেবল অত্যাচারীদের ব্যতীত অন্য কাহারও উপর কোন আক্রমণ করা যাইতে পারে না"।

কিন্তু তাহারা যদি তওবা না করে, তবে তাহারা ইসলামী হুকুমাতের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ সেই দেশ সম্পূর্ণরূপে ইসলামী হুকুমাতের অধীন হইয়া যাইবে, সে দেশের উপর ইসলামী হুকুমাতেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু সেই যুদ্ধমান জাতি নিজেদের ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারিবে। ইসলামী হুকুমাত তাহাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণে জিজিয়া কর আদায় করিবে।

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون

ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ○ (التوبه)

—"আহলেকিতাবের মধ্যে যাহারা খোদা ও পরকালের প্রতি পূর্ণভাবে ঈমান স্থাপন করে নাই, আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহাকে যাহারা হারাম বলিয়া মনে করেনা এবং সত্য-দ্বীন (ইসলাম) কবুল ও পালন করেনা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে থাক—যতক্ষণ না তাহারা অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করিয়া অনুগত ও বাধ্য হয় এবং নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।"

ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিমগণ প্রজা হইয়া জীবন যাপন করিতে পারে। তাহাদের ধন-মান-প্রাণ এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কিছুরই রক্ষণা বেক্ষণেরপূর্ণ দায়িত্ব সেখানে ইসলামী হুকুমাতের উপর ন্যস্ত হইবে। কিন্তু যে সব অমুসলিম ইসলামী হুকুমাতের সহিত বিশেষ

www.pathagar.com

চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া উহার অধীনতা স্বীকার করে, তাহাদের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথম কথা এই যে, তাহাদিগকে 'জিজিয়া' দিতে বাধ্য করা যাইবে না তাহাদের ভোগ দখলি জমির 'খারাজ' দিতে তাহারা প্রস্তুত না হইলে তাহাদের নিকট হইতে অন্য কোন ট্যাকস আদায় করা যাইতে পারে। এমন কি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের আনুগত্য নির্ভরযোগ্য হইলে দেশরক্ষার ব্যাপারেও তাহাদের 'বিশেষ সাহায্য' গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইসলাম মাটির নেশা এবং দেশ জয়ের উগ্র লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়না। বরং কেবল মাত্র মানুষের যাবতীয় দুঃখ-দুর্ভোগ ও অশান্তি দূর করিয়া, মানুষের উপর হইতে মানুষের প্রভুত্ব ও আইন উচ্ছেদ করিয়া, পরিপূর্ণরূপে খোদার দ্বীন ও বিধানের হুকুমাত কায়েম করিবার উদ্দেশ্যেই প্রয়োজন মত যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলাম দিয়াছে। কাজেই এই পররাষ্ট্র নীতিকে সাম্রাজ্যবাদ বা পররাজ্য লোলুপতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না। মুসলিম মুজাহিদগণ যখন কোন দেশ আক্রমণ করে এবং জয় করে, তখন বুঝিতে হইবে সে দেশের ভাগ্যাকাশ হইতে দুঃখের ঘণঘটা অপসৃত হইয়া গিয়াছে, অপমান-লাঞ্ছনা, নির্যাতন-নিষ্পেষণ এবং শোষণ পীড়ণের ষ্টিম-রোলার তাহাদের বুকের উপর দিয়া আর চলিতে পারিবে না। তাহারা এক-এক দেশে প্রবেশ করে খোদার "রহমত" হইয়া—নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি এবং সত্যকার নিরাপত্তা ও আজাদীর অগ্রদূত হইয়া। সে দেশ ও দেশবাসীর ধন-প্রাণ মান-সম্ভ্রম ও সতীত্বের রক্ষক হইয়া—ভক্ষক হইয়া নয়।

কিন্তু আধুনিক কালের নৈতিকতাবিবর্জিত যুদ্ধনীতি এবং গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের ধ্বজাধারীদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ইহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। পরের দেশ আক্রমণ করার জন্য সেখানে কোন উপযুক্ত কারণের আবশ্যক হয় না, বরং যে-কোন কথার "ছুতা" দিয়া অনায়াসেই এক একটি দেশের উপর আসূরিক আক্রমণ চালানো হইয়া থাকে। তদুপরি আধুনিক কালের সৈন্যগণ আক্রান্ত দেশে প্রবেশ করে রক্ষক হইয়া নয়—সব কিছুর ভক্ষক ও ধ্বংসকারী হইয়া। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র "ট্যাংক" যেমন উদ্দাম হইয়া সম্মুখের দিকে ছোটে—গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল এবং ঘরবাড়ী সব কিছুই নিষ্পেষিত ও চুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, তেমনি আধুনিক কালের ধর্মহীন গণতন্ত্র কিংবা কমিউনিজমের ধ্বজাধারী চরিত্রহীন সৈন্যগণ যে দেশে প্রবেশ করে, সে দেশবাসীর সব কিছুই অতীব নির্মমভাবে ধ্বংস করিয়াই

www.pathagar.com

সকল দেশবাসীর প্রাণ হরণ করে, ধনমাল লুণ্ঠন করে, মানীর অপমান এবং পাশবিক বৃত্তির শিলাপেষণে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন সতীত্ব নষ্ট করে। সৈনিকদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য বেতন-করা বেশ্যাদের আমদানী করা হয় এবং জেনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতে বাঁচিবার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী ঠিক খাদ্য-রেশনের মতই সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এই ধরনের রাষ্ট্রের কর্তাগণ এক রকম সিদ্ধান্ত করিয়াই লইয়া থাকে যে, তাহাদের সৈনিকরা বিজিত রাজ্যে ঠিক ষাড় ও বলদের মতই প্রবেশ করিবে এবং সে দেশের বধূ-কন্যাদের উপর পাশবিক ধর্ষণ চালাইবে। আল্লাহতায়ালা এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে ঠিক কথাই বলিয়া দিয়াছেন :

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة
اهلها اذلة وكذلك يفعلون ○ (النمل)

—"ধর্মহীন রাষ্ট্রের কর্তা (ও সৈন্যগণ) যে রাজ্যে প্রবেশ করে, সে রাজ্যটিকে তাহারা একেবারে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং তথাকার সম্মানিত বাসিন্দাদিগকে (নানাভাবে) অপমানিত করে। তাহারা (নৈতিকতা-বিবর্জিত প্রত্যেক রাজা-বাদশাহ ও সৈন্যরাই) চিরদিন এইরূপ-ই করিয়া থাকে।"

ইহাদের সম্পর্কে আরও স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে নিম্নলিখিত আয়াতে :

واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث
والنسل والله لا يحب الفساد ○ (البقرة)

"এই শ্রেণীর লোক যখন কোন রাষ্ট্র অধিকার করিয়া লয় তখন তাহারা সে দেশে চরম অশান্তির সৃষ্টি করে, শস্য ও মানব-বংশ ধ্বংস করে, ইহা সবই অন্যায় ধ্বংসলীলা, আল্লাহ ইহা মাত্রই পছন্দ করেন না।"

কিন্তু ইসলামী সৈনিকদের মধ্যে ইহার ঠিক বিপরীত আদর্শ ও আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতের সময় ইসলামী ফৌজের মন, ঈমান ও চরিত্র নষ্ট করিবার জন্য বিজিত রাজ্যের অমুসলিম নারীরা বিশেষভাবে সজ্জিত ও মন-বিমোহিনী হইয়া

www.pathagar.com

সৈনিকদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছিল; কিন্তু ইসলামী ফৌজের প্রত্যেকটি সৈনিকের দৃষ্টি তখন অবনমিত ছিল—একটি চোখও তাহাদের প্রতি উত্তোলিত হয় নাই। এইভাবে ইসলামের আদর্শানুসারে যখন-ই এবং যত যুদ্ধ-ই হইয়াছে, কোনক্ষেত্রে-ই পাইকারী হারে মানুষ হত্যা করা হয় নাই, নারীদের সতীত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট করা হয় নাই, অমানুষিকভাবে লুঠতরাজ চালানো হয় নাই। ইসলামী মুজাহিদগণ দিনের বেলা যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব ও ঈমানী শক্তির বাস্তব পরিচয় প্রদান করে, আর নিশিথ রাত্রে জায়নামাজের উপর দাঁড়াইয়া, সিজ্‌দায় মস্তক ভু-লুণ্ঠিত করিয়া খোদার দাসত্ব ও আনুগত্য এবং খোদার নিকট আত্মোৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। ইসলামী পররাষ্ট্র নীতির অনন্য সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার ইহা অবিসম্বাদিত প্রমাণ।

---

www.pathagar.com

বিশ্বশান্তি ও ইসলামী রাজনীতি

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বর্তমান পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। যে গোঁজা-মিলের ভিতর দিয়া বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, গত বারো চৌদ্দ বৎসর[১] পর্যন্ত তাহার বিষ-বাষ্প বিন্দু বিন্দু করিয়া বিশ্বরাজনীতির গভীর তলদেশে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। সেই জমাটবাঁধা বিষ-বাষ্পে সামান্য অগ্নিস্ফুলিংগ স্পর্শে তাহা গলিত লাভাস্রোতের মত ছুটিয়া নামিতে শুরু করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জের মিটিতে না মিটিতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি-নিনাদ বিশ্বের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের প্রাণ, ধন-মাল, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সবকিছুই আজ এক কঠিন বিপদের সম্মুখীন। আজিকার মানুষের সম্মুখে তাই সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইতেছে মানুষকে কি করিয়া বাঁচানো যায়, কোন্ উপায়ে তৃতীয় মহাযুদ্ধকে ঠেকানো যাইতে পারে?

যুদ্ধ বাঁধিবার কারণ পৃথিবীতে আজ নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় নাই, ইহা অতীব প্রাচীন; তেমনি যুদ্ধকে ঠেকাইবার চিন্তা ও প্রচেষ্টাও আজিকার দুনিয়ায় কিছুমাত্র নূতন নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলিবার আবশ্যক নাই, ঐতিহাসিক যুগের মানুষেরা যুদ্ধকে রুখিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা এবং ব্যবস্থা চিরকাল-ই করিয়াছে। আজিও যুদ্ধ বাধে—বাধিবার কারণ এবং সম্ভাবনা বর্তমানে তীব্রতর হইয়া দেখা দিয়াছে। কাজেই আজিকার মানুষও তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাতে তাহারা সফলকাম হইতে পারিতেছে না—

(১) ইহা ১৯৫০-৫১ সনে লিখিত।

www.pathagar.com

প্রাচীনকালের মানুষও পারে নাই, আর আজিকার মানুষও সেই ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বস্তুতঃ যুদ্ধকে রুখিবার জন্য মানবীয় প্রচেষ্টার এই ধারাবাহিক ইতিহাস একটানা চরম ব্যর্থতার ইতিহাস। তাই যুদ্ধকে ঠেকাইবার উপায় কি—এ প্রশ্নের পূর্বেই আমাদের প্রশ্ন হইল যুদ্ধকে ঠেকাইবার কারণ নির্ধারণ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টার এই ঐতিহাসিক ব্যর্থতার মূলীভূত কারণ কি ?

যুদ্ধকে যদি বাস্তবিক ঠেকাইতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ বাধিবার মূল কারণকেই নির্মূল করিতে হইবে সর্বাগ্রে। মাটির ভিতরে ডিনামাইট স্থাপন করিয়া তাহার উপর যত দুর্ভেদ্য প্রাচীরই নির্মাণ করা হউক না কেন, যে কোন সময় তাহা ফাটিয়া সমগ্র প্রাচীরটিকেই ধূলিস্মাত করিয়া দিতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। দুনিয়ায় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিবার জন্য যতবার যত চেষ্টা-ই হইয়াছে তাহা সব-ই ঠিক এই কারণে চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধ বাধে কেন ? বারবার কেন দুনিয়ার এক একটি কেন্দ্র হইতে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সমগ্র পৃথিবীকে উহার লেলিহান শিখায় জ্বালাইয়া ভস্মা করে? গভীর দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিলে নিঃসন্দেহে জানিতে পারা যায় যে, প্রভুত্ব-লিপ্সা, স্বার্থ-পরতা এবং জাতীয় বিদ্বেষ—তথা উগ্র জাতীয়তাবাদই এক একটি দেশ ও জাতিকে যুদ্ধ বাধাইতে উদ্ধত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে যত যুদ্ধই সংঘটিত হইয়াছে প্রত্যেকটিরই মূলে রহিয়াছে এই কারণ। মানুষ মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য দুর্বল মানুষের ধন-মাল নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইবার জন্য রাজতন্ত্র ও ডিক্টেটরবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, গণতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ রচনা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু নীতির পর নীতি আর মতের পর মত বিরচিত হইলেও মানবতার প্রকৃত কল্যাণ এখনও সাধিত হয় নাই, মানুষের ভাগ্যে একবিন্দু শান্তি লাভ করা-ও অসম্ভবই থাকিয়া গিয়াছে। অথচ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণে-ই ছিল এই সব মত ও আদর্শের সার্থকতা। কিন্তু এই মতবাদের অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটির দরুন-ই মানুষ ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে আগাইয়া যাইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মানুষের রচিত সকল বিধানেই মানুষের প্রভুত্ব অধিকার বুনিয়াদ হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। আর বিশ্ব মানবতাকে গোত্র, জাতি, বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের বিভিন্ন

www.pathagar.com

সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাঁধিয়া দিয়া পুরাপুরিভাবে বিক্ষিপ্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বুনিয়াদের গভীর তলদেশে বৈষম্যের এই ফাটলকে উপেক্ষা করিয়া উহার উপর যত ইমারত-ই রচিত হইয়াছে, তাহা অচিরেই চূর্ণ হইয়া গিয়া কোটি কোটি মানুষকেও নিশ্চিহ্ন করিয়া ছাড়িয়াছে।

বিশ্ব-মানবতার এই মর্মান্তিক ইতিহাস জানিয়া লওয়ার পর নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, যেসব ব্যবস্থা মানব-প্রভুত্বের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে, তাহা হাজার চেষ্টা করিলেও মানুষের দুঃখ ও লাঞ্ছনা কোনদিন-ই ঘুচাইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই দৃষ্টিতে বর্তমান কালের গণতন্ত্র আর কমিউনিজমের গালভরা দাবীর যাচাই করিলেই যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি উহার অন্তঃসারশূন্যতা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে। বর্তমান কালের গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান ধ্বজাধারী আমেরিকা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া পৃথিবীর একটি বিরাট অংশ গ্রাস করিয়া লইয়াছে। পুঁজিবাদের জাল বিস্তার করিয়া সমগ্র দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ শুষিয়া লইতে উহার প্রাণ পণ চেষ্টার অন্ত নাই। আমেরিকা তথাকথিত অনুন্নত দেশ সমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য, সামরিক সাহায্যদান ও দেশ রক্ষামূলক আন্তর্জাতিক সংস্থার সুযোগ লইয়া এক নূতন সাম্রাজ্য জাল বিস্তার করিয়াছে। আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাবের সুযোগে একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইয়াছে। বস্তুতঃ আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সোনালী ভবিষ্যৎ রচনার গরজেই আমেরিকা বিগত যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমানেও সে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্ব বিস্তারের নেশায় কতগুলি পুচ্ছ রাষ্ট্রকে নিজের পক্ষে ভিড়াইয়া একটি স্বতন্ত্র ব্লক গঠন করিয়া লইয়াছে। তাই ভবিষ্যতে যে সে ব্যবসায় বাণিজ্যের এই সাম্রাজ্যবাদী জাল গুটাইয়া এবং প্রভুত্বের এই মারাত্মক নেশা পরিহার করিয়া বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইবে, এমন আশা করা নিতান্ত পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওদিকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াও নির্লিপ্তভাবে ক্রমশঃ তাহার সাম্রাজ্য-বাদী পক্ষপুটকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। রাশিয়ার নিকট সমাজতন্ত্রের একটি ব্যাপক বিপ্লবী আদর্শ বর্তমান ছিল। সমাজতন্ত্র যতদিন একটি আদর্শ হিসাবে প্রচারিত হইতেছিল, ততদিন উহার একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদাও বর্তমান ছিল। দুনিয়ার মজলুম মানবতা উহার প্রতি করুণনেত্রে তাকাইত একবিন্দু শান্তির আশায়। তখন একথা মনে করা গিয়াছিল যে, এই আদর্শ বুঝিবা দুনিয়ার চেহারা সত্যই পরিবর্তিত করিতে পারিবে। কিন্তু অনতিবিলম্বে

www.pathagar.com

ইহা যখন রাশিয়ার বুকে বাস্তব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং শেষ পর্যন্ত উহা অন্ধ জাতীয়তাবাদী রূপ পরিগ্রহ করিল, তখনই ইহা আন্তর্জাতিক মর্যাদা হারাইয়া একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা-মাত্রে পরিণত হইল। তাই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আজ মানবতার মুক্তি-দাতা না হইয়া দুর্বল ও মজলুম মানবতাকে এক কঠিন লৌহ নিগড়ে বন্দী করিবার একটি জিন্দানখানায় পর্যবসিত হইয়াছে। রাশিয়া এখন আর আদর্শবাদী নয়—রাশিয়া এখন পুরাপুরি সাম্রাজ্যবাদী। দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য অতর্কিতে এক ধ্বংসাত্মক বিপ্লবী কার্যক্রমের সাহায্যে পদানত করিয়া লওয়াই উহার এখনকার একমাত্র কাজ। আর ইহার জন্য আন্তর্জাতিক সহঅবস্থানের নীতির শ্লোগানকে অতি বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। মুখে 'রাম রাম' এবং ভিতরে দুর্বল জাতিগুলির বুকে বিষাক্ত মারণাস্ত্র বসাইয়া দেওয়াই উহার স্থায়ী নীতি।

রাশিয়ার বর্তমান পররাষ্ট্র নীতি আন্তর্জাতিক মানবতার কল্যাণ কামনার ভিত্তিতে রচিত নয়। উহার ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কারখানায়ই প্রস্তুত হয়। ফেলিস্তিন ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য সমস্যাই ইহার জলন্ত প্রমাণ। হাংগেরী ও কোরিয়ায়ও আমরা রাশিয়ার এই একই রূপ-ই দেখিতে পাই। এই সকল ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী আমেরিকা যে সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র নীতি প্রয়োগ করিয়াছে, রাশিয়াও ঠিক সমানভাবে অনুরূপ নীতির-ই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কোথায়ও সে নিজেকে আদর্শবাদী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে নাই।[১] বস্তুতঃ বর্তমানে তাহা প্রমাণ করিবার কোন ইচ্ছাও তাহার নাই। তাহার অধীনস্থ কতগুলি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র লইয়া সে আমেরিকার ন্যায় স্বতন্ত্র ব্লক রচনা করিয়াছে। ইউরোপ ও এশিয়াকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার লোভাতুর জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া উঠিয়াছে। এদিকে এশিয়ার নবোদিত রাষ্ট্র কমিউনিষ্ট চীনের ভূমিকাও অনুরূপ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের বাণী প্রচার ও দেশে দেশে উহার নিযুক্ত এজেন্টদের দ্বারা রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটান-ই উহার স্থায়ী নীতি।

এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে এতটুকু আমরা বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র—এর কোনটিই আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। আর ভবিষ্যতেও ইহাদের কোনটি-ই নিছক মতবাদ

(১) রাশিয়া একদিকে এ্যাংলো ফ্রান্সের মিশর আক্রমণকে সাম্রাজ্যবাদী আখ্যা দেয়, আর অপর দিকে নিজেই হাংগেরীতে অমানুষিক সাম্রাজ্যবাদী জুলুম নিষ্পেষণ চালায়, ইহাই হইতেছে রাশিয়ার আদর্শবাদের নির্লজ্জ নমুনা।

www.pathagar.com

ও আদর্শ হিসাবেও আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইতে পারে না। আর ইহার কোনটিই বর্তমান বিশ্ব সমাজের উপযোগী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও নহে।

ইসলামী রাজনীতির আন্তর্জাতিকতা

গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের এই ব্যর্থতার ইতিহাস-ই প্রমাণ করে যে, মানুষের প্রভুত্বমূলক কোন ব্যবস্থা-ই মানুষকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব চাই এমন এক ব্যবস্থা যাহা মানুষের রচিত নয়—মানুষের প্রভুত্বও যাহাতে আদৌ স্বীকৃত নয়। যাহা মানবাতীত কোন সত্তার প্রদত্ত। যে সত্তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার নিখিল মানুষ সমান। বস্তুত এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই একাধারে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক—প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের জন্য পরিপূর্ণ বিধান পেশ করে এবং তাহা দুনিয়ার সকল দেশের, সকল জাতির এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে মানবতার মহান ভিত্তিতে একত্রিত করিতে সক্ষম।

ইস্‌লাম বিশ্ব-মানবের সম্মুখে দুইটি বিপ্লবী পয়গাম উপস্থাপিত করিয়াছে, যাহা অন্য কোন মানবীয় ব্যবস্থা উপস্থিত করিতে পারে নাই: প্রথমতঃ নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এক, এবং অদ্বিতীয়। প্রভুত্ব এবং আইন রচনার অধিকার কোন মানুষের নহে, তাহা সব-ই নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র। দ্বিতীয়তঃ নিখিল মানুষ এক—একই বংশোদ্ভূত; বংশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক আঞ্চলিকতার কোন প্রাচীর তুলিয়া মানবতাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অন্যান্য দোষত্রুটি ব্যতিরেকেই "মেজরিটি" আর "মাইনরিটি"র নামে যে ব্যবস্থাটি উহাতে রহিয়াছে, তাহাও অত্যন্ত মারাত্মক; তাহাই মানুষকে মানুষের গোলাম বানাইবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। আর তাহাই অতীতের জাতিসংঘ (Leage of Nations) এবং বর্তমান নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যর্থ করিয়াছে।

বর্তমান জাতিসংঘ রচনায় আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান ও জাতীয়তাবাদী চীন এই বৃহৎ পঞ্চশক্তি সম্মিলিত জাতিগুলির মধ্যে অগ্রণী ছিল। কিন্তু শান্তি, মানবতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে যে জাতিসংঘের সৃষ্টি, আজ তাহা সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্রীড়নক মাত্র। সাম্রাজ্যবাদী ও পররাজ্য গ্রাসী দেশগুলির গ্রাস হইতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা-ই বর্তমান জাতিসংঘের নাই। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম

www.pathagar.com

দেশগুলির বক্ষকেন্দ্রে ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টি এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির-ই অমানুষিক ছুরিকাঘাত। ইহাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য, বাস্তব সহযোগিতা ও স্পষ্ট নির্দেশে উহা মুসলিম দেশগুলির উপর অতর্কিত হামলা চালায় ও মুসলমানদের পবিত্র ভূমি দখল করিয়া নেয়, লক্ষ লক্ষ নিরীহ মুসলিম জনতা নারী, শিশু, বৃদ্ধ নিজেদের আবহমানকালের ঘর-বাড়ী ও জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হয়। অত্যাচার-উৎপীড়ন, ইজ্জত-আবরু বিনাশন এবং নির্বিচার নরহত্যার ষ্টীমরোলার চালায়, আর 'গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী' তথা মানবতার বন্ধু এইসব সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরেরা নির্বাক ও নির্লিপ্ত হইয়া বসিয়া থাকে। বস্তুতঃ বিশ্ব-শান্তি সম্পর্কে চরম নৈরাশ্যের এতদাপেক্ষা মারাত্মক অবস্থা আর কিছুই হইতে পারেনা।

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইল শ্রেণী সংগ্রাম। প্রথমটি "কম" আর "বেশীর" মধ্যে বিরোধের পথ খাড়া করিয়াছে, আর দ্বিতীয়টি মজুর ও বুর্জোয়ার পারস্পরিক বিদ্বেষ মানুষকে এক চিরন্তন সংগ্রামে জড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ইসলামের উল্লিখিত দুইটি মূলনীতিই সমাজতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রতারণার আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদ নির্মূল করিয়া ছাড়িয়াছে। প্রথমতঃ ইসলামে মানুষের কোন প্রভুত্ব ও আইন রচনার নিরংকুশ অধিকার-ই স্বীকৃত নয়। কাজেই 'মেজরটি'ও 'মাইনরিটি'র আওয়াজ এখানে সম্পূর্ণ অর্থহীন। দ্বিতীয়তঃ খোদার দৃষ্টিতে ধনী গরীব তথা মজুর বুর্জোয়া সবাই সমান—সমান ভাবে তাঁহার-ই সৃষ্ট এবং দাস। কেহ কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না, কেহ কাহাকেও শোষণ এবং নির্দিষ্ট হক হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

বস্তুতঃ এই মৌলিক দাওয়াতের ভিত্তিতেই ইসলাম আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করিতে চায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হইলে শুধু যে বর্তমান সমস্যার সমাধান হইবে তাহাই নয়, সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতেও কোন সমস্যা যাহাতে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বিশ্বশান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে ইহা তাহারও ব্যবস্থা করিবে। আজিকার যাবতীয় সমস্যা বর্তমানের ভুল নীতি ও মতবাদ গুলিরই সৃষ্টি। কাজেই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হইলে একে একে ইহা সবই দূরীভূত হইতে বাধ্য হইবে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের এই পয়গাম পক্ষপাতহীন জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডির উর্ধে, সম্পূর্ণ ও সার্বজনীন আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। তাই ইহা যেমন দুনিয়ার "মুসলিম জাতির" কোন

www.pathagar.com

জাতীয় রাষ্ট্র (National State) প্রতিষ্ঠিত করিবে না, তেমনই কোন মুসলিম জাতিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ দিয়া সাম্রাজ্যবাদেরও সমর্থন করিবে না। বর্তমান মুসলিম (ইসলামী নয়) রাষ্ট্রগুলির প্রতিও উহার বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব থাকিবে না। তুরস্কের মুসলিম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র, মিশর, ইরান, ইরাক, আরব প্রভৃতি রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র আর আমেরিকার গণতন্ত্রী এবং রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র ইসলামী রাজনীতির দৃষ্টিতে সমানভাবে "ভ্রষ্ট" ও "অভিশপ্ত।" তাই ইসলামী রাজনীতির আদর্শের আঘাত এই সকল শ্রেণীর রাষ্ট্রের উপরই সমানভাবে অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া পড়ে। কেননা ইসলাম সকল প্রকার ধর্মহীনতা ও জাতীয়তার উর্ধে থাকিয়া সামগ্রিকভাবে গোটা মানবতাকে আহ্বান জানায় এই বলিয়া :

تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله

ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباما من دون الله *

—"হে মানুষ! আস এমন একটি বুনিয়াদী নীতি আমরা সকলে মিলিয়া গ্রহণ করি, যাহা তোমাদের ও আমাদের (সকল মানুষের) মধ্যে সর্বোতভাবে সমান—সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য (এবং সকলের জন্যই) ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠাতা। তাহা এই যে, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিবনা—আল্লাহ ছাড়া কাহারও দাসত্ব করিবনা, তাঁহার প্রভুত্বের সহিত অন্য কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া অংশীবাদী হইব না। এবং আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমরা নিজেরা পরস্পর পরস্পরকেও "প্রভু" বলিয়া স্বীকার করিব না।"

একটু চিন্তা করিলেই এই আয়াতের সুস্পষ্ট বিপ্লবী ঘোষণার অন্তর্নিহিত ভাবধারা অনুধাবন করা যায়।

ইসলামের এই বাণীর পরে রাশিয়া-আমেরিকা বা মুসলিম নামধারী ধর্মহীন গণতন্ত্রী আর রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির কর্নধারদের প্রভুত্ব বিস্তারের কোন অধিকার থাকিতে পারেনা। ইসলামের তওহিদী রাজনীতি ইহাদের কোন একটিকেও সমর্থন করিতে পারে না, কোনটির সংগে যোগসাজসও করিতে পারে না। বস্তুতঃ দুনিয়ার অসংখ্য মতবাদের মধ্যে ইসলাম একটি অন্যতম মত মাত্র নয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে একটি তৃতীয় মত।

www.pathagar.com

অন্যান্য যাবতীয় ভ্রান্ত মতাদর্শ হয় "ভ্রান্ত"—নয় "অভিশপ্ত"। তাই ইসলামী রাজনীতি বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহার পথ উল্লিখিত উভয় প্রকার মত ও পথের মাঝখান দিয়া সম্মুখে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পথ 'সিরাতুলমুস্তাকীম'—যে পথ সত্যিকারভাবে মানবতার কল্যাণের পথ। কাজেই বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষ কোন শিবিরে যোগদান করিতে পারে না। বরং উহা সমগ্র বিবাদ-মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সৃষ্টি করিবে তৃতীয় আদর্শের ভিত্তিতে একটি তৃতীয় শিবির।

অতএব ইসলামের এই প্রথম বিপ্লবী বাণী যাহারা গ্রহণ করিবে না, তাহাদিগকে উহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিবে: আমি তোমাদের পক্ষে নহি —আর তোমাদিগকেও আমি সমর্থন করি না। আমার পথ-ই যদি তোমরা গ্রহণ ও অনুসরণ না কর, তবে জানিয়া রাখ, আমি আমার আদর্শকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবই, ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প।

فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

---

www.pathagar.com

বিশ্ব-রাষ্ট্র

বিশ্ব-রাষ্ট্রের গুরুত্ব

বিশ্ব-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও উহার অপরিহার্যতা সম্পর্কে রাজনীতি সচেতন জন-মনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদগ্ধ সমাজের সর্বত্রই উহার আলোচনা পর্যালোচনা শ্রুতিগোচর হয়। কোন কোন দার্শনিক আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিশ্ব-রাষ্ট্রের কর্তব্য, দায়িত্ব ও গঠন-পদ্ধতি পর্যন্ত জনসমক্ষে পেশ করিয়াছেন এবং জনগণকে সে জন্য অনতিবিলম্বে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। এই পর্যায়ে বৃটিশ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাসেল এক রেডিও বক্তৃতায় বলিয়াছেন: জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সমূহের সীমাহীন ও নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব খতম করিতে না পারিলে বিশ্ব-মানবতার ভাগ্য-লিপি রক্তলিখনে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইতে কোন বাধাই থাকিবে না। তাঁহার মতে কেবলমাত্র বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দ্বারাই বিশ্ব-মানবতাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ মানব-গোষ্ঠির সম্মুখে এখন দুইটি মাত্র পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে: হয় চূড়ান্ত ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইবে; অন্যথায় বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপন-প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিতে হইবে। বিশ্ব-সভ্যতার অপূর্ব অবদান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল বিচিত্র দ্রব্য সম্ভার, সাংস্কৃতিক মূল্যমান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য—এক কথায় গোটা মানব-সভ্যতা ও মানুষের বংশকে নিশ্চিহ্ন-নির্মূল হইয়া যাওয়ার মর্মান্তিক পরিণতি হইতে রক্ষা করার এতদ্ব্যতীত তৃতীয় কোন পন্থা-ই থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাবোধ কেবল বৃটিশ দার্শনিক রাসেল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে, দুনিয়ার অন্যান্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণও আজ বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপনের অপরিহার্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন

www.pathagar.com

এবং এতদ্ব্যতীত মানবতাকে আসন্ন ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করা যাইবে না বলিয়া প্রত্যেকেই প্রত্যয় বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই বিশ্বাস ও অনুভূতি যে সত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু নীতিগত ও দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনুভূত হইলেও উহার বাস্তবায়নের উপায় ও কার্যকর পন্থা কি হইতে পারে সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বিশ্বের দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ কিছুমাত্র আলোকপাত করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত বিশ্ব-রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার, ক্ষমতা এবং উহার আবশ্যকতা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা-ই বলিতে সক্ষম হইয়াছেন; কিন্তু উহার বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা এবং উহার দার্শনিক ও আদর্শিক বুনিয়াদ কি হইতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন তথ্য উপস্থাপিত করা আজ পর্যন্ত কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। তবে দার্শনিক রাসেল এই পর্যায়ে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন বাস্তবতা ও দার্শনিক মূল্যমানের দিক দিয়া উহার যথার্থতা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক, বর্তমান পর্যায়ে আমরা সেই আলোচনাই পেশ করিতে চাই।

রাসেলের প্রস্তাব

রাসেলের মতে বিশ্ব-রাষ্ট্রের সংগঠন 'ফেডারেল' পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাহার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া বিশ্ব-রাষ্ট্র-সংস্থায় অতি সহজেই যোগদান করিতে পারিবে ও একান্ত নিজস্ব ব্যাপার সমূহ স্বকীয় বিশেষ দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী স্বাধীনভাবে সুসম্পন্ন করার অবাধ সুযোগ লাভ করিবে। কেননা এইরূপ সুযোগ না থাকিলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জোরপূর্বক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য-স্থাপনের প্রচেষ্টা কোন সুফল দান করিতে পারে না। বরং তাহার ফলে জাতি সমূহের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া ও বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নজাল নিমিষে ছিন্ন হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা-ই অধিক। তাঁহার দৃষ্টিতে বিশ্ব-ফেডারেল সরকার পশ্চিমি রাষ্ট্র পুঞ্জ, রুশ-শিবিরের অধীন রাষ্ট্রসমূহ ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক। এইভাবে যে বিশ্ব-ফেডারেশন গড়িয়া উঠিবে,—রাসেল মনে করেন—তাহা হইতেই বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হইবে।

একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিশ্ব-রাষ্ট্রের প্রাসাদ রচনার জন্য রাসেলের উপরোক্ত পরিকল্পনা বিদগ্ধ সমাজে কিছুমাত্র নূতন নহে। বর্তমান সময় পশ্চিমি শিবির, রুশ শিবির ও যুক্তরাষ্ট্র যে স্বতন্ত্র

www.pathagar.com

আদর্শিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহা পরস্পর সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও রাসেল উহাকেই সত্য ও সঠিক—অন্ততঃ সহনযোগ্য বলিয়া স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত শিবির সমূহের ভিত্তিগত মত ও নীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল প্রত্যেক ব্যক্তিই এই পরিকল্পনার অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই অনুধাবন করিতে পারেন। উপরোক্ত শিবির সমূহের আদর্শগত মতপার্থক্য ও তদুদ্ভূত প্রবল স্বার্থ-সংঘাতের কথা সর্বজন বিদিত। বিশেষতঃ রুশ ও আমেরিকান শিবিরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম প্রত্যেকটি মানুষের অধিগত। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ। জাতিসংঘের কার্য পরিচালনা এবং মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ব্যাপারে তাহা বারবার পরিলক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, বর্তমানের বিভিন্ন শিবিরের আদর্শিক বুনিয়াদ পারস্পরিক বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ প্রতিরোধ করিয়া সুষ্ঠুস্থৈর্য ও নিরাপত্তা স্থাপন করিতে সমর্থ নহে।

শুধু তাহাই নয়, শিবির সমূহের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশ ও অঞ্চলের মধ্যে যে তীব্র সংঘর্ষ, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ও প্রবল টানা-হেঁচড়া বিদ্যমান, উক্ত বুনিয়াদে তাহারও উপশম করা অসম্ভব; মার্কিন-শিবিরের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। উহার অধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ কোন দিক দিয়াই এক ও অভিন্ন নহে। আমেরিকার বিভিন্ন জাতির স্বার্থ দ্বন্দ্ব ও ঝোঁক-প্রবণতার সাংঘর্ষিক রূপ সাংঘাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে। সুয়েজ খালের উপর বৃটিশ ও ফ্রান্সের সম্মিলিত হামলা বৃটিশ, ফ্রান্স এবং আমেরিকার পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সংঘর্ষের কথা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।[১] পরন্তু সুয়েজ এলাকা হইতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যপসরণের ব্যাপারে বৃটিশ-আচরণ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের অন্তর্নিহিত স্বার্থ-সংঘাতকে প্রকট

(১) এই সংগে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলের সর্বধ্বংসী রূপও প্রণিধান যোগ্য। ইসরাঈল রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদীদের কূট সাম্রাজ্যনীতির ফলে। এই ষড়যন্ত্রে যেমন রহিয়াছে এ্যাংলো আমেরিকান শিবির—এই ব্যাপারে আমেরিকার ইয়াহুদী তোষণ নীতিই বরং প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই রাশিয়াও ইহার সহিত যুক্ত রহিয়াছে পুরাপুরিভাবে। মুসলিম দেশগুলির উপর ইসরাঈলের সাম্প্রতিক হামলায় এই সব কয়টি রাষ্ট্রের-ই প্রত্যক্ষ সংযোগ অত্যন্ত প্রকট। ইসরাঈল কর্তৃক অধিকৃত পবিত্র আরব ভূমি হইতে ইসরাঈলী সৈন্যাপসরণ ব্যাপার লইয়া রুশ আমেরিকার ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইহাদের কোন একটি রাষ্ট্রই ক্ষুদ্রশক্তি মুসলিম দেশগুলির বন্ধু নয়। ছলচাতুরী ও কলা কৌশল এবং বন্ধুতার ফাঁকা বুলির সাহায্যে এই দেশগুলিকে পদানত করিয়া রাখা এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় দখল করিয়া লওয়াই এইসব কয়টি রাষ্ট্রের নীতি।

www.pathagar.com

করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ জাতীয় স্বার্থের এই সংঘাত সংঘর্ষের ফলে পশ্চিমি শিবিরের ঐক্য-প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। কেবলমাত্র রুশ শিবিরের হামলার আতংক ও বিভীষিকাই তাহাদিগকে—আন্তরিক সদিচ্ছা সহৃদয়তার নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও সুস্পষ্ট গোজামিলের ভিতর দিয়া—পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশ্চিমি শিবিরের নিকট কোন অস্তিবাচক সক্রিয় ও জীবন্ত ঐক্য ভিত্তি বর্তমান নাই।

রুশ-শিবিরের অবস্থাও স্বতন্ত্র কিছু নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মধ্যে সেখানেও চরম দ্বন্দ্ব ও হিংসা বিদ্বেষ এবং সর্বোপরি ক্ষমতা প্রভুত্বের অমানুষিক টানাহেঁচড়া বিদ্যমান। হাংগেরীর ঐতিহাসিক বিদ্রোহ-বিপ্লব নাগীর বর্বর হত্যাকাণ্ড, টিটোর বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান ও পোলাণ্ডের সহিত মনকষাকষি এই শিবিরের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথাই প্রমাণ করে।

কমনওয়েলথ-এর অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা লাভের জন্য প্রথমেই একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উহা বিভিন্ন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি ঐক্য-জোট মাত্র। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই যেকোন সময় উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অবাধ অধিকার স্বীকৃত। তদুপরি এই রাষ্ট্র সমূহের পরস্পরের মধ্যে রহিয়াছে জাতীয় স্বার্থের বৈষম্য সংঘর্ষ ও প্রবলতম স্নায়ুযুদ্ধ। বিদগ্ধ সমাজ উহার অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে নিঃসংশয়। সুয়েজ খালের উপর বৃটিশ-হামলার প্রতিক্রিয়ায় ভারত, সিংহল ও বর্মা প্রভৃতি কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্র সমূহের ভূমিকা বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, কোন অস্তিবাচক ভিত্তিই ইহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করে নাই; ইহা বৃটিশের কূটনীতি ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত জালেরই অবদান মাত্র।

এই আলোচনা হইতে একথা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, মিঃ রাসেল বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে অন্তঃসারশূন্য ও বাস্তবতার আঘাতে নিঃশেষে মহাশূন্যে মিলাইয়া যাইতে বাধ্য।

সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তি

মানব জীবনের জটিল তত্ত্ব-রহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই একথা ভাল করিয়া জানেন যে, মূলতঃ কয়েকটি সাংস্কৃতিক মূল্যমান ও আদর্শগত মতবাদের উপরই এক একটি রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্ত স্থাপিত হইয়া থাকে। তামাদ্দুনিক বুনিয়াদ ও আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বিবর্জিত কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। একজাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জাতীয়তাবাদী জীবন-

www.pathagar.com

দর্শন, উহা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসিদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখে, পারস্পরিক বিরোধ ও পার্থক্য দূরীভূত করে এবং অপরাপর জাতি হইতে উহাদিগকে সর্বোতভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থাও অনুরূপ। শ্রেণী পার্থক্যই উহার চৈন্তিক ভিত্তি; একটি বিশেষ শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখা ও উহাকে অন্যান্য শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত করা-ই উহার একমাত্র লক্ষ্য।

চিন্তা ও মতাদর্শের উল্লিখিত ভিত্তি সমূহের গভীরতর যাচাই করিলে একথা প্রমাণিত হয় যে, উহা মানুষের ক্ষুদ্র একটি অংশকে কিংবা বেশী সংখ্যক লোককে বিশেষ একটি দিক দিয়া একত্রিত ও সংযোজিত করিতে সমর্থ হইলেও সমগ্র মানুষকে সমগ্র দিক দিয়া ও সর্বোতভাবে একই বুনিয়াদে মিলিত করিতে পারে না। কেননা উহাদের প্রত্যেকটিরই স্বভাব হইতেছে বিরাট মানবতাকে ছিন্নভিন্ন ও টুকরা টুকরা করা। বৃটিশ জাতীয়তায় বিশ্বাসী ব্যক্তি আমেরিকার বিশ্বস্ত নাগরিক হইতে পারে না, কেননা তাহার জন্ম আমেরিকায় সংঘটিত হয় নাই। সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিতে পুঁজিদার মাত্রই হত্যার যোগ্য। কৃষ্ণাংগ শ্বেতাংগের পার্থক্য পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি প্রকাশ্য দুশমণে পরিণত করিয়াছে। আর্যের নিকট দ্রাবিড় ঘৃণার্হ; কেননা উহার জন্ম হইয়াছে অত্যন্ত নীচ বংশে। ভাষা-পার্থক্যও বিভিন্ন ভাষা-ভাষিকে পরস্পরের প্রতি বানাইয়া দিয়াছে রক্তের পিপাসু। এই সব তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে বৈষয়িক ও বস্তুনিষ্ঠ পার্থক্য-বুনিয়াদ গোটা মানব সমাজকে কোন ক্রমেই ঐক্যবদ্ধ করিয়া দিতে পারে না।

বিশ্ব-রাষ্ট্রের বুনিয়াদ

অতএব এ ধরনের মতাদর্শের ভিত্তিতে কোন বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠন করা কিছুমাত্র সম্ভব নহে। কোন শক্ত, সমাহিত ও সুদৃঢ় ভিত্তি ব্যতীত যেমন কোন প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব হয় না, আলোচিত মতবাদ সমূহের কোন একটির ভিত্তিতে বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপন করা-ও অনুরূপভাবে কল্পনাতীত। বস্তুতঃ বিশ্ব-রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হইতে হইবে কোন সর্বাত্মক মতাদর্শ ও সামগ্রিক তামাদ্দুনিক মূল্যমান। অন্যথায় তাহা পর্ণকুটিরের কাঁচা ভীতের উপর 'লাল কেল্লা' নির্মাণের মতই হইবে চরম হাস্যকর। এবং লালকেল্লা নির্মাণ তো সম্ভবই হইবে না, পর্ণকুটিরের শেষ চিহ্নটুকুও ধূলির পৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে। কিন্তু বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী কোন

www.pathagar.com

সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় ব্যাপক মূলনীতি বিশ্বের মানব-সমাজের নিকট সত্যই কিছু আছে কি? ....বিদগ্ধ সমাজের সম্মুখে আজ এই জিজ্ঞাসা-ই তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে।

এই জিজ্ঞাসার উত্তর সুস্পষ্ট। বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র সুষ্ঠু বুনিয়াদ তাহাই হইতে পারে, যাহা রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের চিরন্তন ভিত্তি হিসাবে ইসলাম পেশ করিয়াছে এবং যাহা অন্য কোন মতাদর্শের নিকট আদৌ বর্তমান নাই। ইসলামের চিরন্তনী ঘোষণায় বারে বারে এই কথা-ই বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে যে, তওহীদ, রিসালাত, পরকালবিশ্বাস ও মানবীয় ঐক্য—কেবলমাত্র এই চারটিই হইতেছে মানুষের সমাজ-সংস্থা ও স্থিতি বিধানের সুদৃঢ় ভিত্তি।

বস্তুতঃ বর্ণ, গোত্র, বংশ, অঞ্চল, জাতীয়তা, ভাষা ও শ্রেণী প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ পার্থক্য-ভিত্তি সমূহের সহিত এই চারটি মূলনীতির কোন প্রকার সম্পর্ক বা সামঞ্জস্যই বিদ্যমান নাই। উপরন্তু ইহা মনস্তাত্ত্বিক আদর্শিকতার দিক দিয়া দুনিয়ার সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও একই কেন্দ্রবিন্দুতে সমাবিষ্ট করার জন্য সর্বোতভাবে সমর্থ। ইহা কোন দেশ, জাতি, বংশ ইত্যাদির কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না। ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে বুনিয়াদ উপস্থাপন করিয়াছে, তাহা মূলগত ভাবধারা ও প্রকৃতির দিক দিয়া সর্বাত্মক নিরপেক্ষ ও নির্বূঢ়। মূলতঃ উহা ঈমানের ও মন-প্রান দিয়া বিশ্বাস করার জিনিস। ইহাতে ব্যক্তির গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্য যথাযথ মর্যাদা সহকারে স্বীকৃত বটে; কিন্তু রক্ত সম্পর্কের কোন ভিত্তিই উহার নিকট গ্রাহ্য নহে। ইসলাম কোন বস্তুনিষ্ঠ সভ্যতা-বুনিয়াদ পেশ করে না বলিয়াই উহা নির্বিশেষ সকল মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা অতীব সহজ এবং ইহার কারণে অর্ধশতাব্দীর মধ্যে অর্ধেক দুনিয়া প্রভাবান্বিত করা একমাত্র ইসলামের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। উহা মানবতার জন্য যে মহান কল্যাণ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা দুনিয়ার নির্বিশেষে সকল মানুষেরই নিকটে অবারিত।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌কেই সমস্ত মানুষ ও বিশ্ব-নিখিলের একমাত্র স্রষ্টা সার্বভৌমত্বের মালিক ও বিধানদাতা রূপে স্বীকার করিলে কোন বস্তুনিষ্ঠ ব্যবধান-ই আর মানুষকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেপারে না। এক খোদার সৃষ্ট ও বান্দাহ্ হওয়ার সর্বকুলপ্লাবী ভাবধারা পার্থক্য-বিভেদের সমস্ত আবর্জনা ধুইয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া দেয় ও পরস্পরকে পরস্পরের নিকটবর্তী ও একান্ত আপনার করিয়া তোলে। কেহ কাহাকেও হিংসা করিতে পারে না, পারেনা একবিন্দ ঠকাইতে ও জুলুম করিতে।

www.pathagar.com

পরন্তু ইহাতে মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের সমস্ত প্রাকার চূর্ণ হইয়া যায়, মানুষ সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করে মানুষের গোলামী ও মানব-রচিত আইন পালনের হীনতা হইতে। এই নীতি ও মতবাদ মন-মগজ দিয়া গ্রহণ করিতে ও জীবন দিয়া অনুসরণ করিতে দুনিয়ার কোনও মানুষই-কি অস্বীকার করিতে পারে?

খোদাকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রভু, সার্বভৌম ও বিধানদাতা স্বীকার করার অনিবার্য ফলস্বরূপ মানিয়া লইতে হয় খোদার নিকট হইতে রসূল প্রেরণের মহান সত্যকে। মানুষ যেহেতু কোন ইনছাফপূর্ণ আইন রচনা করিতে সক্ষম নহে, তাই আল্লাহ নিজেই প্রয়োজনীয় মূলনীতি সমন্বিত বিধানসহ রসূল পাঠাইয়াছেন। এই রসূল যুগে যুগে দেশে দেশে ও বিভিন্ন জাতির মানুষের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব রসূলকে না মানিলে ও তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত খোদার বিধান সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ না করিলে খোদাকে-ই স্বীকার করা হয়না, তাই খোদাকে মানিবার জন্যই রসূলকে পুরাপুরিই মানিয়া লইতে হয়। ইহা এক সাধারণ গ্রহণযোগ্য মূলনীতি মাত্র। দেশ, কাল, বর্ণ, ভাষা ও জাতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই কাহারও পক্ষে ইহা গ্রহণ করিতে এবং ইহারই ভিত্তিতে নিজের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে কোন প্রকার অসুবিধা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বিশ্ব-রাষ্ট্রের জন্য এক বিশ্ব-নেতা একান্তই আবশ্যক। কোন জাতীয় আদর্শ যেমন বিশ্ব-রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হইতে পারে না, অনুরূপভাবে বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপন করা সম্ভব নয় বিশ্ব-নেতা ব্যতীত। আর হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ)-ই হইতেছেন সেই বিশ্ব-নেতা, যিনি, —একমাত্র যিনিই—সমগ্র মানুষকে এক খোদার বন্দেগীর বুনিয়াদে—সমান মর্যাদা ও সম অধিকারের ভিত্তিতে একত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা এক চির উজ্জ্বল আদর্শ এবং এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য, সন্দেহ নাই।

মানুষ মাত্রই মরণশীল, এই দুনিয়ায় কেহ-ই চিরঞ্জীব হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? আর মৃত্যুই কি মানুষের জীবন-নাট্যের চূড়ান্ত অবসান ঘোষণা করে, না ইহা 'ড্রপসীন' মাত্র? ইসলাম নানাভাবে এই কথা মানুষের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, এই জীবনই চূড়ান্ত ও শেষ নহে, এই জীবন অবসানের পর আর এক জীবনের এমন একটি আরম্ভ রহিয়াছে, যাহার কোনই সমাপ্তি নাই। ইহারই পারিভাষিক নাম হইতেছে 'পরকাল'। এই পরকাল সকল কালের সকল দেশের ও সকল জাতির মানুষের পক্ষেই সমান ভাবে বিশ্বাস্য। কেননা ইহা এক শাশ্বত সত্য—অনস্বীকার্য বাস্তব। পরকালই হইতেছে মানুষের ইহকালীন যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব ও তদনুযায়ী প্রতিফল

www.pathagar.com

দানের জন্য নির্দিষ্ট দিন। কোন মানুষই এই দিনের হিসাব ও প্রতিফল গ্রহণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। কাজেই ইহা সর্বজন স্বীকৃতব্য সত্য। ইহা ইসলামী সমাজ-সংস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ।

বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য বিশ্ব-মানবকে এক ও অভিন্ন মানিয়া লওয়া একান্তই আবশ্যক, অন্যথায় দুনিয়ায় কোন সমাজ-সংস্থার কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। কাজেই বর্ণ, ভাষা, দেশ, জাতি ও শ্রেণী ইত্যাদির দিক দিয়া মানুষের মধ্যে বিভেদ পার্থক্যের যত প্রাচীরই নির্মাণ করা হউক না কেন, মূলতঃ উহা কৃত্রিম ও অস্থায়ী। উহার নিক্তিতে মানবতার ওজন করা যেমন অসম্ভব, তেমনই উহার দরুন মানব-সমাজে কোন প্রকার বিভেদকেও বরদাশ্‌ত্ করা কোনক্রমেই উচিত হইতে পারে না।

বস্তুতঃ "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই" বলিয়া যাহারাই মানবীয় সাম্যের উদাত্ত গান গাহিয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছে, তাহারাই মানুষকে বিভিন্ন বৈষয়িক ও নৈসর্গিক কারণে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মানবতার মর্যাদা ধুল্যাবলুণ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু ইসলাম মানবীয় ঐক্যের কথা একটি তত্ত্ব কিংবা প্রতারণামূলক শ্লোগান হিসাবেই পেশ করে নাই, সমাজ ও সভ্যতার একটি অপরিহার্য ভিত্তি হিসাবেও উহার গুরুত্বের কথা ঘোষণা করিয়াছে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'এক খোদা'—এই ঘোষণাটি যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, 'এক মানুষ' এই ঘোষণার গুরুত্বও তদপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে।

"এক মানুষ" এই কথাটি ঘোষণা করিলেই সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিকতা-বাদ, মানবীয় প্রভুত্ব ও আইন রচনা-নীতির চূড়ান্ত অবসান হইয়া যায়। নিমিষে নিভিয়া যায় জাতিতে জাতিতে সৃষ্ট আজিকার হিংসা-বিদ্বেষের দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠা অগ্নিকুণ্ডলি। আর ইহারই ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে এক ইনছাফপূর্ণ বিশ্ব-রাষ্ট্র-সংস্থা।

---

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন

ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামের ব্যাপক জীবন-ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সর্বাত্মক বিপ্লবী আন্দোলন অপরিহার্য। ইসলাম মূলতঃই বিশ্ব-মানবের সম্মুখে জীবনের এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা উপস্থাপিত করিয়াছে। সেই সংগে একটি বিরাট ও সর্বগ্রাসী বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে উহাকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার নির্দেশও দিয়াছে। বস্তুতঃ ইসলাম কোন অসম্পূর্ণ বা এক-দেশদর্শী ব্যবস্থা নয়, কোন জড়-স্থবির-গতিহীন ও বন্ধ্যা অনুশাসনও নয়। ইহার অভ্যন্তরে রহিয়াছে বিরাট আগ্নেয় শক্তি; যাহা সমগ্র জাহেলিয়াতের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া, উহার আকাশ-স্পর্শী প্রাসাদকে চূর্ণ করিয়া দিয়া এক অভিনব বুনিয়াদ স্থাপন করে এবং তাহার উপর রচনা করে উহার নিজস্ব আদর্শের এক স্বকীয় উত্তুংগ প্রাসাদ। বাতিল ও জাহেলিয়াতের সংগে উহার কোথায়ও কোন ব্যাপারেই এক বিন্দু সমঝোতা হইতে পারে না। উহার আন্দোলন এক দুরন্ত, দুর্বার ও ক্ষমাহীন অভিযানের রূপ ধারণ করে। ইসলামী আন্দোলনকে একটি নির্ঝরিণী মাত্র মনে করিলে ভুল হইবে, উহাকে মনে করিতে হইবে মহাসমুদ্রের দুকূলপ্লাবী প্রবাহ। ইহা প্রত্যেকটি মানুষকে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজ ও জাতীয় জীবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া লয়।

ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি

ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি প্রাকৃতিক নিয়মের সংগে সামঞ্জস্যশীল। একটি বৃক্ষ প্রথমতঃ একটি বীজ হইতে অংকুরিত হইয়া উঠে, ক্রমশঃ তাহা বড় ও বর্ধিত হয়, উহার শাখা ও প্রশাখা বিকশিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত উহা পত্র-পল্লব ও ফুল-ফলে সুশোভিত হয়। বৃক্ষের এই ক্রমবিকাশ একটা স্বাভাবিক

www.pathagar.com

নিয়ম অনুসরণ করিয়াই চলে। কোথায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব নয়। পরন্তু বীজ যে গাছের হইবে, বীজ হইতে ঠিক সেই গাছেরই অংকুর উদগত হইবে এবং অংকুর হইতে উহার পরবর্তী ক্রমবিকাশেও উহা ঠিক সেই গাছ-ই থাকিবে। শেষ পর্যন্ত উহা সেই গাছেরই ফুল এবং ফল দিতে শুরু করিবে। আম গাছের অংকুর ক্রমবিকাশের অধ্যায়গুলি অতিক্রম করিয়া যখন ফলদানের সময় পর্যন্ত আসিয়া পেঁাছে, তখন সহসা তাহাতে কাঁঠালের ফল ধারণ কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রাকৃতিক জগতের এই নিয়ম শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতিও এইরূপ একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে। ইসলামী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য মানুষের উপর হইতে মানুষের সকল প্রকার প্রভুত্ব ও আইন রচনার অধিকারের অভিশাপ দূরীভূত করিয়া গোটা মানবতাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা এবং তাহাদের উপর একমাত্র বিশ্বস্রষ্টার প্রভুত্বের ভিত্তিতে বন্দেগী ও খিলাফতে-ইলাহীয়ার সুমহান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। কাজেই আন্দোলনের প্রথম উৎপত্তি হইবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র বীজ হইতে। বস্তুতঃ এই মন্ত্রই হইতেছে ইসলামী আন্দোলনের "ম্যানিফেষ্টো"; ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথমে এই বাণী পেশ করিয়াই মানুষকে সাধারণভাবে আহ্বান জানাইতে হইবে ইসলামী বিপ্লবের উদ্দেশ্যে এবং যাহারাই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইহার চরম লক্ষ্যে পেঁাছিতে প্রস্তুত থাকিবে তাহারা মিলিত হইয়া গঠন করিবে একটি দল—ইসলামের বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত একটি ইন্‌কেলাবী জামায়াত।

ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন

এই জামায়াতের উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে ইসলামী হইবে, তেমনি উহার গঠনতন্ত্র, সংগঠন পদ্ধতি এবং কর্মপন্থাও হইবে সকল দিক দিয়াই ইসলামী। এক কথায় এই ইসলামী দলকে হইতে হইবে আদর্শভিত্তিক, আদর্শকেন্দ্রিক এবং উহার কর্মপন্থাও হইবে সম্পূর্ণরূপে আদর্শবাদী।

ইসলামী আন্দোলনের স্বরূপ ও প্রকৃতির সহিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেখানে সম্বোধন করে বিশেষ একটি ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, বর্ণ ও ভাষা ভিত্তিক জাতিকে—সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ সংখ্যক মানুষকে, সেখানে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন সম্বোধন করে নির্বিশেষে গোটা মানবতাকে।

www.pathagar.com

মানবতাই হয় সেখানে মূল বিষয়বস্তু। ইহা কোন শ্রেণীবাদী বা শ্রেণী-কেন্দ্রিক আন্দোলন হইবেনা। বিশেষ একটি দল বা শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের গদি হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্য একটি দল বা শ্রেণীকে উহাতে অধিষ্ঠিত করা-ই ইসলামী আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারেনা। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী আন্দোলন হইবে একান্তভাবে বিশ্ব-মানবিক। দুনিয়ার নিখিল মানবতার সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান লইয়াই জাগিয়া উঠিবে এই আন্দোলন। ইসলামী আদর্শের বিরোধী যাহা কিছুই পৃথিবীর ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চিত হইয়া আছে, এই আন্দোলনটি হইবে নিশ্চিতরূপে তাহারই বিরুদ্ধে এবং সমগ্রক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। পরন্তু রাষ্ট্র যেহেতু মানুষের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং জাহেলিয়াতের সমস্ত রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান রাষ্ট্রকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া থাকে এবং উৎকর্ষ লাভ করে, তাই জাহেলিয়াতকে নির্মূল করিয়া জীবনের সমগ্রক্ষেত্রে খোদায়ী ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করা-ই হয় ইসলামী আন্দোলনের চরম লক্ষ্য।

অতএব ইসলামী আন্দোলন সাময়িক কোন উত্তেজনা, কোন উপস্থিত স্বার্থ-লাভ কিংবা কোন হিংসা-দ্বেষের অভিব্যক্তি মাত্রই নয়;—তাহা যদি হয়, তবে উহাকে আর যাহাই হউক ইসলামী আন্দোলন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ ইসলামী আন্দোলনের শিকড় মানুষের মন ও মস্তিষ্কের গভীর তলদেশে সুদূর-প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং যুগ-যুগান্তকাল ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে তাহা চলিতে থাকে—যতদিন না উহার শেষ লক্ষ্য-স্বরূপ প্রথমে বিশেষ একটি দেশে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে পরিপূর্ণ ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়। ইসলামী আন্দোলন উহার সমগ্র শক্তি আরোপ করিয়া থাকে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে। সাময়িক খুঁটিনাটি সমস্যার দিকে উহা মাত্রই দৃষ্টিপাত করে না—সে সমস্যা সামাজিকই হউক, রাজনৈতিক হউক কিংবা অর্থ-নৈতিক আর আন্তর্জাতিকই হউক না কেন। কারণ এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপার এবং ছোটখাট সমস্যার মূল উৎস হইতেছে মানুষের উপর মানব-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা, আর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে খোদায়ী ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়া মানুষের চরম স্বেচ্ছাচারিতায় মত্ত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইতেছে আসল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান না হইলে—আরও স্পষ্ট ভাষায়; মানুষের উপর হইতে মানব-প্রভুত্বের বিলোপ না ঘটিলে কোন সমস্যারই

www.pathagar.com

সমাধান হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই একটি মাত্র মূল সমস্যার সমাধান হইলেই অন্যান্য হাজার প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব। ঠিক এই জন্যই আম্বিয়ায়ে কিরাম দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রথম যে বিপ্লবী আহ্বান পেশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে :

ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت -

—"এক আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার কর, এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য সমগ্র শক্তি ও প্রভুত্বের দাবীদারকে অস্বীকার কর।"

ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ শক্তি নির্দিষ্ট কোন দৈহিক অবয়বকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে পারে না, উহা যুগ বিবর্তনের সংগে সংগে নূতন নূতন বাহন ও অবলম্বনকে গ্রহণ করিতে মাত্রই কুন্ঠিত হয় না। কারণ উহা বিশেষ কোন কালের জীবনাদর্শ নহে—উহা সর্বকালের এবং সর্বদেশের। তাই কালের বিশেষ এক অধ্যায়ে ইসলামী আন্দোলন যদি পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া কিংবা নিছক মৌখিক আলাপ-আলোচনা করিয়াই উহার বিপ্লবী আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করিয়া থাকে, তাহা হইলে কালের আর এক অধ্যায়ে রেডিও, মাইক্রোফন, প্রেস, পত্রিকা এবং টেলিভিশনের মারফতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনগণের মর্মমূলে উহার বিপ্লবী পয়গাম পৌঁছাইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। তামাদ্দুনের স্বাভাবিক বিবর্তনের সংগে সংগে ইসলামী আন্দোলনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগাইয়া যাইবে বিদ্যুৎগতিতে। তবে উহা এই দুর্বার গতি-স্রোতে কোথায়ও উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম হইয়া পড়িবেনা; বরং সকল অবস্থায়ই বর্জন করিয়া চলিবে জাহেলিয়াতকে—জাহেলিয়াতের সমস্ত রীতি-নীতি ও ব্যবস্থাকে। এই জন্যই বলিতে হইবে, ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি "ডায়নামিক।"

মোট কথা ইসলামী আন্দোলন সাম্প্রতিক তামাদ্দুনের সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করিয়াই শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। প্রথম উৎপত্তির দিন হইতেই উহা গোটা পরিবেষ্টনীর মৃত-জীর্ণ দেহে একটি প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিবে, চারিদিকে উহার বিপ্লবী আদর্শ বিদ্যুৎগতিতে প্রচারিত হইবে।

ইসলামী আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় প্রচার ও জনমত সৃষ্টির অধ্যায়। এই অধ্যায়ে একজন মানুষের মন ও মস্তিষ্কে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইবে। ইসলাম সম্পর্কে মানুষ এত-দূর অভিজ্ঞতা লাভ করিবে যে, আন্দোলনের সূচনা হইতে উহার সর্বশেষ

www.pathagar.com

পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তর ও মন্‌জিল উহার সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকেই উহা একমাত্র নির্ভুল ও মানব কল্যাণকর আদর্শ বলিয়া হৃদয়-মন দিয়া বিশ্বাস করিবে। এতদ্ব্যতীত আর যত মত ও আদর্শ আছে, আছে যত পথ ও নীতি, সে সব কিছুকেই সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা বলিয়া মনে করিবে। ইহা অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের প্রবল শক্তি সহকারে মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে অধিকার করিবে। মানুষের চিন্তা-পদ্ধতি দৃষ্টিকোণ, গ্রহণ ও বর্জনের মানদণ্ড সবকিছু আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ধীরে ধীরে মানুষের মন-মগজের গভীর গহনে উহা দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকিবে, ফলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে বিরাট ও বাস্তব পরিবর্তন সূচিত হইবে। মানুষের জীবন-প্রাসাদ হইতে জাহেলিয়াতের এক একখানা ইঁট খসিয়া পড়িবে। এই ভাবে যে সব দর্শন, মতবাদ, আইন ও রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সরকার, রাষ্ট্র ও প্রভুত্বের বন্ধন ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী, এই আন্দোলনের প্রচণ্ড আঘাতে তাহা সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া

ইহার ফলে সাম্প্রতিক জাহেলী শক্তি ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় উদ্ধত মস্তক খাড়া করিবে, ইসলামী আন্দোলনকে দংশন করিবার জন্য ঠোকরের পর ঠোকর মারিতে শুরু করিবে। ইসলামী আন্দোলনের উপর তখন নামিয়া আসিবে বিরুদ্ধতা আর শত্রুতার বিরাট পাহাড়। আসিবে বিপদ, মুছীবৎ আর নির্যাতন, নিষ্পেষণের সর্বপ্লাবী সয়লাব; আসিবে কারাগার, নির্বাসনের ঘোর অমানিশা। কাহারও যাইবে চাকুরী, কাহারও ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে, কেহ আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও সরকার কর্তৃক সর্বোতভাবে পরিত্যক্ত ও সম্পর্কচ্যুত হইবে,—রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক নির্মমভাবে নিষ্পেষিত ও লাঞ্ছিত হইবে, কেহ কারারুদ্ধ হইবে,—বিনাবিচারে আটক থাকিয়া জেলের অভ্যন্তরস্থ লৌহ কুঠরিতে তিলে তিলে পঁচিতে থাকিবে। আর কেহবা দেশ হইতে নির্বাসিত হইবে। যেহেতু ইসলামী আন্দোলন মানব-জীবনের বিশেষ কোন দিকের পরিবর্তন চাহে না—তাহা চাহিলে উহাকে কোন বিরুদ্ধতা বা শত্রুতার সম্মুখীন হইতে হইত না: উহা সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক বিপ্লবের বাহন বলিয়াই উহার উপর বাঁধা ও বিরুদ্ধতা আসিবে সকল দিক হইতে—সকল দল উপদল ও স্বার্থবাদীর তরফ হইতে সর্বাত্মক শক্তি সহকারে।

কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের বীর মুজাহিদগণ এই সকল বিপদের সম্মুখে

www.pathagar.com

দুর্জয় গিরি শৃংগের মত মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে, সবকিছু তাহারা অকাতরে সহ্য করিবে ; ভাংগিয়া যাইবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে তবু 'জাহেলিয়াতে'র সম্মুখে তাহারা বিন্দুমাত্র নতি স্বীকার করিবে না।

এই নির্ভীক আত্ম-প্রত্যয় ও খোদা-নির্ভরতাই হইবে তাহাদের আদর্শনিষ্ঠা ও সীমাহীন সহনশীলতার বাস্তব পরিচয়।

ইসলামী জামায়াতে এই বীর সৈনিকগণ হইবে সুসংবদ্ধ, সুসংগঠিত, একনিষ্ঠ, খোদার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তাই কঠিন বিপদেও তাহাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে না, পা স্খলিত হইবে না, শেষলক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তাহাদের গতি কিছুমাত্র ব্যাহত হইবে না। জাহেলিয়াতের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াও তাহারা পশ্চাদপসরণ করিবে না—পশ্চাদপসরণকে তাহারা মনে করিবে পরিষ্কার কুফরী।

পরিণামে 'মুষ্টিমেয় কয়েককজন লোকে'র বিপ্লবী মতবাদ সাধারণ জনগণের জীবনাদর্শে পরিণত হইবে এবং কয়েকজন 'পাগলের' আন্দোলন শেষ পর্যন্ত গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হইবে। আর ইহাই হইবে ইসলামী আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

ক্ষীণ প্রদীপ শিখা বায়ুর মৃদুমন্দ দোলায়-ই নির্বাপিত হয় ; কিন্তু বিরাট অগ্নিকুণ্ডলী প্রবল ঝটিকা প্রবাহেও নিভিয়া যায় না, বরং তাহা হইতে উহা আরও অধিক শক্তি সঞ্চয় করে। ইসলামী আন্দোলন প্রথম অধ্যায়ে স্বভাবতঃই দুর্বল থাকে বলিয়া যেকোন বিরুদ্ধতাই উহারপক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে ; কিন্তু আন্দোলনের বলিষ্ঠ অব্যাহত গতি যখন মুষ্টিমেয় লোকের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সার্বজনীনতার বিশাল পরিবেশে আসিয়া পৌঁছে, তখন আর বিরুদ্ধতা ও গোপন ষড়যন্ত্রের অবকাশ থাকে না। তখন উচ্চ পাহাড়ের ভিত্তিমূল নড়িয়া উঠে, আন্দোলনের শেষ অধ্যায় তখন একেবারে নিকটবর্তী হইয়া পড়ে। তখন ইসলামী আন্দোলন ও জাহেলী শক্তির মধ্যে হয় প্রকাশ্য মুকাবিলা। এই মুকাবিলায়ই হক্ব ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায়। ইসলামী আন্দোলন তখন জাহেলিয়াতের হাত হইতে রাষ্ট্রশক্তি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-বিপ্লবের এই শেষ অধ্যায়ে-ও উহা গণতান্ত্রিক উপায়-উপকরণকেই সর্বপ্রথম ব্যবহার করে। জনমতের সমর্থনেই যদি রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে গণভোট ও নির্বাচনের উপায় অবলম্বন করিয়া-ই উহা রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করিবে। কিন্তু এই উপায়ে উদ্দেশ্য হাছিল করা যদি শেষ পর্যন্ত অসম্ভব বলিয়া-ই বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহার শেষ উপায় স্বরূপ শক্তি প্রয়োগের চরম পন্থা অবলম্বন করিতেও দ্বিধাবোধ করিবে

www.pathagar.com

না। বস্তুতঃ ইসলামী আন্দোলনের ইহাই হইতেছে শেষ অধ্যায়।

ইসলাম যেমন নিছক কোন ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, তেমনই উহা কেবল সামাজিক ব্যবস্থাও নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে উহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক—তথা ব্যাপক জীবনের এক পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ আদর্শ। তাই ইসলামী আন্দোলনের প্রথম তরংগাভিঘাতে মানুষের ব্যক্তি-জীবনেই আসিবে প্রথম বিপ্লব। ব্যক্তি জীবনের এই বিপ্লব-স্রোত যখন অসংখ্য জীবনকে নিমজ্জিত করিবে, তখনই আসিবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লব। যে আন্দোলন ব্যক্তি-জীবনে কোন পরিবর্তন আনিতে পারে না বা যাহা ব্যক্তি-জীবনে পরিবর্তন সৃষ্টির গুরুত্বই অনুধাবন করে না, তাহা যেমন ইসলামী আন্দোলন নয়, তেমনই যাহার লক্ষ্য নিছক সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কিংবা শুধু আর্থনীতিক বিপ্লব সাধন করা, যাহা ধনীকদের বিরুদ্ধে নিঃস্বদের শুধু ক্ষেপাইয়া তুলিতেই সচেষ্ট, কিংবা যাহার পরিণামে কেবল শোষণ ও নিপীড়নের-ই হাতিয়ার শাণিত হয়, বস্তুতঃ ইহার কোনটিই ইসলামী আন্দোলন নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়।

পরন্তু ইসলামী আন্দোলন মূলতঃই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পক্ষপাতী; ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অযথা রক্তপাত বা বিপ্লবের উন্মাদনায় মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করা কোনক্রমেই ইসলামী কর্মকৌশল হইতে পারেনা। যেহেতু বলপ্রয়োগ করিয়া যেমন একটি চারাগাছে ফল ধরানো সম্ভব নয়, তেমনই নিছক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কখনও ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করা যাইতে পারে না।

শেষ কথা এই যে, ইসলামী রাজনীতি....তথা ইসলামের ব্যাপক জীবন-ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এইরূপ একটি ইসলামী আন্দোলন ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়। [১]

১। (২৮শে এপ্রিল, ১৯৫২ ইং, দৈনিক আজাদের সাহিত্য মজলিশে প্রকাশিত।)

www.pathagar.com

উপসংহার

ইসলামী রাজনীতির বিভিন্ন মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিক যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হইল। আধুনিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাজনীতির যে কোন ছাত্র ইহা হইতে ইসলামী রাজনীতির মূল ধারাগুলির সহিত যথেষ্ট পরিচয় লাভ করিতে পারিবে, গ্রন্থকারের অন্ততঃ এতটুকু ভরসা আছে।

মানুষের চিন্তাধারা বিবর্তিত হইয়া আজ এতখানি সম্প্রসারিত ও সর্বাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে যে, মানুষের ব্যাষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগও আজ রাজনীতি বহির্ভূত হইয়া থাকে নাই। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র আজ সর্বগ্রাসী হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা মানুষের ব্যক্তি-জীবন হইতে শুরু করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল কাজ-কর্মকে নিজের অধীন করিয়া লইয়াছে। ব্যক্তি মানুষের অর্থোপার্জন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফিরা, গতিবিধি, বিবাহ-শাদী, আত্মীয়তা ও শত্রুতা, আদান-প্রদান—সব কিছুই আজ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। ধর্মপালন, অভাব-অভিযোগ, দুর্ভিক্ষ, জন্ম-মৃত্যু—ইহার কোনটি-ই-রাজনীতি বহির্ভূত নয়। সমাজ জীবনের বড় বড় ব্যাপারগুলির কথা আর উল্লেখ না-ই করিলাম। মোট কথা আজ মানুষের এমন একটি কাজ নাই, যাহা রাজনীতি বহির্ভূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না।

পুরাকালে রাজনীতি বলিতে রাজার বা রাজ-সরকারের দেশরক্ষা, শাসন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনার কথা-ই বুঝাইত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কাজ কারবারের সহিত উহার নিকটতর কোন সম্পর্ক ছিল না। মানব বুদ্ধির বিবর্তন এমন ধারায় চলিয়াছে যে, অতঃপর ইসলামের শ্রেষ্ঠ দুশমন-ও আর ইসলামের গভীর সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিবেনা।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত কোনদিনই উহার রাজনীতিকে—রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মধারাকে—মানব-জীবনের অন্যান্য কাজকর্ম হইতে ভিন্ন করিয়া দেখে নাই। ব্যক্তিগত কাজকর্ম, ধর্ম, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী প্রভৃতি যেমন ধর্ম তথা ইসলামের অংশ, তেমনই রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ ও সন্ধি, শাসন, দেশরক্ষা, আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান, নাগরিকদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ, বাসস্থান ও পোষাক, তাহজীব ও তামাদ্দুন ইত্যাদিও ইসলামের বিরাট ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন অংশ। মসজিদের ইমাম ও মোক্তাদী, আদালতের বিচারপতি, উকিল, মোখতার ও বাদী-বিবাদী, প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধান, যুদ্ধময়দানের সৈনিক ও সেনাপতি, বাজারের দোকানী ও খরীদ্দার—(ইসলামী বিধান মত কাজ করিলে) ইহারা সকলেই সমানভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করে। অতএব ইহাদের কেহই ইসলামী রাজনীতির আওতার বহির্ভূত নয়। তাই—

الملك والدين قوامان -

—"রাষ্ট্র এবং ধর্ম যমজ ভাইয়ের মত অবিচ্ছিন্ন"

কথাটির সার্থকতা অস্বীকার করা যায়না। রাষ্ট্র ব্যতীত দ্বীন—ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা—দাঁড়াইতে পারে না। ইসলামী ধর্ম-ব্যবস্থার ইহা সুষ্ঠু ও নির্ভুল পরিচয়। কিন্তু ইহার মূলীভূত কারণ কি?

বস্তুতঃ মানুষের জীবন একটি অবিভাজ্য ইউনিট। ইহার একটি দিককে অন্য সব কিছু হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। মানুষের দেহকে যেমন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের নাম "মানুষ" দেওয়া যায়না; ঠিক তেমনই মানব জীবনের বিপুল কাজকর্মের কোন একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করা এবং উহার এক একটি অংশকে ইসলাম বলিয়া অভিহিত করা বৈজ্ঞানিক ভুল। মানব দেহের বিভিন্ন অংগ মিলিয়া যেমন একটি পূর্ণ অবয়ব গঠিত হয়, তদ্রূপ মানব জীবনের বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন সময়ের কাজ মিলিয়াই গঠিত হয় একটি পূর্ণাংগ জীবন। এই পূর্ণ জীবনটি লইয়া-ই মানুষ "মানুষ" নামের গৌরব লাভ করিতে পারে।

পক্ষান্তরে মানুষের ব্যাষ্টি-জীবন ও সমষ্টিগত জীবনের মধ্যেও মৌলিক কোন পার্থক্য নাই,—যেমন পার্থক্য নাই পানির একটি ফোটা এবং বিরাট সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলরাশির মধ্যে। কাজেই মানুষের ব্যক্তি জীবনে এক প্রকার নিয়ম-কানুন পালন করা এবং সমাজজীবনে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

www.pathagar.com

অতএব, ব্যক্তি মানুষের অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজকর্ম এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরাট বিরাট ব্যাপার—এ সব একই মূল সূত্রের সহিত ওতপ্রোত জড়িত ও গ্রথিত। একটিমাত্র মূল নিয়ম ও ধারণা-ই কাজ করিয়া থাকে কর্মের সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগে, সকল সময় ও স্তরে। মূলতঃ সেই মূল নিয়মটি-ই গোটা মানুষের উপর—সকল ক্ষেত্র ও বিভাগের মানুষের উপর—প্রভুত্ব করিয়া থাকে, মানুষের সমগ্র দেহ এবং দেহের বিভিন্ন অংশের উপর মানুষের আত্মা বা প্রাণ যে রকম প্রভুত্ব করে, মানুষের সমগ্র কর্মজগতের উপরও অনুরূপ ব্যাপকভাবে প্রভুত্ব করে এই মূলমন্ত্র। ইসলাম বিশ্বমানবের সম্মুখে সেই মূলমন্ত্র রূপে উপস্থাপিত করিয়াছে কালেমায়ে তাইয়্যেবা—"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। মুসলিম-ব্যক্তির জীবন ও কর্মের উপর এই কালেমায়ই পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ অধিকার স্থাপিত হইয়া থাকে। মানুষের প্রত্যেকটি কাজ কর্মেই এই কালেমা পথ-নির্দেশ করে—ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, করণীয় ও বর্জ-নীয়, পাপ কিংবা পূণ্য সন্দেহাতীত রূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কোন একটি কাজেও যদি কোন মুসলমান ইহার নির্দেশ লংঘন করে তবে সেই "মূল মন্ত্রের"ই বিরোধিতা করে। কাজেই কোন মুসলমানের নিকট রাজনীতি আর ধর্ম, সমাজ আর সভ্যতা, হাট-বাজার আর মসজিদ, মাদ্রাসা, আদালত, ওয়াজের মহফিল আর পার্লামেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন—ইহার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই, সকল ক্ষেত্রে-ই তাহাকে পরিচালিত করে এবং পথ নির্দেশ দেয় সেই মূলমন্ত্র—কালেমায়ে তাইয়্যেবা।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মুসলিম জাতির পরিপূর্ণ জীবনকে ইসলামের এই পূর্ণাংগ আদর্শে পরিচালিত করিবার জন্য আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করিয়াছেন। তিনি এরশাদ করিয়াছেন :

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا
خطوات الشيطان ط انه لكم عدو مبين -

—"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের সীমার মধ্যে (কালেমার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণাধীনে) প্রবেশ কর এবং (জীবনের কোন কাজে বা ক্ষেত্রেই) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। কারণ, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

www.pathagar.com

অর্থাৎ—তোমাদের জীবনে কোন একটি কাজকেও অন্যান্য কাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক-একটি কাজে এক-এক প্রকারের রীতি-নীতি অনুসরণ করিও না। বরং সমগ্র জীবনকে—জীবনের সমগ্র কাজকে "এক খোদার আনুগত্যের অধীন সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করিয়া দাও এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিকে ও প্রত্যেকটি কাজে খোদার বিধান মানিয়া চল। প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তির ইহাই কর্তব্য।

আর শুধু বর্তমান কালের মুসলমান-ই নয়, দুনিয়ার বুকে যত নবী আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এহেন পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা লইয়াই আসিয়াছেন এবং আজীবন সাধনার পর তাঁহারা এই পূর্ণাংগ খোদার বিধান কায়েম করিয়া গিয়াছেন! আর এই বিধানের ভিত্তিতেই সর্বকালের ও সর্বদেশের মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য আল্লাহতায়ালা কঠোরভাবে নির্দেশ দান করিয়াছেন:

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا
اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا
الدين ولا تتفرقوا فيه ○ (الشورى)

—"আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য সেই "দ্বীন" (জীবন-ব্যবস্থা) নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যাহা তিনি নূহ নবীর প্রতি নাজিল করিয়াছিলেন এবং যাহা হে নবী আপনার প্রতিও নাজিল হইয়াছে, আর আমরা যাহার আদেশ করিয়াছিলাম ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসার প্রতি—তাহা এই যে, তোমরা সকলে মিলিয়া খোদার "দ্বীন"কে কায়েম কর এবং দ্বীনের ব্যাপারে নিজেরা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ (ও বহুরূপী-নীতি অবলম্বন) করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িও না।"

এই আদেশ আজিকার পৃথিবীর প্রত্যেক তওহীদবাদী মানুষের প্রতি নূতন করিয়া মূর্ত ও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। খোদার এই আদেশ পালন করিবার উদ্দেশ্যে জীবন-ধন, শক্তি-সামর্থ সব কিছু-ই অকাতরে উৎসর্গ করার জন্য আকুল কণ্ঠে দাবী জানাইতেছে খোদার একমাত্র বিধান—ইসলাম।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com